“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

উত্তরসূরি

সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি

লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও অনুরাগীদের পক্ষে একটি আবশ্যক সংকলন গ্রন্থ

মূল্য : সাড়ে পাঁচ টাকা

বিষয় ও লেখক-সূচী

বাংলা লোক-সাহিত্য—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য * বাংলার লোকনাট্য—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ * পশ্চিমঙ্গের লোক-নৃত্য—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ * লোকসংস্কৃতি বিকাশের পশ্চাৎপট ও বঙ্গদেশ—ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় * লোক-সাহিত্যের ভাষা—ডঃ সুকুমার সেন * বাংলার লোক-সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য—শ্রীগোপাল হালদার * বাংলার লোক-সঙ্গীত—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র * পশ্চিমবঙ্গের লোক-উৎসব—ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক * বাংলার লৌকিক ভাষা—ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক * বাংলার লৌকিক দেব-দেবী—শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু * বাংলার লোক শিল্প—ডঃ কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় * বাংলার লোকধর্ম—ডঃ সুধীর রঞ্জন দাশ * বাংলার মৃৎশিল্পের সমাজতত্ত্ব—শ্রীবিনয় ঘোষ * পশ্চিমবঙ্গের নবপর্যায়ের মন্দির চর্চা (১৫ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ—১৯০০) উৎস সন্ধান ও চরিত্র বিচার—শ্রীহিতেশ রঞ্জন সান্যাল * বাংলার লোক-সংস্কার ও বিশ্বাস প্রসঙ্গে—ডঃ সমীর কুমার ঘোষ * পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সংস্কৃতির ধারা—ডঃ অমল কুমার দাশ * পশ্চিম সীমান্ত-বঙ্গের লোক-সংস্কৃতি—ডঃ সুধীর কুমার করণ * উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি—শ্রীসুশীল কুমার ভট্টাচার্য * বাংলার লোক-সংস্কৃতি ও প্রচার-মাধ্যম—শ্রীশংকর সেনগুপ্ত।

প্রাপ্তিস্থান

প্রকাশন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়

৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা ৭০০০২৭

*

প্রকাশন বিক্রয়-কেন্দ্র নিউ সেক্রেটারিয়েট

১, কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা ৭০০০০১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) 10575 IPR/৭৭
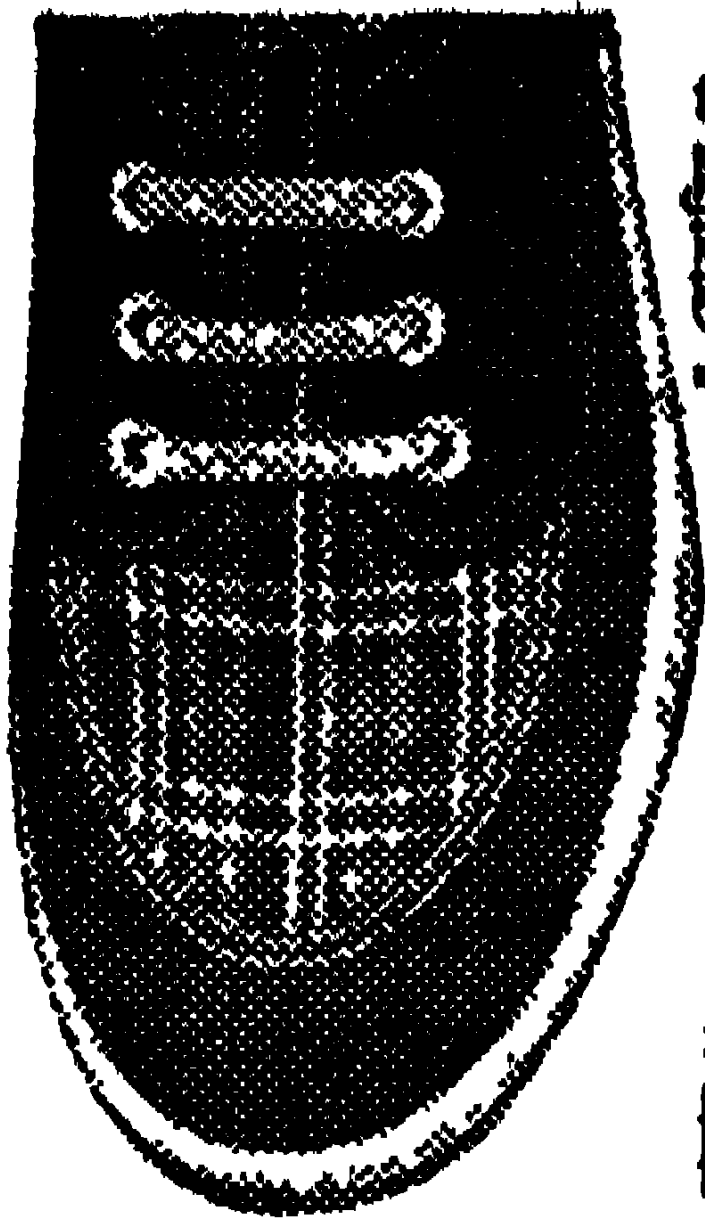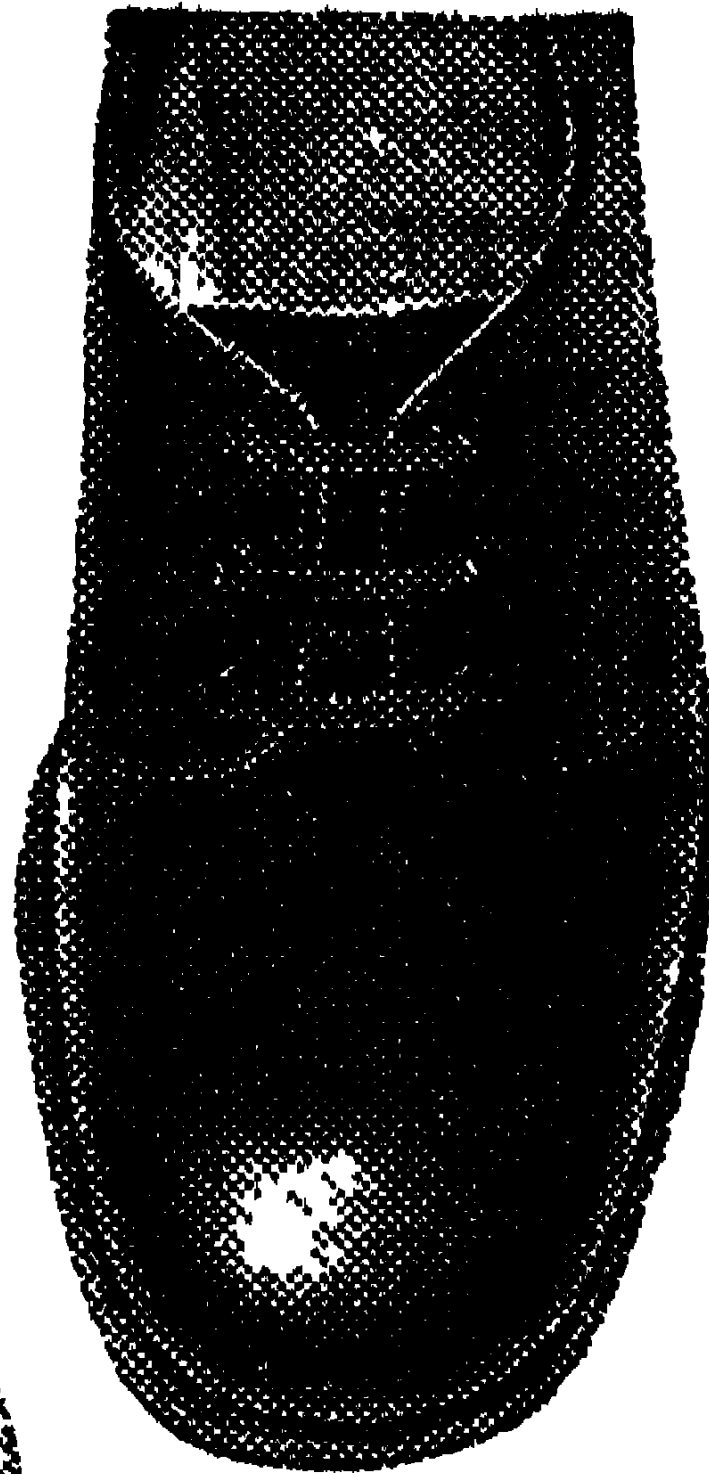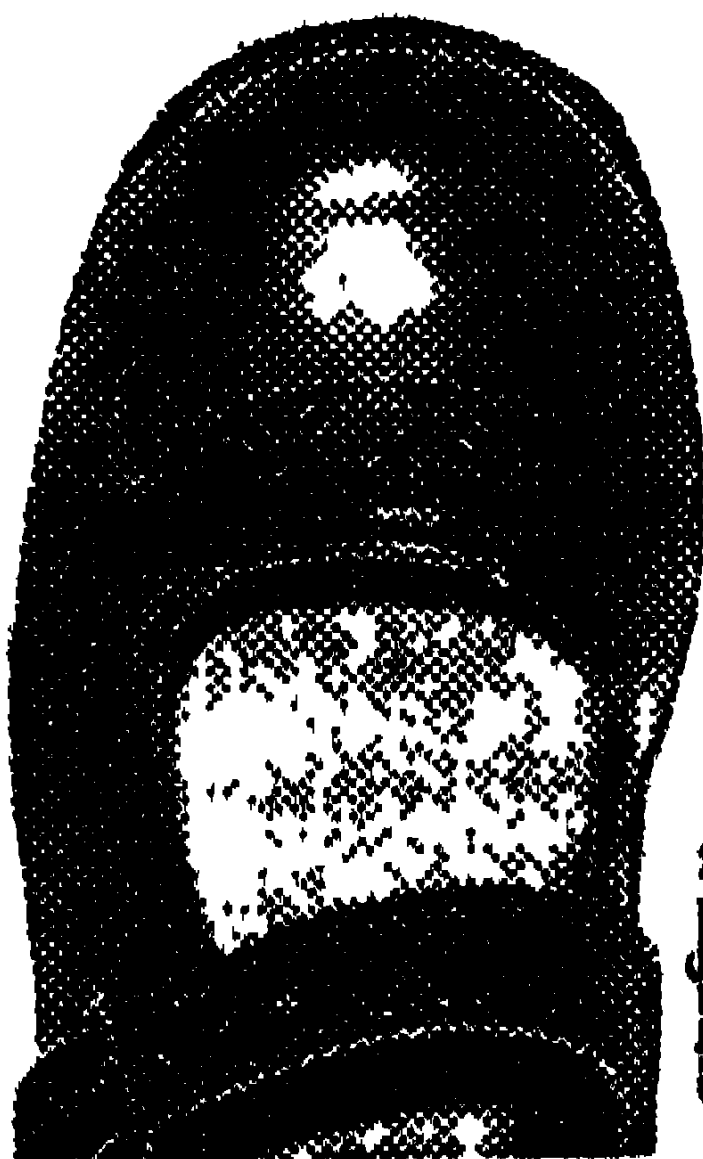
শরৎচন্দ্রের কলকাতা সমাজ

এই নামে কোন বই পড়েছেন কি? নিশ্চয়ই নয়। তাঁর লেখা পল্লী-সমাজ অবশ্য প্রসিদ্ধ। এখনও মনে হয় সেই ট্র্যাডিশন চলেছে। সেই সমাজ, সেই শোষণ, সেই কুসংস্কার।

কলকাতা ট্র্যাডিশনেও বিশেষ কিছু বদলেছে বলে মনে হয় না। ১৯০০ সালের কাগজ দেখছিলাম। তাতে লেখা আছে বৃষ্টির পর কলকাতা ভেসে গেল, নগর-পালরা কি করছেন?

আরও পড়ছি কলকাতার রাস্তার বিপজ্জনক অবস্থার কথা, গাড়ী-ঘোড়া এ্যাকসিডেন্টের কথা।

জলের জন্য হাহাকার খবরের কাগজের শিরোনাম বেশ কিছুদিন।

আর জঞ্জাল? আগেও সুনাগরিকরা রাস্তার ওপর জঞ্জাল ফেলতেন, এখনও ঢালছেন। তবে তফাৎ আছে। আগে যদি পাঁচজন ঢালতেন এখন ৫০০ জন। আগে যদি দু-এক জায়গায় জল জমতো এখন বিস্তীর্ণ এলাকায়।

আর খবরের কাগজের সমালোচনা, নাগরিকদের কটূক্তি কলকাতা কর্পোরেশনের ওপর আগে বর্ষিত হত। এখন সব রাগ এসে পড়েছে সি এম ডি এ-র ওপর। কারণ এই সংস্থাটি বেশ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলে বেড়াচ্ছে যে তাঁরা নাকি কলকাতার উন্নতি করছেন। উন্নতিটা কোথায়?

সেই কুমীরের ছানার মত তাঁরা হাওড়া সাবওয়ে, চেতলা সেতু, অরবিন্দ সেতু, আর কয়েকটা রাস্তা দেখাচ্ছেন।

জলের সরবরাহ যে বেড়েছে, বৃহত্তর এলাকার অনেক বেশী সংখ্যক লোক যে এখন অনেক বেশী জল পাচ্ছেন সেই হিসাব কারও জানা আছে?

জল জমলেও সেটা যে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে সেটা দেখবার মত ধৈর্য্য কার? দেড় হাজার বস্তির ১৩-লক্ষাধিক লোক যে একটু ভাল পরিবেশে আছেন সেটা সবাই জানেন কি?

শহরের আশেপাশের উদ্বাস্তু কলোনীগুলির হাল কিছুটা ফিরেছে, তাই বা ক'জন জানেন? অর্থাৎ পল্লী-সমাজের মত, কলকাতা সমাজের

ট্র্যাডিশন একই আছে। ভাল করলেও নিন্দে। আবাব কাজ না করলে অন্য শহরের তুলনা দিয়ে আরও দু-চার কথা শোনানো।

তা সত্ত্বেও কলকাতা বদলাচ্ছে। সি এম ডি. এ-র প্রশ্ন হলো "কলকাতা-সমাজের" কাহিনীকার কে হবেন? শ্রীভোলানাথ সেনকেই কি সেই ভার নিতে হবে?

সেদিন "নর্থ" এর এক ভদ্রোলোক বলছিলেন যে "নর্থ" এব লোকেদের আপনাবা ডাষ্টবিনে ময়লা ফেলাতে পারবেন না। সাউথের এক গৃহিণী বলেন, আমার ঝি তো এদিকে ওদিকে দেখে ময়লাব ঠোঙাটা রাস্তায় ঠিক ফেলে।

কাজেই নর্থ, সাউথ, ইষ্ট-ওয়েষ্ট সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। যেখানে লোক লজ্জাব ভয় নেই, নিজেব কাণ্ডজ্ঞান নেই, সেখানে আইন কি করবে?

তাই ডাকছি বাচ্চাদের, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের, কিশোর-কিশোরীদের যুবক-যুবতীদেব। আপনাদেব পূর্বপুরুষরা যাই করে থাকুক না কেন, যাই ভেবে থাকুন না কেন, শহরটাতো আপনাদেরই কাজেই দেখিয়ে দিন না যে যখনতখন যত্রতত্র ময়লা না ফেললেও চলে, থুথু গেলাটা অস্বাস্থ্যকর নয়, জলের অপচয় বন্ধ করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার থেকে সি এম. ডি এ-র বিজ্ঞাপন এই নতুনদের অর্থাৎ নতুন জেনারেশনকে উপলক্ষ করেই লেখা হবে। পুরোনো জেনারেশন যদি পড়ে ফেলেন সেটা অন্যায় নয়। কারণ "নিষিদ্ধ" জিনিষ পডতে সবাবই স্বাভাবিক আগ্রহ তবে পুরোনো জেনারেশন যদি বিজ্ঞাপনের কথামত কাজ না কবেন তাহলে নতুন জেনারেশনের ওপর ভাব রইলো... ....

উত্তরসূরি ২৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৩৮৩

ছবি : আত্মপ্রতিকৃতি ॥ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবন্ধ

কবিতাগুচ্ছ

কবিতাবলী

অনুবাদ

সাহিত্য

আলোচনা

উত্তরসূরি ॥ ৭বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড ॥ কলিকাতা ৭০০ ০৫০

আত্মপ্রতিকৃতি : গগনেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সৌজন্যে

আনা কারেনিনা ও গৃহদাহ

অমলেন্দ্র ভাদুড়ী

শরৎ-সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক টলষ্টয়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আনা কারেনিনা' দ্বারা প্রভাবিত। তারা সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় একথারও ইঙ্গিত করেছেন যে 'গৃহদাহে'র অচলা চরিত্র 'আনা কারেনিনা'র আনার চরিত্রের মত সর্বাঙ্গীন ও বাস্তবমুখী হয়ে ওঠে নি।[১] শরৎচন্দ্রের সামতা-বেড়ের লাইব্রেরীতে রক্ষিত বইয়ের যে তালিকা সংকলন করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে কেবল 'আনা কারেনিনা' নয়, সেই লাইব্রেরীতে টলষ্টয়ের প্রায় সমস্ত মুখ্য গ্রন্থগুলি এবং রুশ সাহিত্যের উপরও কিছু কিছু বই ছিল।[২] এর থেকে অনুমান করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না যে শরৎচন্দ্র "আনা কারেনিনা" উপন্যাসটি ভালো করেই পড়েছিলেন। তবে দুজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের দুটি উপন্যাসের মধ্যে মিল থাকলেই যে পরবর্তী লেখক তার সহধর্মী পূর্বসূরির দ্বারা প্রভাবিত হবেন, এ সিদ্ধান্ত সহজেই করা চলে না। মহৎ উপন্যাসের অমরত্বের মূল মানবজীবনের চিরন্তন সমস্যা ও রহস্যের উপর আলোকসম্পাত। একই মূলের সন্ধানে দুই বিভিন্ন দেশের বা কালের দুজন লেখক যদি একই পথের পথিক ও সহধর্মী হন তাকে স্বকীয় স্বাধীন সন্ধানের পথ বলে ধ'রে না নিয়ে প্রভাব বলা সঙ্গত মনে হয় না। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে ললিতকলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের প্রভাব উত্তরসূরিদের সৃষ্টিকার্যে প্রেরণামূলক ও সহায়ক হ'লে তাতে গ্লানিকর কিছু নেই, যদি তা নেহাৎ অনুকরণপ্রিয়তায় পর্যবসিত না হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিযোগ যে শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে মোটেই প্রযোজ্য

নয় একথা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। টলষ্টয়ের "আনা কারেনিনা" ও শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' এই দুই উপন্যাসের মধ্যে আখ্যায়িকা ও বিষয়বস্তুর যথেষ্ট মিল আছে, বোধ হয় এই মিল থেকেই 'গৃহদাহে'র উপর 'আনা কারেনিনা'র প্রভাবের ধারণার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু 'গৃহদাহে'র চরিত্রগুলি 'আনা কারেনিনা'র চরিত্রগুলির চেয়ে অসম্পূর্ণ বা অগভীর এই সিদ্ধান্ত করার আগে এই উভয় উপন্যাসের একটা সর্বাঙ্গীন তুলনামূলক বিচারের ভিত্তি রচনার প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধ এই ভিত্তি অন্বেষণের ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। এ কথা এখানে পরিষ্কার করে বলে রাখা প্রয়োজন যে শরৎচন্দ্রের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কোন ইচ্ছামূলক প্রয়াস এ প্রবন্ধে নেই, পরন্তু উভয় উপন্যাসের তুলনামূলক বিচারে বস্তুতান্ত্রিক মান নির্ণয়ের (objective assessment) প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

খ

মূলতঃ 'আনা কারেনিনা' ও 'গৃহদাহ' উভয় উপন্যাসই বিবাহিত নারীর পরকীয়া প্রেমের কাহিনী। সৌন্দর্য, মাধুর্য ও সততার প্রতীক-রূপিণী আনার বিবাহ হয়েছিল তার চেয়ে কুড়িবছর বয়সে বড় কারেনিনের সঙ্গে। উচ্চপদাধিকারী বিশিষ্ট সরকারী অফিসার কারেনিন ছিল নীরস, আত্মকেন্দ্রিক ও লোক দেখানো শিষ্টাচার ও নিয়মতান্ত্রিকতার দাস। স্ত্রীকে সে তার মূল্যবান গৃহসামগ্রীর অঙ্গ হিসাবেই গণ্য করত। হৃদয়-হীন, আড়ম্বরপ্রিয় স্বামীর সঙ্গে আটবছর বিবাহিত জীবন যাপন করার পর সে ও এক তেজস্বী, উজ্জ্বল যুবক মিলিটারী অফিসার কাউন্ট ভ্রণস্কি উভয়ে গভীরভাবে পরস্পরের প্রেমে পড়ে ও গোপনে গোপনে মিলিত হতে থাকে। অবশেষে আনা ভ্রণস্কির প্রতি যে প্রেমাসক্ত একথা তার স্বামীকে জানায়। অচিরেই ভ্রণস্কির ঔরসে আনার একটি কন্যাসন্তান জন্মে। প্রেমাস্পদ ভ্রণস্কিকে পূর্ণভাবে পাবার জন্য সকল দ্বিধা উপেক্ষা করে স্বামী-ঘর-সংসার-সমাজ সব ছেড়ে আনা তার সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করে, সঙ্গে নিয়ে যায় শিশুকন্যাকে, কিন্তু ফেলে রেখে যায় আটবছরের প্রিয় পুত্রকে। ভ্রণস্কি হারাল তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সম্ভ্রান্ত সমাজ মর্যাদা,

নৈতিক প্রতিষ্ঠা। দেশ দেশান্তর ঘুরে তারা একত্র জীবনযাপন করতে থাকে; কিন্তু প্রেমের নতুনত্ব কেটে যেতে বেশী দিন লাগল না এবং সঙ্গে শুরু হল ভুল বোঝাবোঝির পালা। ক্রমে আনা ভ্রণস্কির প্রেমে সন্দিহান ও ঈর্ষাকাতর হ'য়ে উঠল। ভ্রণস্কির প্রেমনিষ্ঠায় যতই সে বিশ্বাস হারাল ততই তার হৃদয়ের টান প্রবল হয়ে পড়ল তার একমাত্র অবলম্বন প্রিয় পুত্রের জন্য। ভ্রণস্কির ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরে রাখার ব্যর্থ প্রয়াসে তার সম্ভ্রম, নৈতিক বল, এমন কি দৈহিক সৌন্দর্য ও কমনীয়তা রূপান্তরিত হল ছলনাময়ীর ভূমিকায়। নিরুপায় হয়ে গোপনে সে দেখতে গেল তার নিজের বাড়ীতে তার প্রিয় পুত্রকে। কিন্তু এই সাক্ষাৎ শান্তির পরিবর্তে তার জীবনে আনল গভীর নৈরাশ্য। চারিদিক থেকে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘিরে দাঁড়াল তার জীবনকে এবং সর্বশেষে সে এই নৈরাশ্যময় জীবনের পরিসমাপ্তি করল চলন্ত ট্রেনের নীচে আত্মহত্যা বরণ করে। শোকাহত ভ্রণস্কি প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিল তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে। এই করুণ বিয়োগান্ত কাহিনীর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বিবৃত হয়েছে কিটি-লেভিনের প্রেম, তাদের বিবাহ, সহর থেকে দূরে গ্রামের প্রশান্তির মধ্যে, লেখকের আদর্শ অনুযায়ী তাদের সবল সুখী, নির্বিঘ্ন জীবন। সংক্ষেপে এই হ'ল 'আনা কারেনিনা'র আখ্যানভাগ।

গৃহদাহের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার এইরূপ। ধৈর্যশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ, স্বল্পভাষী ও সংযমী মহিম এবং আবেগচঞ্চল, পরোপকারী উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও কোমলহৃদয় সুরেশ দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরস্পরের পরমহিতকামী। সুরেশ ডাক্তার আর মহিম আইনের স্নাতকোত্তর। মহিম গ্রাম্য দরিদ্র পরিবারের সন্তান আর সুরেশ কলকাতা নগরীর ধনী পিতার একমাত্র সন্তান ও স্বর্গত পিতার বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী। হিন্দু মহিম ব্রাহ্মকন্যা অচলার প্রেমপাত্র ও পাণিপ্রার্থী। তাদের বিবাহ-অনুষ্ঠান প্রস্তুতির পথে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষভাবাপন্ন সুরেশ বন্ধুর কল্যাণার্থে এই বিবাহের একান্ত বিরোধী। বন্ধু মহিমের অন্বেষণে একদিন সে অচলাদের বাড়ী এসে প্রথম দর্শনেই অচলার প্রেমে পড়ল। আবেগশীল অনুশাসন-শিথিল সুরেশ এই প্রেমের আকর্ষণে ভারসাম্য হারাল। অচলার

কল্যাণার্থে মহিমের দারিদ্র্যের নজির দেখিয়ে সুরেশ নিজেই অচলার পাণিপ্রার্থী হ'ল। কিন্তু অচলা সুরেশের ভালবাসা ও পিতার উপদেশ অগ্রাহ্য করে মহিমের প্রতি তার প্রেমনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখল। অচিরেই অচলা ও মহিমের বিয়ে হয়ে গেল এবং অচলা স্বামীর ঘর করতে তার গ্রামের বাড়ীতে স্বামীর সঙ্গে চলে গেল। কিন্তু সুরেশের আবেগময় প্রেমের উত্তপ্ত স্পর্শ অচলার অবচেতন মনে প্রতিধ্বনিত হ'ল এবং তার সচেতন মনের অজ্ঞাতে অতর্কিত ব্যবহার সুরেশের কামনাকে উৎসাহ দান করল। অচিরেই গ্রামের বিরুদ্ধ পরিবেশ, মহিমের কঠিন ব্যক্তিত্ব ও অন্যান্য প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে অচলা মহিমের প্রতি তার প্রেম অস্বীকার করল। ঠিক এমনি সময়ে আগুন লেগে মহিমের বাড়ী ভস্মসাৎ হয়ে যায় এবং অচলা সুরেশের সঙ্গে বাপের বাড়ী ফিরে আসে। সুরেশ অসুস্থ মহিমকে কলিকাতায় তার নিজের বাড়ীতে এনে অচলাকে তার সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত করল। পরে বায়ুপরিবর্ত্তন উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যকর স্থানে যাবার পথে রুগ্ন মহিমকে একাকী ট্রেনে পরিত্যাগ করে সুরেশ ছলে অচলাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হ'ল। দেশান্তরে তারা স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে বাস করতে লাগল এবং সেখানে অচলার হৃদয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুরেশ তার দেহমন, অফুরন্ত ঐশ্বর্য সব কিছু অচলার সেবায় নিয়োগ করল। কিন্তু অচলার হৃদয় তার অপ্রাপ্যই রয়ে গেল। এই আত্ম-বঞ্চনার হতাশায় যখন তার চিত্ত অনুতাপে দংশনবিদ্ধ ও জর্জ্জরিত, তখন মৃত্যুভয়হীন পরোপকারী সুরেশ প্লেগ মহামারী-আক্রান্ত গ্রামে রুগ্নের সেবা-চিকিৎসায় নিযুক্ত অবস্থায় নিজে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল। সুরেশের মৃত্যুশয্যায় অচলা ও সুরেশের অনুরোধে মহিমও উপস্থিত ছিল। সুরেশের দাহ সম্পন্ন করে মহিম অচলাকে সুরেশের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে স্বস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

অতি সংক্ষেপে বর্ণিত উপরোক্ত দুটি আখ্যায়িকা অবলম্বন ক'রে এই দুই উপন্যাসের লেখক চরিত্রচিত্রণের কুশলতায় ও মনঃবিশ্লেষণের গভীরতায় যে নিদর্শন প্রকট করেছেন, তা এই গ্রন্থদ্বয়কে বিশিষ্টতা ও গৌরবদান করেছে। উভয় উপন্যাসেই আখ্যায়িকার নিজস্ব তেমন কোন

অভিনবত্ব নেই, চরিত্র-চিত্রণ ও মনঃবিশ্লেষণের অবলম্বন হিসেবেই আখ্যায়িকা সার্থকতা লাভ করেছে।

'আনা কারেনিনা'র মুখ্য চরিত্র যেমন আনা, তার স্বামী ও তার প্রেমিক ভ্রনস্কি, তেমনি 'গৃহদাহে'র প্রধান চরিত্র অচলা, তার স্বামী মহিম ও তার প্রতি প্রেমমুগ্ধ সুরেশ। উভয় উপন্যাসেই অদৃশ্য লিখনের মত প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেমের অঙ্কুর সঞ্জাত। উভয় নারীর স্বামী নারীর স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি ও প্রেমজীবনের প্রতি উদাসীন। উভয় স্বামীই প্রকটরূপে আত্মকেন্দ্রিক। পরিমিত ব্যবহারের ধর্মে স্বল্পভাষী ও সংযমী মহিমের হৃদয়ের অনুভূতিগুলির প্রকাশ অবরুদ্ধ। যে অচলার সে প্রেমমুগ্ধ ও যাকে ভালবেসে সে বিয়ে করলে, তার কাছে অন্তরের নিভৃত প্রকোষ্ঠ উদ্‌ঘাটন করে' তাকে সুখ-দুঃখের অংশীদার করে' যথার্থ জীবনসঙ্গিনীর মর্যাদা সে দিতে পারে নি। নিয়মতান্ত্রিকতা ও সামাজিক মর্যাদার দাস, নীরস, ভাবলেশহীন কারেনিন নিজের স্ত্রীকে তার গৃহের আসবাবের অতিরিক্ত কিছু বলে মনে করতে পারে নি। আনার যে একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র জীবন আছে এবং সেই জীবনের পরিপূর্ণতা যে দাম্পত্যজীবনে পারস্পরিক স্বাভাবিক দাবীর চরিতার্থতার উপর নির্ভরশীল, এ বিষয়ে মহিমের মত কারেনিনও সমভাবে উদাসীন। উভয় নারীই স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করে পরপুরুষের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মত মিলিত জীবন যাপন করেছে দেশান্তরে। সেই প্রেমসঙ্গ উভয় যুগলকে শান্তি ও চরিতার্থতা দান করতে পারে নি, পরন্তু কিয়ৎকাল পরেই প্রেমের আবরণ উন্মোচন করে দেখা দিয়েছিল আত্মপ্রবঞ্চনা ও নৈরাশ্য। উভয় উপন্যাসের পরিসমাপ্তি প্রেমিক যুগলের মধ্যে একের অকাল ও অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এবং অপরের জীবনের নিষ্ফলতায়। মহিমের অসুখের সময় যেমন অচলা-মহিমের সম্পর্ক প্রায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তেমনি সন্তান প্রসবের পর আনার কঠিন অসুখের সময় ও পরে আনা-কারেনিনের সম্পর্কও প্রায় সামঞ্জস্য লাভ করেছিল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এই পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় সুরেশ যেমন নিজেকে অন্তরালে সরিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছিল, তেমনি ভ্রনস্কিও আনাকে পাবার আশা ত্যাগ করে দূরদেশে নিজেকে সরিয়ে

নেবার ব্যবস্থা করেছিল। উভয় ক্ষেত্রেই প্রেমিকার আহ্বান ও ইঙ্গিতেই তারা আবার প্রেমিকার প্রণয়জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল।

কারেনিনের ভগ্নগৃহ ও তিক্ত হৃদয়ের প্রতি আলেখ্যরূপে টলস্টয় যেমন কিটি-লেভিনদের শান্তিপূর্ণ সুখী জীবনের চিত্র মূল কাহিনীর পাশাপাশি অঙ্কিত করেছেন, শরৎচন্দ্রও তেমনি অচলার সমাজ-বিরুদ্ধ হৃদয়-বৃত্তি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতি আলেখ্যরূপে মৃণালের একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের চিত্র এঁকেছেন। উভয় শিল্পীর উদ্দেশ্য বিপরীত মাধ্যমে মূল কাহিনীকে উজ্জ্বলতা দান করা।

লেভিনকে যেমন মস্কো শহরের বিদগ্ধ সমাজের পাণ্ডিত্যের প্রভাব তার জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে নি এবং সেই উত্তর সে পেয়েছিল শহর থেকে দূরে কৃষকের সরল শান্ত গ্রাম্যজীবনের মধ্যে, তেমনি কেদার-বাবুও জীবনের সত্য ও ক্ষমার দৃষ্টি কলকাতার বিদগ্ধ ব্রাহ্মসমাজে সারা জীবন বাস করেও পান নি, পেয়েছিলেন গ্রাম্য বাল-বিধবা মৃণালের ও গ্রামের কৃষকদের সরল জীবনের মধ্যে

টলস্টয় বলেছিলেন "**If a book has to be any good, you have to love the central idea it expresses. In 'Anna Karenin' I loved the idea of family**"[৩]; পারিবারিক সম্পর্ক এবং তার ভাঙন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেরও মূল বিষয়বস্তু তাই লেখক তার উপন্যাসের সার্থক নাম রেখেছেন 'গৃহদাহ'।

সঙ্কেতের ব্যবহারেও উভয় উপন্যাসের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। 'আনা-কারেনিনা'য় আনা-ভ্রনস্কির প্রথম সাক্ষাতের ক্ষণে ট্রেনের তলায় দুর্ঘটনায় একজন গার্ডের মৃত্যু-ঘটনা উপন্যাসের শেষের দিকে ট্রেনের চাকার নীচে আনার মৃত্যুর সঙ্কেত বহন করে। তেমনি 'গৃহদাহে'র প্রথম দিকে সুরেশের নিজের জীবন বিপন্ন করে প্লেগাক্রান্ত বন্ধু নিশীথের সেবা এবং ফয়জাবাদ শহরে প্লেগমহামারীতে আর্তের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় আত্ম-নিয়োগ, শেষের দিকে সে-ই প্লেগরোগেই সুরেশের মৃত্যুর ব্যঞ্জনা বহন করে। ভ্রনস্কির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর মস্কো থেকে পিটার্সবার্গ ফেরার দিন তুষারঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দুর্যোগ যেমন আনার অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতীক, তেমনি

স্বাস্থ্যপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জব্বলপুর যাবার ট্রেণযাত্রার পথে ঝঞ্ঝাবিদ্যুত-সৃষ্ট তাড়িত দুর্যোগ সুরেশের অন্তরের উত্তাল আলোড়নের প্রতীক।

অতএব, দেখা যায় যে মূল আখ্যায়িকা, আখ্যায়িকার ঘট বিন্যাস, চরিত্র পরিকল্পনা, কাহিনীর আরম্ভ ও পরিণতি, সংকেতর ব্যবহার, জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তরের উৎস প্রভৃতি বিষয়ে এই দুটি উপন্যাসের সাদৃশ্য এত প্রখর যে প্রথম দৃষ্টিতে পরবর্তী উপন্যাসের উপর পূর্ববর্তী উপন্যাসের প্রভাবের কথা ওঠা অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু নিবিড়ভাবে একটু প্রণিধান করলে দেখা যাবে যে এই সাদৃশ্যের অন্তরালে চরিত্রাঙ্কন, মনঃবিশ্লেষণ ও সামগ্রিক আবেদনের দিক থেকে এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে গভীর পার্থক্য বিদ্যমান। প্রতারিত স্বামীর ভূমিকায় কারেনিন ও মহিম সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর চরিত্র, প্রণয়িণীর চরিত্রে প্রেমের প্রকাশ প্রকৃতি ও পরিণতিতে আনা ও অচলা নারীহৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সঞ্চারিণী, প্রেমিক হিসাবে যথেষ্ট সাদৃশ্য সত্ত্বেও সুরেশ ও ভ্রণস্কি মনঃস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম অনুভূতিতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিস্বরূপ।

৩

নারীহৃদয়ের দিক থেকে মহিম ও কারেনিন প্রায় একই জাতের মানুষ। কারেনিনের কথা নারী চিত্তে প্রবেশের চাবিকাঠি তাদের মত লোকের হাতে নেই। কারেনিনের সরকারী পদমর্যাদা ও সাফল্য, তার ঐশ্বর্য-মণ্ডিত বিলাসসমৃদ্ধ জীবন হৃদয়বত্তার অভাবে আনার জীবনকে মাধুর্য ও তৃপ্তিদান করতে পারে নি। তার জীবনের শিষ্টাচার ও নিয়মতান্ত্রিকতার বন্ধন ঘড়ির কাঁটার মত স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারেও অটুট ও অক্ষুণ্ণ ছিল। আনার কাছে এই হৃদয়হীন বিপুল সমৃদ্ধি প্রাণহীন বস্তুপিণ্ডের নির্দয় নিষ্পেষণের অনুরূপ ছিল মহিমের দারিদ্র্য ও গ্রামের বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে তার নীরব কর্তব্যনিষ্ঠা ও সংযত ব্যবহার, মৃণাল সম্পর্কে তার সঙ্কোচ অচলার চিত্তেও ঠিক অনুরূপ অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল। শিল্পকৌশলের দিক থেকে আনার মনে যে প্রতিক্রিয়া কারেনিনের ঐশ্বর্যবান অথচ নীরস, নিয়মানুগ অনুভূতিহীন জীবন দ্বারা টলস্টয় সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপ প্রতিক্রিয়া অচলার মনে সৃষ্টি করেছেন শরৎচন্দ্র মহিমের দারিদ্র্যপীড়িত

জীবনের ভাবলেশহীন নীরব আত্মতন্ময়তা দ্বারা।

স্বামীর কাছে ভ্রণস্কির প্রতি সে প্রেমাসক্ত এই স্বীকৃতি করার পরের দিন শৈলাবাসে কারেনিনের একটি চিঠি পড়ে সে যে নিজের কাছে নিজে নিজেই বলে উঠল "Yes vile, base creature ! . They say he's religious so high so principled, so upright, so clever, but they don't see what I've seen. They don't know how he had crushed my life for eight years, crushed everything that was living in me. He has not once given thought that I'm a live woman who must have love "[৪] নিজের স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত এবং সেকথা স্ত্রীর নিজের মুখ থেকে শুনেও কি করে কারেনিন সেই স্ত্রীর সঙ্গে একই বাড়ীতে বাইরের ঠাট বজায় রেখে বাস করতে পারে ভ্রণস্কি এই পরিস্থিতি বুঝবার অক্ষমতা প্রকাশ করলে আনা বলেছিল "He's not a man, not a human being—he's a puppet ! ...... He's not a man , he's an official machine He doesn't understand that I'm your wife, that he's outside, that he's superfluous ... '[৬] আনা নিজমুখে স্বামীর মুখের উপর বলেছিল "I love him, I am his mistress, can't bear you ; I'm afraid of you, and I hate you .... you can do what you like to me "[৭] মহিমের বাড়ী পুড়ে যাবার আগের দিন গ্রামের বাড়ীতে মহিমের মুখের উপরও অচলা আর্তস্বরে সুরেশকে বলেছিল "সুরেশবাবু, তুমি ছাড়া আমাদের অসময়ের বন্ধু কেউ নেই। তুমি বাবাকে গিয়ে ব'লো এরা আমাকে বন্ধ করে রেখেছে, কোথাও যেতে দেবে না—আমি এখানে মরে যাবো। সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও,—যাকে ভালবাসি নে, তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।"[৮] অচলার এই আর্তকণ্ঠ আনার "Was ever a woman so miserable as I am ?"[৯] এই দীন আকুতিকে স্মরণ করিয়া দেয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে মহিমের মত কারেনিনও সংসারে একা।

শিশুকালে ভাইকেও জীবনের প্রারম্ভেই হারাল। তার সুখদুঃখের অংশীদার সংসারে কেউ ছিল না। মহিমও শৈশবে মাকে হারায়, বড় দুইভাই ছোট বয়সেই মারা যায়, বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারে সে একা। তার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল বাপের আশ্রিত পরিবারের কন্যা মৃণাল—তার চেয়ে আট বছরের ছোট। আর ছিল তার অন্তরঙ্গ পরমহিতৈষী আশৈশব বন্ধু সুরেশ। কিন্তু আত্মসম্পূর্ণ মহিম তাদের কাউকেও কোনদিন তার দুঃখের অংশীদার করে নি তেমনি কারেনিন ছিল "incapable of friendship", তার কোন বন্ধু ছিল না যে তার দুর্দিনে তার দুঃখের অংশীদার হতে পারে। হয়ত শিশুকালে তাদের সুখদুঃখের অংশীদার কেউ ছিল না বলেই বড় হয়ে তাদের দুঃখের বোঝা অন্যের সঙ্গে ভাগ করতে তারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় নি, চেষ্টাও করে নি। এই দুজনেরই জীবনের একাকীত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কিন্তু এই দুটি চরিত্রের আপাত সাদৃশ্যের অন্তরালে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রতারিত স্বামীর চরিত্র-চিত্রণে শরৎচন্দ্র টলষ্টয়ের থেকে ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছেন। টলষ্টয় যেমন কারেনিনকে সর্বরকমে আনার ঘৃণার পাত্র করে চিত্রিত করেছেন, শরৎচন্দ্র মহিমকে কখনও অচলার শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত করেন নি—এমন কি ভালবাসা থেকেও নয়। টলষ্টয় কারেনিনের মনকেই শুধু নীরস, ভাবলেশহীন, নিয়মানুবর্তিতার দাস বলে চিত্রিত করেন নি, এমন কি তার দেহটিকেও ঘৃণা ও উপহাস-যোগ্য করে বর্ণিত করেছেন। কারেনিনের কথা বলার ভঙ্গী সর্বদাই বিদ্রূপাত্মক, ফলে serious হতে চাইলেও তার সে চেষ্টা বিদ্রূপে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তার গলার স্বর সরু ও কর্কশ, তার চলনভঙ্গী 'awkward', আঙুল ফোটানো তার একটা বদ্ অভ্যাস, এমন কি গুরুতর আলোচনার সময়েও সেই বদ্ অভ্যাস সে ছাড়তে পারে না, কারো চোখে জল দেখলে সে nervous হয়ে পড়ে, সে কাপুরুষ, সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করে আত্মরক্ষায় অসমর্থ, ভীতচিত্তে দ্বৈত যুদ্ধের কথা ভাবতে ভাবতে কাল্পনিক বিপদাশঙ্কায় সে চমকে ওঠে। ভ্রষ্টা স্ত্রীর সঙ্গে বাইরের ঠাট বজায় রেখে একই গৃহে বাস করতে তার কোন

দ্বিধা নেই, যদি তার স্ত্রীর ভ্রষ্ট বাইরের জীবনে কোন সাক্ষী না থাকে। এমন কি কারেনিনের পরম দুঃখের মুহূর্তেও টলস্টয় তাকে উপহাসের হাত থেকে রেহাই দেন নি। তার নিজের গৃহে আনা তার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বচসার সময় যখন সে বলতে গেল, আনা যে তার জীবন বিনষ্ট করছে তার কোন পরোয়া করে না এবং বুঝতে চায় না যে সে কত দুঃখ পাচ্ছে, এবং উত্তেজনা বশে সে তোতলামি করে 'suffering' কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে 'thuffering' বলে ফেলল, তখন তার জন্য কিছুমাত্র সমবেদনা অনুভব না করে আনার হাসি পেয়ে গেল।[১০] এই প্রকার বিভিন্ন মর্মন্তুদ পরিস্থিতিতেও টলস্টয়ের নিষ্করুণ লেখনী কারেনিনের জন্যে এতটুকু সহানুভূতি আনার হৃদয়ে কখনও দেন নি—দিয়েছেন কেবল ঘৃণা এবং ঘৃণার পাত্র করতে গিয়ে লেখক কারেনিনকে প্রায় একটি clown এর ভূমিকায় পর্যবসিত করে ফেলেছেন।

প্রতারিত স্বামীর এ প্রকার চরিত্র বাস্তবতায় দিক থেকে অর্থপূর্ণ হলেও মনঃস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের গুরুত্বের পক্ষে যে অনুকূল নয একথা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তি হিসাবে হেয় ও ঘৃণ্য প্রতিপন্ন হলে স্বামীর পদ ও মর্যাদা থেকে অপসারণ অবশ্যম্ভাবী। শ্রদ্ধার বায়ুতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে না পারলে ভালবাসা বাঁচে না। স্ত্রীর মনে ভালবাসার আসন শূন্য পড়ে থাকলেও, সেখানে ঘৃণ্য ব্যক্তির পাট আপনিই উঠে যায় কাউকে জোর করে উঠাতে হয় হয় না। সেখানে স্ত্রীকে মনের এই শূন্য আসন পূর্ণ করতে কোন মানসিক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হয় না। আনা যেমন কারেনিন সম্বন্ধে অবলীলাক্রমে "...... he's outside, he's superfluous."[৫] I don't know him, I don't think of him He doesn't exist"[১১]

শরৎচন্দ্র কিন্তু এইরূপ সহজ পথ অনুসরণ করেন নি। নারীর প্রণয় জীবনের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তা স্ত্রীর শূন্য হৃদয়ে একজন পরপুরুষের প্রতিষ্ঠা ও তার বিস্মিত অভিষেকের ব্যর্থ পরিণতি মাত্র নয়। শরৎচন্দ্রের চিত্র নারীর প্রণয়-জীবনের গভীর দ্বন্দ্ব ও দ্বিধার চিত্র। সুরেশের স্থান

অচলার হৃদয়ের শূন্য আসনে নয়, সেখানে মহিমেব আসন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমেব সঙ্গে অক্ষুণ্ণ। সচেতন চিত্তেব অতর্কিতে অবচেতনে সেখানে সুবেশেব আসা-যাওয়া। মানব-চিত্ত তথা নারীহৃদয় যে একটি মাত্র স্তবেই নিবদ্ধ নয়, তাতে যে একাধিক স্তব থাকতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষার আবেদন বিভিন্ন স্তরে গোপনে সঞ্চরণ করতে পারে এই গভীব মনঃস্তত্ত্ব-মূলক বিশ্লেষণই শবৎচন্দ্রের চিত্রকে এক দুর্লভ বিশিষ্ট গভীবতা দান কবেছে। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এই দুটি উপন্যাসেব মূল পার্থক্য এবং বাস্তবতা ও মনঃস্তত্ত্বেব দিক থেকে শরৎচন্দ্রের কাহিনীর আপেক্ষিক গুরুত্ব নিহিত।

বেট্‌সির বাড়ীর পার্টিতে আনা ও ভ্রণস্কিকে হলেব এক কোনে নিভৃতে আলাপবত এবং সকলের কৌতূহল দৃষ্টি ঐদিকে আকৃষ্ট দেখে কাবেনিনেব মন বিরূপ হ'ল এবং বাড়ী ফিরে রাত্রেই আনাকে তার অসন্তুষ্টিব কথা জানাল, এবং ভবিষ্যতেব জন্যে সাবধান কবে দিল। নিষেধ সত্ত্বেও একদিন ভ্রণস্কিকে তার বাড়ী প্রবেশ কবতে দেখে এ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তুমুল বাগবিতণ্ডা করল divorce দেবে না, দিলেও ছেলেকে দেবে না ইত্যাদি বলে শাসাল। মনে মনে আনাকে 'corrupt, guilty women' বলে গালমন্দ কবল, প্রতিহিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। আনা অসুস্থ হয়ে মবণাপন্ন হলে তার সমস্ত অপবাধ ক্ষমা করে যে উদাবতা ও মহানুভবতা সে দেখালো, আনা সুস্থ হয়ে উঠবাব অব্যবহিত পবেই সেই উদাবতা ভুলে গিয়ে আবার স্ব-মূর্ত্তি ধাবণ কবে' প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে উঠল। ঠিক অনুরূপ ক্ষেত্রে—যেমন মহিমের গ্রামেব বাড়ীতে অচলা ও সুরেশেব অতি ঘনিষ্ট ব্যবহার পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করেও—মহিম কখনও স্ত্রীকে একটিবারের জন্যও রুক্ষ কথা দূরে থাকুক, তাব উল্লেখ পর্য্যন্ত করে নি। মহিম ভাল করেই জানে যে জোর আর যার উপরেই খাটানো যাক না, মানুষের মনের উপর তা খাটে না। তাই সুবেশ ও অচলার ব্যবহারে মহিম কখনও লজ্জিত বা নিজেকে অপবাদদুষ্ট মনে করে নি, পরন্তু বিব্রত ও লজ্জিত বোধ করেছে অচলা ও সুরেশ। মহিমের অবিচলিত ভাবে অচলা বিরূপ বিব্রত বোধ কবেছিল সে সম্পর্কে গ্রন্থকার লিখেছেন: "স্বামীব অবিচলিত গাম্ভীর্যেব কাছে

এই কদাকার ভাঁড়ামিতে, এত বেহায়াপনায় তাহার ক্ষোভে, অপমানে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাহাকে আজও হৃদয়ের দিক হইতে চিনিতে না পারিলেও বুদ্ধির দিক হইতে চিনিয়াছিল। সে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল এই তীক্ষ্ণ-ধীমান্ অল্পভাষী লোকটির কাছে এ অভিনয় একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, অথচ লজ্জার কালিমা প্রতি মুহূর্তেই যেন তাহারই মুখের উপর গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে . ."[১২]

রোজই মহিম সকালে তার মাঠের চাষবাস দেখতে যেত। মহিম সেদিনও গেছে কিনা একদিন সুরেশের এ প্রশ্নের উত্তরে অচলা বলেছিল "পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে গেলেও তার অন্যথা হবার যো নেই।"[১৩] সুরেশ বলল "....তার কাজের একটা গতি আছে, যা কলের চাকার মত যতক্ষণ দম আছে ততক্ষণ চলবেই।" কলের মত হওয়াটা যে ভাল নয় সেটাই ইঙ্গিত করে অচলা বলল "কলের মত হওয়াটাই কি আপনি ভাল মনে করেন?"[১৩] একটু পরেই ভৃত্যের কাছে জানা গেল মহিম সেদিন সকালে মাঠের কাজে নিত্যকার মত যায় নি, তার পড়ার ঘরে ঘুমোচ্ছে। অচলা বিস্মিত হয়ে দরজার বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখল মহিম চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে দুই পা টেবিলের উপর রেখে ঘুমোচ্ছে। সে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে মহিমের মুখের দিকে চেয়ে রইল। "সম্মুখে খোলা জানালা দিয়া প্রভাতের অপর্যাপ্ত আলোক সেই নিদ্রামগ্ন মুখের উপর পড়িয়াছিল। আজ অকস্মাৎ এতদিন পরে তাহার চোখের উপর এমন একটা নতুন জিনিষ পড়িল যাহা ইতিপূর্বে কোনদিন সে দেখে নাই। আজ দেখিল, শান্ত মুখের উপর যেন একখানা অশান্তির সূক্ষ্ম জাল পড়িয়া আছে, কপালের উপর যে কয়েকটা রেখা পড়িয়াছে এক বৎসর পূর্ব্বেও সেখানে সে সকল দাগ ছিল না। সমস্ত মুখের চেহারাটাই আজ যেন তাহার মনে হইল, কিসের গোপন ব্যথায় শ্রান্ত পীড়িত।"[১৪] স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তির সম্পর্ক মহিমের শান্তমনে যে কত গভীর অশান্তির রেখাপাত করেছিল এবং সে যে মোটেই কলের মত নয়, রক্তমাংসের মানুষের মত বেদনায় অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হয়েও বাইরে স্থির, অচঞ্চল, তা দেখে অচলা বিস্মিত হয়ে গেল। এমন কোন

দৃষ্টিতে কারেনিনের দুঃখকে দেখতে টলস্টয় আনাকে কোন দৃষ্টি দেন নি। কারেনিনের দুঃখে ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে আনা ভেবেছিল "can a man with those dull eyes, with that self-satisfied complacency, feel anything?"[১৫]

আর একদিনের ঘটনা যেদিন দুপুরবেলা অচলা মহিমের মুখের উপরই সুরেশকে বলেছিল যে সে যাকে ভালবাসে না তার ঘর করতে সুরেশ যেন তাকে ফেলে রেখে না যায়। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাইরের ঘরে অচলা দু'পেয়ালা চা তৈরী করে যেই উঠতে যাচ্ছিল, মহিম তাকে একটু অপেক্ষা করতে ব'লে দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। নিমেষে মহিমের ছয়নালা বন্দুকের কথা সুরেশের মনে পড়ল, তার হাতের পেয়ালা কেঁপে উঠে কতকটা চা মাটিতে পড়ে গেল এবং মুখখানা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। সেই ভয়ে অচলারও মাথার চুল কাঁটা দিয়ে উঠল, চীৎকার করতে গিয়ে ভয়ে মুখে শব্দ বের হল না। মহিম তাদের ভয়ের কারণ বুঝতে পেরে বলল "চাকরটা না এসে পড়ে এই জন্যেই—নইলে পিস্তলটা আমার চিরকাল যেমন বাক্সে বন্ধ থাকে, এখনো তেমনি আছে। তোমরা এত ভয় পাবে জানলে দোর বন্ধ করতাম না।"[১৬] সুরেশকে বলল "প্রাণের মায়া তোমার নেই বলেই আমি জানতাম। সুরেশ, আমার নিজের দুঃখের চেয়ে তোমার এই অধঃপতন আমার বুকে আজ বেশী করে বাজল। যাতে তোমার মত মানুষকেও এত ছোট করে আনতে পারে—না, সুরেশ, কাল তুমি নিশ্চয় বাড়ী যাবে। কোন ছলে আর দেরী করা চলবে না।"[১৭]

কারেনিনের ব্যঙ্গাত্মক ও আনার চরিত্রের তুলনায় মহিমের এ চরিত্র কত মর্যাদাসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাযোগ্য এই অন্তর্মুখী কঠিন ব্যক্তিত্বের জোরে মহিম অচলার যে ভালবাসার অধিকারী হয়েছিল, সেই ভালবাসার আসন থেকে তাকে সুরেশের আবেগময় প্রণয় নিবেদন ও অচলার দোদুল্যমান হৃদয়বৃত্তি সম্পূর্ণ টলাতে কখনও পারে নি। তাই মৃত্যুশয্যায় সুরেশ অচলাকে বলেছিল "...... মস্ত ভুল হয়েছিল এই যে মহিমকে তুমি যে এতটা ভালবাসতে তা আমিও বুঝি নি, বোধ হয় তুমিও কোনদিন বুঝতে পারো নি! না?[১৮]

কারেনিনের প্রতি আনার ঘৃণা এত প্রবল ছিল যে এমন কি ভ্রণস্কির প্রতি তার অদম্য ভালবাসার চরিতার্থতার খাতিরেও সে কারেনিনের কাছে divorce প্রার্থনা করে নিজেকে অবমাননা করতে চায় নি ; এমন কি এত যে প্রিয় তার পুত্র তার জন্যেও নয়। কেবলমাত্র ভ্রণস্কির এবং ভ্রণস্কির অনুরোধে দারিয়ার পীড়াপীড়িতে অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও divorce প্রার্থনা করতে সে রাজী হয়েছিল মোট কথা, কারেনিনকে ছোট করে টলষ্টয় আনার সমস্যাটাকেই লঘু করেছেন, অপরপক্ষে, শরৎ-চন্দ্র মহিমকে মহান করে অচলার অন্তর্দ্বন্দ্বকে অধিকতর গুরুত্ব ও গভীরতা দান করতে সক্ষম হয়েছেন।

৪

কারেনিন ও মহিমের চরিত্র আপাত সাদৃশ্য সত্ত্বেও যেমন ভিন্নমুখী, তেমনি আনা ও অচলার চরিত্র চিত্রণেও দুই লেখকের মধ্যে গভীর পার্থক্য দেখা যায়। ভ্রণস্কির সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে আনা যেখানে ভ্রণস্কির সঙ্গে সমভাবে অগ্রণী, অচলা সেখানে আত্মসংবরণশীলা ও সংযম-প্রয়াসিনী। সুরেশের প্রতি তার আসক্তি মহিমের প্রতি তার ভালবাসার আবরণে বিধৃত—এবং সেই আবরণ ভেদ করে তার অতর্কিত প্রকাশ। বিলাসলিপ্ত আটবছরের বিবাহিত জীবনের অসার ও অতৃপ্ত অস্তিত্ব থেকে হঠাৎ জেগে-ওঠা প্রেম দুর্নিবার বেগে আনাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, বিগত জীবনের সকল বন্ধন থেকে ঝড়ের বেগে ক্ষুব্ধ দরিয়ায় ছিন্নরজ্জু তরীর মত. এমন কি একমাত্র সন্তানের জন্য মোহও তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করলেও প্রেমের প্রবল স্রোত তাকে টেনে রাখতে পারে নি। আনার এই উন্মুখ সর্বগ্রাসী, সর্বত্যাগী প্রেমাভিসারের পদঝঙ্কারের তুলনায় সুরেশের প্রতি অচলার আসক্তি পর্দার অন্তরালে মৃদু কঙ্কণধ্বনি মাত্র।

মস্কোতে ভ্রণস্কির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর পিটার্সবার্গে ফিরে এসে আনা সক্রিয়ভাবে পিটার্সবার্গের সেই সামাজিক স্তরে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে লাগল—যেখানে সে ভ্রণস্কির সান্নিধ্য পায়, ভ্রণস্কিও একাগ্রমনে আনার অনুসরণ করতে লাগল সেই সামাজিক স্তরে। অবশেষে "That which had been for almost a whole year

the one absorbing desire of Vronsky's life, replacing all his old desires, that which for Anna had been an impossible, terrible, and even for that reason more entrancing dream of bliss, that desire had been fulfilled."[১৯] ফলে আনা গর্ভবতী হ'ল ভ্রণস্কির সন্তান ধারণ করে।

টলষ্টয়ের চরিত্র অঙ্কন সম্পর্কে বলা হয় "Tolstoy is a creator of 'souls' only to a limited extent Unlike Dostoevsky, Tolstoy does not often concern himself with supernatural religion and with mystical impulses, and his characters are not primarily created from the inside out. Tolstoy's souls are created by the substitution of the moral and ethical for the spiritual and the mystical "[২০]

এইখানেই শরৎচন্দ্রের অচলা চরিত্র ও টলষ্টয়ের আনা চরিত্রের রূপায়নের পার্থক্য নিহিত। আনার সমস্যার মূলে আছে কারেনিনের সঙ্গে প্রেমহীন বিবাহ, সামাজিক নিগ্রহ, কারেনিনের অনমনীয় মনোভাব, তা divorce দানে অস্বীকৃতি, পুত্রের প্রতি মোহ, ভ্রণস্কির উদাসীনতা। এ সব বাধা বাইরের। এমন কোন সমস্যা আনার জীবনে আসে নি যার মৌলিক ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে তার নিজের অন্তরে। ভ্রণস্কির ভালবাসায় তার সন্দেহের মূলে আছে আনার তার পুত্রের প্রতি ভালবাসা যে কত গভীর এবং মায়ের পক্ষে সন্তানকে হারানো যে কত বেদনাদায়ক, এই দিকটার প্রতি ভ্রণস্কির উদাসীনতা। তা ছাড়া অনেক ত্যাগ স্বীকার করলেও ভ্রণস্কি ভালবাসার শৃঙ্খলে তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উৎসর্গ করতে রাজী ছিল না। চারিদিক থেকে যে অন্ধকার আনার জীবন ঘিরে এসেছিল ভ্রণস্কির এই উদাসীনতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা সেই অন্ধকারকে গাঢ়তর করে আনার একমাত্র আশার প্রদীপকেও নির্বাপিত করেছিল।

কিন্তু অচলার জীবনে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে তার উৎস ছিল তার নিজের মন। তার জীবনে সুরেশের আবির্ভাব যখন হ'ল তখনও তার বিয়ে হয় নি। পতি নির্বাচনে তার স্বাধীনতার পরিপন্থী

কিছু ছিল না। নিজের মনের স্বাধীন পথ ধরেই মহিমকে সে বিয়ে করেছিল। কিন্তু সেই মনের গভীরেই লুকিয়েছিল তার সমস্যা সুরেশের প্রতি আসক্তিরূপে। সে আসক্তি রূপমুগ্ধের প্রতি আনার আসক্তির মত দুর্বার ও প্রকট ত' ছিলই না, বরঞ্চ গুপ্ত ছিল সচেতন মনের সতর্ক পাহাড়ার বাইরে। কয়েকটি অসতর্ক মুহূর্তের অনবধান প্রকাশমাত্র তার জীবনে এনেছিল বিপর্যয়। সে বিপর্যয়ের কারণ প্রেমহীন বিবাহ, প্রেমিকের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ, বিবাহ-বিচ্ছেদে বাঁধা, সন্তানের প্রতি মোহ, প্রেমাস্পদের ঔদাসিন্য ইত্যাদির মত বাইরের কারণ নয়। অচলার বিপর্যয়ের কারণ তার নিজেব মন। এই দিক থেকে শরৎচন্দ্রের অচলা চরিত্র নারীর মনঃস্তত্ত্ব গৃহেব একটি নিভৃত কক্ষ-উদ্‌ঘাটন। সুবেশেব অদম্য ভালবাসা অচলা চরিত্রে স্পর্শ করতে কখনও অগ্রসর হতে পারত না যদি সুবেশের প্রতি তার আসক্তির আভা সুরেশের তপ্ত প্রেমের উপর না পড়ত। প্রথম যেদিন সুরেশ কেদারবাবুর গৃহে উত্তেজনাবশে অচলাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে তার হাত ধবে হঠাৎ টান দিয়েছিল, অচলা সেদিন সুরেশের এই ব্যবহারকে গর্হিত মনে না কবে, কোন অভিযোগ না করে "মোহমুগ্ধের" মত সুরেশের দিকে তাকিয়েছিল। সিনেমা দেখে বাড়ী ফেরার পথে গাড়ীতে গ্যাসের আলোকে সুবেশের চোখে জল দেখে "মুহূর্ত্তের করুণায় সে কোনদিন যাহা কবে নাই, আজ তাহাই করিয়া বসিল। সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল আমি কোন দিনই বাবার অবাধ্য নই। তিনি আমাকে ত তোমার হাতেই দিয়েছেন।"[২০] তারপর সেই সুরেশকে প্রত্যাখ্যান করে মহিমের সঙ্গে স্বেচ্ছায় তার বিবাহ ; অথচ গ্রামের বাড়ীতে সেই মহিমেরই মুখের উপব সুরেশেব প্রতি কাতরোক্তি "……যাকে ভালবাসি নে তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।" রুগ্ন স্বামী মহিমকে নিয়ে বায়ুপরিবর্তনের জন্য জব্বলপুর যাওয়ার প্রাকালে অতর্কিতে সুরেশকে সঙ্গে যাবার আমন্ত্রণ, রাস্তায় ট্রেণে সুরেশের প্রীতি-মূলক ব্যবহার সমস্তই অচলার সচেতন মনের দ্বারপ্রান্তে অবচেতনের পদধ্বনি। এই আসক্তির মৃদুবাতাস সুরেশের অদম্য প্রেমবহ্নিতে যে কত বড় ইন্ধন

জুগিয়েছিল অচলা বুঝতে পেরেছিল সেইদিন যেদিন ঝড়ের রাত্রে জব্বলপুর যাওয়ার পথে রুগ্ন মহিমকে একা ফেলে রেখে সুরেশ ছলে অচলাকে ট্রেণ থেকে নামিয়ে ভিন্নপথে অগ্রসর হয়েছিল। তারপরের ঘটনাবলী উৎগীর্ণ ধূমরাশির বাত্যাপীড়িত গতিবিধির মত অচলার হাতের বাইরে—উপস্থিত পরিস্থিতি সাপেক্ষ, যাকে বলা যায় fatality. সারারাত্রি বৃষ্টিতে ভিজে সুরেশ যদি ডিহরী ষ্টেশনে অসুস্থ হয়ে না পড়ত, তা হ'লে হয়ত ঘটনাস্রোত বিলম্বে হলেও অচলার হাতের বাইরে যেত না। হেনরী ট্রয়েট বলেছেন "Actions are determined by circumstances, by the circles in which people move, the friends around them, a thousand imponderables collected together under the name of fatality"[২২] তিনি আরও বলেছেন "The fatality that presides over 'Anna Karenina' is not as in 'War and Peace' the God of War, bloated by politics and reeking of carrion and gunpowder, but the breathless god of passion"[২২] অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভস্মপরাগ-বিকির্ণকারী কামনা-বহ্নি। 'আনা কারেনিনা'য় সমাজের নিষ্করুণতা, স্বামীর অনমনীয়তা, প্রেমাস্পদের উদাসীনতার ইন্ধনে উজ্জীবিত আনার দুর্বার কামনাবহ্নির তুলনায় 'গৃহদাহে'র দাহনে সুরেশের প্রতি অচলার আসক্তি একটি ফুলিঙ্গ মাত্র।

আনা ও অচলা, উভয়ের প্রেমের অন্তিম পরিণতি যদিও প্রায় একই রকম ধ্বংসাত্মক, তবুও প্রেমের প্রকৃতি রূপায়নে দুই শিল্পীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষণীয়। ভ্রণস্কির প্রতি আনার ভালবাসা উত্তপ্ত, উত্তাল, বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ফেনিল জলরাশির মত। সুরেশের প্রতি অচলার অনুরক্তি ফল্গুধারার মত শান্তস্রোতস্বিনী, প্রতিদিনের বহির্জীবনের মৃত্তিকার আবরণে অদৃশ্যপ্রায়। ভ্রণস্কির প্রতি আনার প্রেম অগ্নিশিখার মত—আত্মপ্রকাশে দীপ্তিমান, আত্মাহুতিতে অনির্বাণ, অগ্রগতিতে দ্বিধাহীন। রুদ্ধ গৃহে বন্দী অগ্নিশিখার মত গতিভ্রষ্ট, সে অগ্নি তার আঁধারকেই গ্রাস করল নির্মম দাহনে। সুরেশের প্রতি অচলার

আসক্তি অট্টালিকার রুদ্ধদ্বার নিভৃত কক্ষে লুকায়িত গোপন দীপশিখার মত সে প্রেম আত্মপ্রকাশে সঙ্কুচিত, অগ্রগতিতে দ্বিধাগ্রস্ত, আশঙ্কায় কম্পমান, ভাবনায় অন্তর্লীন। চারিদিকে তার সুরেশের উন্মুখ, লেলিহান কামবহ্নিশিখা, যার উদ্যতস্পর্শে সে প্রেম ক্ষুব্ধ, ভয়াতুর, অসহায়। সচেতনের সতর্ক দ্বার পেরিয়ে আকস্মিক ও ক্ষণিক তার প্রকাশ। তার মৃদু স্পর্শে সুরেশের কামবহ্নি রূপ নিল সর্বগ্রাসী দাবানলের। আনা কারেনিনা যেন নারীপ্রেমের মধ্যাহ্ন-মুক্ত, সতেজ, উজ্জ্বল, প্রখর রশ্মির আলোকে সব উন্মুক্ত, দৃষ্টিগোচর। টলষ্টয়ের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির কাছে বৃহৎ-এর পরিপ্রেক্ষিতে সামান্যতম খুঁটিনাটিও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রকটিত। তিনি পাঠকের নিজস্ব কল্পনার জন্য বিশেষ কিছুই বাকী রাখেন নি: "He is like a painter trying to cover a wall with a three-haired miniaturist's brush Nose to the canvas, he lays on his infinitesimal strokes with myopic doggedness, covers them over, sharpens them, scratches them out, puts them in again, and when he has finished, the myriad dots of colour converge, at a distance, into fresco"[২৩]

এর তুলনায় 'গৃহদাহে'র নারীপ্রেম প্রদোষের সলজ্জ আভার মত—সচেতনের ওপারে অবচেতনের গভীর জঠর থেকে দ্বিধাজড়িত রশ্মির মৃদু আভাস, সেই মৃদু আলোকে প্রাত্যহিক জীবনের সহস্র খুঁটিনাটি চোখে পড়ে না সত্য, কিন্তু জীবনধারার মৌলিক বৃত্তিগুলি বাহুল্যবর্জিত হয়ে স্পষ্টতর হয়ে প্রতিভাত হয়। শরৎচন্দ্র চিত্রপটের যতখানি জায়গায় বর্ণবিন্যাস করেন তার চেয়েও বেশী জায়গা খালি রেখে দেন, কিন্তু সেই শূন্য স্থান বর্ণবহুল অংশের ব্যঞ্জনা বহন করে' পাঠকের কল্পনা অনুসারী অব্যক্ত মুখরতায় পূর্ণতর হয়ে উঠে। টলষ্টয়ের three-haired miniaturist's brush শরৎচন্দ্রের শিল্প-সাধনার অনুকূল নয়। তার চিত্র অঙ্কিত হয় loaded brush দিয়ে, কিন্তু সে তুলি অতীব কোমল এবং হৃদয়ানুভূতির নানা রঙের সংমিশ্রণ-অভিনবত্বে সিক্তিত।

মৃত্যুর মধ্যে যে মুক্তি আছে আত্মহত্যায় আনা পেল সেই মুক্তি। কিন্তু মুক্তির মধ্যে যে মৃত্যু আছে অচলা পেল সেই মৃত্যু। জীবনে বেঁচে থাকলেও অচলার সেই জীবন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। যে মহিমের জন্যে সে সুরেশের উন্মুখ প্রেমাঞ্জলি বার বার প্রত্যাখ্যান করেছে, যে মহিমের জন্যে সে নিজের গহন মনের পলাতক অনুরক্তিকে বার বার পাষাণচাপা দিয়ে জীবনকে অস্বীকার করেছে, যখন সেই মহিমই সুরেশের মৃত্যুর পরে তাকে ফেলে চলে গেল, তখন এ বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই ছিল তার সহস্রগুণে ভাল। কিন্তু অচলাকে মৃত্যুদানের মত উদারতা শরৎচন্দ্র দেখান নি। অচলার জীবনের tragedy তার নিজের মৃত্যুর মত সহজ পথ ধরে আসে নি। এইখানে আনার সঙ্গে অচলার আরও একটা পার্থক্য।

অসামান্য সৌন্দর্যের অধিকারিণী, প্রাণপ্রাচুর্যে উজ্জ্বল, মাধুর্যের প্রতিমা, মধুর ব্যবহারে শিশু, যুবক সকলের চিত্তহারিণী যে আনা, শেষের দিকে সে আনা রূপান্তরিত হয়েছে coquetry, flirtation, make-up বিলাসী সাধারণ রমণীত্বে। পাঠক যেন এই পরিণতির জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। "Anna's disintegration begins not with Vronsky but with her loveless marraige to Karenin, we see it from its onset, we soon anticipate it, then fear it, later accept it, finally are moved by it"[২৪]

কিন্তু অচলার জীবন এমন সুসম্বন্ধিত ঘটনা পরিক্রমার উদাহরণ নয়। তার জীবন যেন কোন অদৃষ্ট লিখন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—পুনঃ পুনঃ আকস্মিকতার আঘাতে পীড়িত। কে জানত পরম ব্রাহ্মবিদ্বেষী সুরেশ সহসা কেদার-বাবুর গৃহে আবির্ভূত হবে, স্বামী-স্ত্রীর মনের বোঝাপড়ায় নিভৃত পল্লীর বুকে ধূমকেতুর মত ব্যবধান সৃষ্টি করবে, ট্রেনে ছলনা করে' অচলাকে ভুল পথে নিয়ে আসবে। যদি বা এলো, তবুও ঘটনাচক্রে অচলা যে সুরেশের জীবনের সঙ্গে এত জড়িত হয়ে পড়বে তা কেউ ভাবতে পারে নি। এই বাহিরের আকস্মিকতার সঙ্গে অচলার মানসিক আকস্মিকতারও একটা যোগাযোগ লক্ষণীয়। সুরেশের প্রতি অচলার যে অনুরক্তি সুরেশের

কামনাকে প্রজ্জ্বলিত হ'তে সাহায্য করেছে তার প্রকাশও অচলার মনে আকস্মিকতার রূপ ধরেই এসেছিল। বার বার আকস্মিকতার এই নির্মম আঘাত অচলার ভাগ্যকে এমন নিষ্ঠুর নিষ্ফলতায় নিক্ষেপ করেছে যা আনার ধীর ও নিশ্চিত আত্মনাশের তুলনায় গভীরতর বেদনাদায়ক। কেন না, আনার আত্মনাশের মূলে তার নিজের সক্রিয় ভূমিকা যতখানি ছিল তার চেয়ে বহুলাংশে কম ছিল অচলার ভাগ্যবিড়ম্বনায় তার নিজের ভূমিকা। ট্রেণের চলন্ত চাকার নিষ্পেষণে আনার কোমল সুন্দর দেহলতার বিধ্বস্ত বিকৃত পরিণতির দিকে দৃষ্টি দিলে যে চক্ষু ভয়ে বিস্ফারিত হয় ও আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্কুচিত হ'যে মুদ্রিত হয়ে পড়ে, সুরেশের প্রাণহীন দেহের পার্শ্বে আসীনা, গালে-হাত, ভাবনালীন, শূন্যদৃষ্টি অচলার পানে চেয়ে সেই চক্ষু অশ্রুতে ভরে আসে আর করুণায় অচলার সেই স্পন্দনহীন পাষাণমূর্ত্তির দিকে বারংবার ফিরে ফিরে তাকায়। এইখানে আনা ও অচলার মধ্যে সব চেয়ে বড় পার্থক্য ও দুজন শিল্পীর পৃথক আবেদন।

৫

"আনা কারেনিনা" ও "গৃহদাহে"র তিনটি মুখ্য চরিত্রের মধ্যে ভ্রণস্কি ও সুরেশের চরিত্রের সাদৃশ্য সব চেয়ে অধিক। এই দু'টি চরিত্রের পার্থক্য প্রেমাস্পদের কাছে, প্রেমের কাছে আত্মোৎসর্গের গভীরতার পার্থক্যমাত্র। এই আত্মোৎসর্গ ভ্রণস্কির ক্ষেত্রে মেঘের আবরণ ভেদ করে ধীরে ধীরে প্রকাশমান রবিরশ্মির মত, প্রথমে ক্ষীণ জ্যোতি, পরে ক্রমশঃ দীপ্তিমান এবং অবশেষে প্রায় মেঘমুক্ত, উজ্জ্বল। অপরপক্ষে, সুরেশের ক্ষেত্রে এই আত্মোৎসর্গ প্রথম থেকেই দ্বিধাহীন, শঙ্কাহীন, সহজ ও উন্মুখ—যেন সহসা চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎপ্রভার মত।

আনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগের ভ্রণস্কির জীবনধারা, সেই জীবনধারার উপর প্রথম দর্শনে আনার প্রতি সঞ্জাত প্রবল প্রেমের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া, ভ্রণস্কির আত্মীয় পরিবেশ, তার বন্ধু পরিবেশ, সামাজিক স্তর প্রভৃতি এবং সেই বিভিন্নমুখী প্রভাবের ভিতর দিয়ে আনার প্রতি তার প্রেমের বিকাশ··· টলস্টয় সবকিছুর "with clinical exactitude"

বিশদ্ বিবরণ নিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই পিটার্সবার্গ সমাজের "gilted youth" দের মধ্যে ভ্রণস্কি এক উজ্জ্বল তারকা, সে সুদক্ষ মিলিটারী অফিসার, প্রভূত পারিবারিক সম্পত্তির মালিক, রাশিয়ার উচ্চতম শাসকগোষ্ঠির সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনে মর্য্যাদা সম্পন্ন, সবার প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র। উচ্চতম মিলিটারী পদোন্নতির সম্ভাবনাপূর্ণ তার জীবন। যে উচ্চ সমাজে তার স্থান সেখানে প্রেমের নামে গুপ্ত ব্যভিচার প্রায় প্রচলিত রীতি। তার মা বিবাহিত জীবনে (এবং পিতার মৃত্যুর পরে) বহু প্রণয়-লিপ্সা বলে প্রখ্যাত ছিলেন।[২৫] তার দাদা একটি পরিবারের মাথা হয়েও নিজে একটি নাচনেওয়ালী রক্ষিতা রেখেছিলেন।[২৬] এ হেন সমাজনীতির ধাতেই ভ্রণস্কির মনের কাঠামোটি তৈরী হচ্ছিল। বিয়ে ক'রে পারিবারিক জীবন যাপন করা তার মত কৌমার্য্যের উপাসকদের কাছে অসম্ভব বলে গণ্য।[২৭] কিটির সঙ্গে প্রণয়লীলায় তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা তার মনে আদৌ ছিল না। ভ্রণস্কি পিটার্সবার্গ যুবকদলের সেই শ্রেণীভুক্ত ছিল যাদের আদর্শ হ'ল "........ to be elegent, generous, plucky gay, to abandon without a blush to every passion and to laugh at everything"[২৮] আনার সঙ্গে দেখা হওয়ার এবং তার প্রতি প্রবল প্রেমানুভূতির পরেও পিটার্সবার্গে ফিরে এসে ". ...as though slipping his feet into old slippers, he droped back into the light-hearted, pleasant world he had always lived in."[২৮] রেজিমেন্টের সহকর্মীদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র সে, সেই শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রাখতে সর্ব্বদা প্রয়াসী ছিল। ঘোড়দৌড় ছিল তার একটা প্রিয় ব্যসন। " . . in spite of his love affair he was looking forward to the races with intense though reserved excitement . .... . These two passions did not interfere with one another."[২৯] সর্বোপরি, তার শৈশব ও যৌবনের স্বপ্ন ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা—এই আকাঙ্ক্ষা তার এত প্রবল ছিল যে ".. ... now this passion was even doing battle with his love."[৩০]

আনাকে পাওয়ার পর নতুনত্বের স্বাদ যখন শিথিল হ'য়ে এল, তখন সে আবিষ্কার করল যে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি যতটুকু সে পেয়েছিল তা "gave him no more than a grain of sand of the mountain of happiness he had expected."৩১ পরিতৃপ্তির অভাবে সে অনুভব করতে লাগল "a desire for desires." একটার পর একটা সে আঁকড়ে ধরতে লাগল, প্রথমে রাজনীতি, পরে নতুন নতুন বই অধ্যয়ন তার পর চিত্রকলা। অবশেষে সে নিজেই নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল " ... . In any case, I can give up anything for her, but not my independence."৩২

অচলার প্রতি সুরেশের ভালবাসা এই রকম আত্মকেন্দ্রিক, তার দ্বারা সঙ্কুচিত, দ্বিধাজড়িত ছিল না। অচলার প্রেমে সুরেশের আত্মসমর্পণ ছিল স্বতোৎসারিত ও সামগ্রিক। সামগ্রিক ছিল বলেই কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবনা তার প্রেমের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, এবং সেই জন্যেই লেখক এই দিকটার উপর থেকে যবনিকা অপসারণের প্রয়োজনবোধ করেন নি। ভ্রণস্কি যেমন স্বীকার করেছিল যে সব কিছু সে আনার জন্যে ত্যাগ করতে পারে, একমাত্র তার স্বাধীনতা ছাড়া, তেমনি সুরেশও তার স্বভাবসিদ্ধ পরোপকারস্পৃহা প্রেমের নিগড়ে বন্দী করে নি। কিন্তু ভ্রণস্কির স্বীকারের মধ্যে যেমন একটা আত্মতুষ্টির স্পর্শ আছে তা সুরেশের পরোপকার বৃত্তিতে একেবারেই নেই। আনার একমাত্র পুত্রসন্তানের প্রতি নারীসুলভ মোহকে ভ্রণস্কি কখনও হৃদয় দিয়ে বুঝতে সক্ষম হয় নি। সব কিছু হারিয়ে, এমন কি ভ্রণস্কির ভালবাসার উপর পূর্ণ আস্থা পর্য্যন্ত হারিয়ে, আনা যখন নৈরাশ্যের শূন্যতা লাঘবের নানাবিধ প্রচেষ্টায় একটি অনাথা ইংরেজ-বালিকার লালন-পালন ও শিক্ষা দীক্ষার ভার গ্রহণ করে' সেই সেবার মধ্যে মগ্ন থাকতে চেয়েছিল তখন ভ্রণস্কি তার সেই প্রচেষ্টাকে সহানুভূতির অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে না দেখে অবজ্ঞার চোখেই দেখেছিল।৩৩ আনার যে সৌন্দর্য্য ভ্রণস্কির মনে পূর্বে রহস্যময় কামনার সৃষ্টি করত, ক্রমশঃ সেই সৌন্দর্য্য তার মনে একটা পীড়া-বোধ জাগাতে লাগল। শেষের দিকে ধীরে ধীরে তাদের দু'জনের মধ্যে

একটা evil 'spirit of strife' প্রাচীরের মত মাথা তুলে দাঁড়াল। "The irritability that kept them apart had no external cause,. ..... It was an inner irritation, grounded in her mind on the conviction that his love had diminished; in his, on regret that he had put himself for her sake in a difficult position, which she, instead of lightening, made still more difficult Neither of them gave full utterance to their sense of grievance, but they considered each other in the wrong, and tried on every pretext to prove this to one another."[৩৪]

সুরেশের প্রেম প্রেমপাত্রীর প্রতি এরূপ বিরূপতায় কখনও কলুষিত হয় নি। ভ্রণস্কির তবু একটা বড় সান্ত্বনা ছিল যে সে আনার ভালবাসা পেয়েছিল এবং একটু অধিক মাত্রায়ই পেয়েছিল। সুরেশের তাও ছিল না। দেহমন ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের প্রেমার্ঘ্য দিয়ে অচলাকে নিয়ে যে নীড় সে রচনা করতে চেয়েছিল সে নীড় তার শূন্যই র'য়ে গেল। ডিহরী ষ্টেশনে তার অসুস্থ হ'যে পড়া এবং অসহায় অসুস্থ সুরেশের প্রতি নারীসুলভ মমতাবোধের মত আকস্মিক পরিস্থিতির আনুকূল্যে অচলার দৈহিক সান্নিধ্য সে লাভ করেছিল সত্য, কিন্তু অচলার মন বরাবর তার কাছে অপ্রাপ্যই রয়ে গেল। পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যানের নির্ম্মম আঘাত তার প্রেমকে শীতলতায় বিরূপ করতে পারে নি। যখন সে সত্যই উপলব্ধি করল যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেও অচলার মন সে পেল না, তখন সে ভ্রণস্কির মত তার প্রেমে সর্বস্বত্যাগিনী আনার প্রতি আত্মপ্রীতির বশে সহানুভূতির অভাব ত দেখাই নি, পরন্তু এমন বৈরাগ্য দ্বারা তার বঞ্চনাকে মণ্ডিত করেছিল যে অচলার চিত্ত মোহিত ও অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল।

শেষের দিকে আনার সৌন্দর্য্য যেমন ভ্রণস্কির মনে পীড়াবোধ সৃষ্টি করেছিল, তেমনি অচলার সৌন্দর্য্যও সুরেশকে পীড়ন করেছিল। কিন্তু এই দুইজনের পীড়াবোধের স্বরূপ একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। ভ্রণস্কির পীড়াবোধ যেখানে আত্মকেন্দ্রিক আক্ষেপ-দুষ্ট, সুরেশের পীড়াবোধ সেখানে

আত্মসংহরণের বৈরাগ্যে মণ্ডিত। উদাহরণস্বরূপ দুটি চিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। পিটার্সবার্গে থিয়েটারে যাবার জন্যে বিশেষভাবে সজ্জিতা আনাকে দেখে ভ্রণস্কির মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে টলষ্টয় লিখেছেন, "He saw all the beauty of her face and full evening dress, always so becoming to her. But her beauty and elegance were just what irritated him."[৩৫] ডিহরীর বাড়ীতে সুরেশ যেদিন একখানা শীলমোহর করা খাম অচলার হাতে দিয়ে প্লেগ মহামারী আক্রান্ত গ্রামে রোগীর সেবা ও চিকিৎসার জন্য যাবার এবং প্রয়োজন হ'লে কয়েকদিন থাকার সিদ্ধান্ত তাকে জানা'ল, অচলা সেদিন তাদের শোবার ঘরে প্রশস্ত শুভ্র শয্যার উপর শুয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিল। সুরেশ নীরবে দাঁড়িয়ে পিছন দিক থেকে সে দৃশ্য দেখছিল। এইখানে সুরেশের মনের ভাব বর্ণনা করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র লিখেছেন "ওই যে প্রশস্ত শুভ্র সুন্দর শয্যার উপর সুন্দরী নারী উপুর হইয়া কাঁদিতেছে, উহার কোনটাই আজ তাহার মনকে সম্মুখে আকর্ষণ করিল না, বরঞ্চ পীড়ন করিয়া পিছনে ঠেলিতে লাগিল। · শিশির বিন্দু মুঠার মধ্যে যে কি করিয়া এক ফোঁটা জলের মত দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া উঠে, অচলার পানে চাহিয়া চাহিয়া সে কেবল এই সত্যটাই দেখিতে লাগিল। হায় রে, পল্লব প্রান্তটুকু যাহার ভগবানের দেওয়া স্থান, ঐশ্বর্য্যের এই মরুভূমিতে আনিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে কি করিয়া?"[৩৬] শয্যালুণ্ঠিতা অচলার দিকে চেয়ে স্থূল প্রাপ্তির অসারতা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করল।

সুরেশের মুখে তার মাঝুলী গ্রামে যাবার ও পাঁচ-সাতদিন থাকার কথা শুনে অচলা নিঃশব্দে তার মুখের দিকে চেয়ে র'ল। কিন্তু যে বিতৃষ্ণার বিষ সুরেশের মুখের দিকে চাইলেই তার চিত্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলত সে বিতৃষ্ণা আজ দেখা দিল না, পরিবর্ত্তে "আজ এই মুহূর্ত্তে তাহারই পানে চাহিয়া সমস্ত অন্তর তাহার বিষে নয়, অকস্মাৎ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।"[৩৭] সুরেশের শেষ বিদায় পর্য্যন্ত এই বিস্ময় করুণাসিক্ত হ'য়ে অচলার মনকে অধিকার করেই ছিল। অপরপক্ষে,

আনার চিত্তে ভ্রণস্কির যে মূর্ত্তি প্রতিফলিত ছিল তা সম্পূর্ণ অন্তরের। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যখন তমবিদীর্ণকারী আলোকে সহসা আনার কাছে জীবনের ও মানবসম্পর্কের গূঢ় অর্থ স্বচ্ছ হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল তখন সে নিজে নিজেকেই বলেছিল, "What was it he sought in me? Not love so much as the satisfaction of vanity" ভ্রণস্কির উদ্দেশ্যে তার চরম কথা "Vengeance is mine, I will repay." আনা ও অচলার চিত্তে ভ্রণস্কি ও সুরেশের প্রতিচ্ছবির ভিন্ন রূপ এই দুই চরিত্রের পার্থক্য বিশেষভাবে সূচিত করে। অচলা সুরেশের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহত্ত্বে অভিভূত, বিস্মিত, আনা ভ্রণস্কির আত্মগরিমার সঙ্কীর্ণতায় ক্ষুব্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণা।

ভ্রণস্কি ও সুরেশের চরিত্রের মধ্যে আরও একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অসুখে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে উঠে, কারেনিনের ক্ষমা লাভ করে আনা যখন কারেনিনের গৃহে স্বামীর সঙ্গে বাস করতে লাগল, তখন আনার প্রেমে হতাশ হয়ে ভ্রণস্কি আত্মহত্যার চেষ্টা করল। সাহসী যোদ্ধা বুকে গুলি চালিয়ে নিজের প্রাণ নিতে গিয়ে অসফল হ'ল। মরণে ব্যর্থ হয়ে সেই ব্যর্থতা লোকের কাছ থেকে গোপন রাখতে সচেষ্ট হ'ল। একথা ঠিক, ভ্রণস্কিকে আদর্শ পুরুষ বলে সৃষ্টি করা টলষ্টয়ের উদ্দেশ্য নয়, সুরেশকেও শরৎচন্দ্র আদর্শ করে সৃষ্টি করেন নি, সে মহাপাপিষ্ঠ, ভগবান মানে না পাপ-পুণ্য মানে না, একমাত্র বন্ধু ও তার নিরপরাধা স্ত্রীর সর্ব্বনাশ-সাধনকারী। অচলার প্রেমে হতাশ হয়ে ভ্রণস্কির মত সে মৃত্যু-কামনা করে নি, পরন্তু সে মৃত্যুকে উপেক্ষাই করত। উপেক্ষা করত বলেই অন্যের বিপদে সে যখন তখন মৃত্যুর কোলে ঝাঁপ দিতে কখনও দ্বিধা করে নি। ভ্রণস্কির মত মৃত্যুকে ডাক দিতে সে পরাঙ্মুখ হয় নি, বরঞ্চ মৃত্যুই তাকে ডাক দিয়ে পরাঙ্মুখ হয়েছে। বন্ধু মহিমের প্রাণ রক্ষা করতে সে নিজের জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিয়েছে জলে, প্লেগাক্রান্ত বন্ধু নিশীথের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে দ্বিধা করে নি, ফয়জাবাদে প্লেগ মহামারীতে অর্থ ঔষধপত্র এমন কি নিজের দেহ দিয়ে শুধু পরসেবা নয়, এক বৃদ্ধা রমনীকে রক্ষা করতে প্রজ্জলিত অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে নিজে দগ্ধ

হয়েছে নিদারণভাবে। বার বার সে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরেই এসেছে। তাই মাঝুলী গ্রামের প্লেগমহামারী থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসাটাই ছিল তার স্বাভাবিক। সেখানে তার মৃত্যুটাই ছিল অপ্রত্যাশিত—একা গাড়ীর চাকায় আঙ্গুল ঘষে যাওয়ার মত একটা ক্ষুদ্র আকস্মিক ঘটনার সূত্র ধরে। "সুরেশ লোভে নয়, ক্ষোভে নয়, ঘৃণায় নয়,—ইহকাল পরকাল কোনকিছুর আশাতে প্রাণ দেয় নাই, সে মরিয়াছে—শুধু কেবল মরণটা আসিয়াছিল বলিয়াই।"৩৯ পরোপকারে অনির্ব্বাণ, ত্যাগে মহান, প্রেমে নিষ্ফল সুরেশের চিতাভস্মে নির্বাণোন্মুখ প্রেমাগ্নির বৈরাগী আভা, আনার আত্মহত্যায় শোকবিহ্বল, তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা অবলুপ্তকারী বিয়োগব্যাথায় আচ্ছন্ন ভ্রণস্কির চিত্তের হাহাকারের শূন্যতার চেয়ে ট্রাজেডির দিক থেকে আবেদনের ব্যাপকতায় এবং বেদনার করুণতায় অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী।

৬

কিটি-লেভিনের শান্ত, সুস্থ ও সফল দাম্পত্যজীবনের পটভূমিকা দ্বারা টলষ্টয় যেমন কারেনিনের ভগ্ন-সংসার ও আনা-ভ্রণস্কির ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনীকে উজ্জ্বলতা দান করতে চেয়েছেন, তেমনি শরৎচন্দ্রও মৃণালের সহজ, একাগ্র পতিব্রাত্যের চিত্র দ্বারা অচলার পরকীয়া আসক্তি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতাকে তীব্রতর করতে প্রয়াস করেছেন। কিন্তু 'আনা কারেনিনা'য় আনা ভ্রণস্কির মূল কাহিনীর সঙ্গে কিটি-লেভিনের কাহিনীর সংযোগ সূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। সমান্তরাল এই দুই কাহিনী যেন পৃথক দুটি জগতের কথা। কেবল প্রথম দিকে এই দুই জগতের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া কিছুটা লক্ষণীয়, যেমন ভ্রণস্কির জীবনে আনার আবির্ভাবের ফলে কিটির প্রেমে নৈরাশ্য ও মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা। এই দুই জগতের মধ্যে এক জগতের লোককে অন্যজগতে বিচরণ করতে খুব কমই দেখা যায়। অব্‌লনস্কি ও ভেস্‌লোভস্কি দুই জগতেই পদচারণ করেছে সত্য, কিন্তু তারা এই দুই জগতের সম্পর্কের মধ্যে গভীর কোন প্রভাব সৃষ্টি করে নি। শেষের দিকে আনা লেভিনের সাক্ষাৎকার এবং আনার সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি ও

কৃষ্টির প্রতি লেভিনের সশ্রদ্ধ মুগ্ধতা একটি আকস্মিক ঘটনা যার উদ্দেশ্য আনার চরিত্র যে কত প্রভাবশালী শুধু তা প্রতিপন্ন করা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

কিন্তু 'গৃহদাহে' মৃণালের কাহিনী কিটি-লেভিনের কাহিনীর মত মূল কাহিনীর সমান্তরাল নয়, একেবারে মূল কাহিনীর অন্তর্বর্তী। মৃণাল মহিম-সুরেশ-অচলাদের সঙ্গে একই জগতের অধিবাসী। আশৈশব মহিমের সঙ্গে একই গৃহে পালিতা অনাত্মীয়া মৃণাল তার আত্মীয়হীন সেজদা মহিমের একমাত্র আত্মীয়ের মত, এক সময়ে তার মহিমের সঙ্গে বিয়ের কথাও হয়েছিল, অচলাকে পতিগৃহে প্রথম প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব ছিল এই মৃণালেরই, আবার এই মৃণালের প্রতি ঈর্ষাই অচলা মহিমের সম্পর্ক ভঙ্গের কারণের মধ্যে অন্যতম। বাড়ী পুড়ে যাবার পরে মৃণালের অক্লান্ত সেবার ফলেই জীবন ফিরে পেয়েছিল মহিম, জব্বলপুরের পথে সুরেশ ও অচলা রুগ্ন অবস্থায় তাকে পরিত্যাগ করে গেলে মৃণালের সেবাহস্তের কাছেই আশ্রয় নিয়েছিল সে, একমাত্র কন্যাসন্তানের দুষ্কৃতির ভয়ে আতঙ্কিত, নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত কেদারবাবুর কঠিন হৃদয় ক্ষমায় দ্রবীভূত হয়েছিল এই মৃণালের প্রেরণাতেই এবং সুরেশের মৃত্যুর পরে কেদারবাবুর হাত ধরে একাকিনী পরিত্যক্ত অসহায় অচলার দিকে অগ্রসর হয়েছিল এই মৃণালই। স্বর্গতঃ বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি ভক্তি ও প্রেমে মহীয়সী, পীড়িতা বার্দ্ধক্যে পঙ্গুপ্রায় শাশুড়ীর প্রতি সেবাপরায়না সদাহাস্যময়ী তরুণ-বিধবা এই মৃণালকে আমরা দেখতে পাই মহিমের জীবনের শুভ ও অশুভ সকল ঘটনার ক্ষেত্রে। গৃহদাহ মূল আখ্যানের সঙ্গে মৃণাল চরিত্র এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হওয়ার ফলে শিল্প-কৌশল হিসাবে 'গৃহদাহ' এমন এক গঠনমূলক ঐক্যবদ্ধতা লাভ করেছে যার তুলনায় 'আনা কারেনিনা'র গঠন বহুলাংশে শিথিল। আনা ভ্রণস্কির বিড়ম্বিত প্রণয়-জীবনের tragedy কে তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে টলস্টয় দুটি পৃথক পৃথক ফ্রেমে-বাধাঁনো বিপরীত বর্ণের ছবি যেন পাশাপাশি প্রদর্শন করেছেন, সেখানে অনুরূপ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে শরৎচন্দ্র যেন একই চিত্রে এর মূল অঙ্গরূপে দুটি বিপরীত বর্ণের সমাবেশ করে' কাহিনীকে দৃঢ়তর ঐক্য দান করতে সমর্থ হয়েছেন।

হয়েছে নিদারুণভাবে। বার বার সে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরেই এসেছে। তাই মাঝুলী গ্রামের প্লেগমহামারী থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসাটাই ছিল তার স্বাভাবিক। সেখানে তাব মৃত্যুটাই ছিল অপ্রত্যাশিত—এক্কা গাড়ীর চাকায় আঙ্গুল ঘষে যাওয়ার মত একটা ক্ষুদ্র আকস্মিক ঘটনার সূত্র ধরে। "সুরেশ লোভে নয়, ক্ষোভে নয়, ঘৃণায় নয়,—ইহকাল পবকাল কোনকিছুব আশাতে প্রাণ দেয় নাই, সে মবিয়াছে—শুধু কেবল মরণটা আসিয়াছিল বলিযাই।"৩৯ পরোপকারে অনির্ব্বাণ, ত্যাগে মহান, প্রেমে নিষ্ফল সুবেশের চিতাভস্মে নির্বাণোন্মুখ প্রেমাগ্নির বৈবাগী আভা, আনাব আত্মহত্যায় শোকাবিহ্বল, তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা অবলুপ্তকাবী বিয়োগব্যাথায আচ্ছন্ন ভ্রণস্কিব চিত্তেব হাহাকাবের শূন্যতার চেয়ে ট্রাজেডির দিক থেকে আবেদনের ব্যাপকতায় এবং বেদনার করুণতায অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী।

৬

কিটি-লেভিনের শান্ত, সুস্থ ও সফল দাম্পত্যজীবনের পটভূমিকা দ্বারা টলষ্টয যেমন কাবেনিনের ভগ্ন-সংসার ও আনা-ভ্রণস্কিব ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনীকে উজ্জ্বলতা দান করতে চেয়েছেন, তেমনি শরৎচন্দ্রও মৃণালেব সহজ, একাগ্র পতিব্রাত্যের চিত্র দ্বাবা অচলার পরকীয়া আসক্তি ও অন্তর্দ্বন্দ্বেব গভীবতাকে তীব্রতব করতে প্রয়াস করেছেন। কিন্তু 'আনা কারেনিনা'য় আনা ভ্রণস্কির মূল কাহিনীর সঙ্গে কিটি-লেভিনের কাহিনীব সংযোগ সূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। সমান্তবাল এই দুই কাহিনী যেন পৃথক দুটি জগতের কথা। কেবল প্রথম দিকে এই দুই জগতের পারস্পবিক প্রতিক্রিয়া কিছুটা লক্ষণীয়, যেমন ভ্রণস্কির জীবনে আনার আবির্ভাবের ফলে কিটির প্রেমে নৈবাশ্য ও মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা। এই দুই জগতের মধ্যে এক জগতের লোককে অন্যজগতে বিচরণ করতে খুব কমই দেখা যায়। অব্‌লনস্কি ও ভেস্‌লোভস্কি দুই জগতেই পদচারণ করেছে সত্য, কিন্তু তারা এই দুই জগতের সম্পর্কের মধ্যে গভীর কোন প্রভাব সৃষ্টি করে নি। শেষের দিকে আনা লেভিনের সাক্ষাৎকার এবং আনার সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি ও

কুষ্টির প্রতি লেভিনের সশ্রদ্ধ মুগ্ধতা একটি আকস্মিক ঘটনা যার উদ্দেশ্য আনার চরিত্র যে কত প্রভাবশালী শুধু তা প্রতিপন্ন করা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

কিন্তু 'গৃহদাহে' মৃণালের কাহিনী কিটি-লেভিনের কাহিনীর মত মূল কাহিনীর সমান্তরাল নয়, একেবারে মূল কাহিনীর অন্তর্বর্ত্তী। মৃণাল মহিম-সুরেশ-অচলাদের সঙ্গে একই জগতের অধিবাসী। আশৈশব মহিমের সঙ্গে একই গৃহে পালিতা অনাত্মীয়া মৃণাল তার আত্মীয়হীন সেজদা মহিমের একমাত্র আত্মীয়ের মত, এক সময়ে তার মহিমের সঙ্গে বিয়ের কথাও হয়েছিল, অচলাকে পতিগৃহে প্রথম প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব ছিল এই মৃণালেরই, আবার এই মৃণালের প্রতি ঈর্ষাই অচলা মহিমের সম্পর্ক ভঙ্গের কারণের মধ্যে অন্যতম। বাড়ী পুড়ে যাবার পরে মৃণালের অক্লান্ত সেবার ফলেই জীবন ফিরে পেয়েছিল মহিম, জব্বলপুরের পথে সুরেশ ও অচলা রুগ্ন অবস্থায় তাকে পরিত্যাগ করে গেলে মৃণালের সেবাহস্তের কাছেই আশ্রয় নিয়েছিল সে, একমাত্র কন্যাসন্তানের দুষ্কৃতির ভয়ে আতঙ্কিত, নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত কেদারবাবুর কঠিন হৃদয় ক্ষমায় দ্রবীভূত হয়েছিল এই মৃণালের প্রেরণাতেই এবং সুরেশের মৃত্যুর পরে কেদারবাবুর হাত ধরে একাকিনী পরিত্যক্ত অসহায় অচলার দিকে অগ্রসর হয়েছিল এই মৃণালই। স্বর্গতঃ বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি ভক্তি ও প্রেমে মহীয়সী, পীড়িতা বার্দ্ধক্যে পঙ্গুপ্রায় শাশুড়ীর প্রতি সেবাপরায়ণা সদাহাস্যময়ী তরুণ-বিধবা এই মৃণালকে আমরা দেখতে পাই মহিমের জীবনের শুভ ও অশুভ সকল ঘটনার ক্ষেত্রে। গৃহদাহ মূল আখ্যানের সঙ্গে মৃণাল চরিত্র এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হওয়ার ফলে শিল্প-কৌশল হিসাবে 'গৃহদাহ' এমন এক গঠনমূলক ঐক্যবদ্ধতা লাভ করেছে যার তুলনায় 'আনা কারেনিনা'র গঠন বহুলাংশে শিথিল। আনা ভ্রণস্কির বিড়ম্বিত প্রণয়-জীবনের tragedy কে তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে টলষ্টয় দুটি পৃথক পৃথক ফ্রেমে-বাধাঁনো বিপরীত বর্ণের ছবি যেন পাশাপাশি প্রদর্শন করেছেন, সেখানে অনুরূপ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে শরৎচন্দ্র যেন একই চিত্রে এর মূল অঙ্গরূপে দুটি বিপরীত বর্ণের সমাবেশ করে' কাহিনীকে দৃঢ়তর ঐক্য দান করতে সমর্থ হয়েছেন।

শিল্পরীতির দিক থেকে টলষ্টয় ও শরৎচন্দ্র ভিন্ন পথের পথিক। এবং সেজন্য উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি ও বিকাশ কার্য্যে তাদের অনুসৃত পদ্ধতিও ভিন্ন। টলষ্টয়ের শিল্পরীতি সম্বন্ধে হেন্‌রি ট্রয়েট বলেছেন, "On the slightest pretext the novelist hands over the pen to the essayist, and the action halts to let the author express his views on rural husbandry, the meaning of life, the education of children or the relations between psychology and physiology ... Tolstoy might be said to have used the novel as an outlet for his own intellectual pre-occupations"[৪০] এই প্রশস্ত পবিসব স্পৃহাব সঙ্গে মিলিত ছিল খুঁটি-নাটির প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। "Nothing seems to escape Tolstoy's vision, he focusses on the common incidents of life; how one sits, how one eats, how one reads, how one prepares for bed, how one sleeps The stuff of life is presented in superfluity; its density is cumulative and achieves a sense of reality"[৪১] তাই 'আনা কারেনিনা' গঠনে বিস্তৃত, তাতে অগণিত চরিত্রের মিছিল, মঞ্চের উপর চিত্রের পর চিত্রের দ্রুত অনুবর্তন। শরৎচন্দ্রেব শিল্পবীতি মূলতঃ নির্বাচনমূলক, যেন একটা বিশেষ গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার জন্য সব চেয়ে সোজা রাস্তা ধবে যাওয়ার মত এবং সেই গন্তব্যে পৌঁছতে চবিত্রগুলি ন্যূন পক্ষে যতটুকু দৃশ্যমান করা প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই তাদেব মঞ্চস্থ কবেন, তার বেশী কবে তাব কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেন না। এই পদ্ধতিব একটা উদাহরণ সহজেই চোখে পড়ে। রুগ্ন মহিমকে পথে একা ফেলে রেখে সুরেশ অচলাকে নিয়ে ভিন্ন পথে চলে গেলে পর মহিম যখন বন্ধুর ও নিজের স্ত্রীর বিশ্বাস-ঘাতকতা আবিষ্কার করল, তখন কি রকম নিরুপায় অবস্থায় সে পড়েছিল, তার মানসিক অবস্থা কিরূপ ধারণ করেছিল, এবং সে কি করল এবং তার ভবিষ্যৎ জীবন কোন ধারায় প্রবাহিত করল, শরৎচন্দ্র সে সম্বন্ধে

পাঠককে কিছুই জানানো প্রয়োজন মনে করেন নি। টলষ্টয়ের হাতে পড়লে আমরা এ সব কিছুর কেবল বর্ণবহুল বিশদ বর্ণনাই পেতাম না, আরও বেশ কয়েকটি নতুন চরিত্রের সঙ্গে তিনি পাঠককে পরিচিত করাতেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র অতি সংক্ষিপ্তভাবে পাঠককে শুধু জানিয়েছেন যে মহিম মৃণালদের বাড়ীতেই ছিল এবং কেদারবাবুর সেখানে আসার খবর পাওয়ামাত্র সেস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে। ডিহরী রামবাবুর বাড়ীতে সুরেশ ও অচলাকে একত্র দেখে বা পরে মৃত্যুশয্যাপার্শে তার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধেও লেখক নীরবই রইলেন। শেষে সুরেশের মৃত্যুর পর অচলাকে ডিহরী সুরেশের বাড়ীতে পৌঁছে দেবার পর মহিমের মনের অবস্থা সম্বন্ধে লেখক অতি সংক্ষেপে জানালেন : "অচলাকে তিল তিল করিয়া ভালবাসিবার প্রথম ইতিহাস তাহার কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু এই মেয়েটিকেই কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবনের উপর দিয়া যাহা বহিয়া গিয়াছে, তাহা যেমন প্রলয়ের মত অসীম তেমনি উপমাহীন। . আজ একবার তাহার জমাখরচের খাতাখানা না মিলাইয়া দেখিলে আর চলিবে না। কোথাও একটু নির্জ্জন স্থান তাহার চাই-ই চাই।"[৩২] এই সংক্ষিপ্ত সংযত উল্লেখ মহিমের মনের রুদ্ধকক্ষে অচলাকে ঘিরে গভীর আবর্ত্তের যে ইঙ্গিত বহন করে সুনিপুণ ভাষার বিশদ বর্ণনার চেয়ে তা অনেক বেশী শক্তিশালী।

তেমনি, টলষ্টয় যেমন ভ্রণস্কির ক্লাবজীবন, অশ্বপালন বিলাস, চিত্রকলা চর্চ্চা, গ্রাম্যরাজনীতি চর্চ্চা, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ বৃত্তির বিশদ বর্ণনায় নতুন নতুন পরিবেশ ও চরিত্রের সমাবেশ করেছেন, সুরেশের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তা করেন নি। কেবল সুরেশের পরোপকার বৃত্তি যে কত প্রবল ও আত্মত্যাগপ্রবণ, তা কয়েকটি ঘটনার পরোক্ষ উল্লেখের মাধ্যমে মাত্র সার্থকরূপে প্রকটিত করেছেন। টলষ্টয় যেখানে লেখনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, শরৎচন্দ্র সেখানে পাঠকের কল্পনার উপর নির্ভর ক'রে পিছনে সরে দাঁড়িয়েছেন। তার ফলে শুধু যে লেখকের শ্রম ও পাঠকের সময় উভয়েরই ব্যয় সঙ্কোচ হয়েছে তা নয়, এই না লেখার সংযম পাঠকের কল্পনাকে বিকাশের জন্য ক্রীড়াভূমি দান করেছে এবং

লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা সৃজনশীল সম্পর্কের সূচনা করেছে—যা শ্রেষ্ঠ আর্টের লক্ষ্য। টলষ্টয়ের সম্বন্ধে বলা হয় যে "....he manages to make the large single dramatic occasions stand for the mass of minor events . . that he chooses to represent only those major occasions that have dramatic significance ; as if he could pay always in large bills and let the small charge go."[৪৩] তেমনি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলা যায় যে large bill গুলির মধ্যে যেগুলো বেশ বড় বড় কেবল সেগুলি নিয়েই তার কারবার, large bill গুলির মধ্যে যেগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট এমন কি সেগুলোও তিনি ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। শরৎচন্দ্র একবার অবিনাশ ঘোষালকে বলেছিলেন, "দেখ, লেখার চেয়ে না-লেখা শক্ত, এটা কখনও ভুলো না। যেখানে suggestion দিলে চলে সেখানে বেশী লেখা অহেতুক।"[৪৪] শরৎচন্দ্র নিজে যে এই সংযম বিশেষ যত্নের সঙ্গে পালন করতেন, উপরোক্ত উদাহরণগুলি ছাড়াও 'গৃহদাহে' এর আরও অনেক নিদর্শন আছে।

এই না-লেখার সংযম থেকে শরৎচন্দ্রের শিল্পরীতি এমন একটি গুণের অধিকারী হয়েছে যা মহান আর্টের লক্ষণ। সেটি হচ্ছে তার রচনার অলিখিত অংশের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা। ডিকেন্সের মত টলষ্টয় তার মুখ্য চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করবার জন্য তাদের বিশেষ একটা দৈহিক লক্ষণ বা mannerism-র দিকে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেমন ভ্রণস্কির 'powerful teeth", 'strong packed teeth", কারেনিনের "big ears", "cracking knuckles", "shrill voice", আনার "soft caressing look", "brisk swift gait", "inherent energy", অবলনস্কির 'attractive eyes", ইত্যাদি। টর্চের আলোর মত, টলষ্টয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার সৃষ্ট চরিত্রের প্রধান ও সাধারণ দিকের সঙ্গে সঙ্গে এমন কি সামান্যতম খুঁটিনাটি পর্যন্ত চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠে পাঠকের মনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই জন্যে টলষ্টয়কে "dramatic novelist", "scenic writer", "impressionist" প্রভৃতি সংজ্ঞাভুক্ত

করা হয়। এর ফলে তার চরিত্রগুলি যেমন বাস্তব, তেমনি জীবন্ত এবং সেই মাত্রায় individualised অর্থাৎ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের গুণে তারা সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিশেষ হয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু "They lack the gradations of shading inherent in more subtle art"[৪৫] কিন্তু টলস্টয়ের মত স্বাতন্ত্র্যমূলক পূর্ণতা শরৎচন্দ্র তার চরিত্রগুলিকে দেন নি এবং দেন নি বলেই তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঊর্দ্ধে একটা ব্যঞ্জনা বহন করে। তারা ব্যক্তিবিশেষ হয়েও নৈর্ব্যক্তিকতার ভাবে আবৃত, সীমিত হয়েও সীমানার বাইরে প্রক্ষিপ্ত, স্পষ্ট হয়েও অস্পষ্টতার আবেদনে আবিষ্ট, দৃশ্য হয়েও অদৃশ্যের দ্যোতক। তারা যেন মানবহৃদয়সমুদ্রের কখনও উত্তাল তরঙ্গ, কখনও তরঙ্গবেষ্টিত স্থির অচঞ্চল সামুদ্রিক শৈলশিখর কখনও শান্তবীচিমালাশোভিত বারিমেদুর—চিরন্তন মানব প্রবাহের এক একটি খণ্ড খণ্ড রূপ। ডি এইচ্. লরেন্সের চরিত্রাঙ্কন পদ্ধতি প্রসঙ্গে ওয়ারেন রিক্ যে কথা বলেছেন শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' প্রসঙ্গেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন, "His characters are simply jets of great dark stream of energy, carriers of energy and cosmic will He is not so much concerned with the forms taken on by the energy as with the energy which takes on the form .. Human beings appear as the modalities of elemental urge."[৪৬] যে সূক্ষ্ম কলাকৌশলের গুণে শরৎচন্দ্র তার মুখ্য চরিত্রগুলিকে এ রকম একটা নিহিত ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করতে পেরেছেন, টলস্টয়ের কলাকৌশল তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কোন বিশিষ্ট সমালোচক টলস্টয়ের শিল্পরীতি সম্বন্ধে বলেছেন Tolstoy's art is essentially of the flesh and that Tolstoy is a supreme artist but only within the limits of the natural man."[৪৭]

৮

উপরোক্ত আলোচনা পরিশেষে যে মর্মার্থের ইঙ্গিত করে তা সংক্ষেপে এই যে আখ্যায়িকা, ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রপরিকল্পনার দিক থেকে

'গৃহদাহ' ও 'আনা কারেনিনা'র মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও চরিত্রসৃষ্টি ও সামগ্রিক আবেদনের দিক থেকে এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে অসাদৃশ্য এত প্রখর, যে 'গৃহদাহে'র উপর 'আনা কারেনিনা'র প্রভাবের প্রশ্ন একান্ত অবান্তর বলে প্রতীত হয়। এই দুই শিল্পীর চরিত্রঅঙ্কন পদ্ধতি ও শিল্পরীতির পার্থক্য মনে না রেখে তাদের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে কার সৃষ্টি অধিক সর্বাঙ্গীন ও সফল এ বিচার অর্থপূর্ণ হয় না। তারা উভয়েই মহান ঔপন্যাসিক। বর্ণনার ঐশ্বর্যে, ঘটনার প্রাচুর্যে, চরিত্রসৃষ্টির অজস্রতায় ও নিখুঁত বাস্তবতায় টলষ্টয়ের 'আনা কারেনিনা' বিশ্বে অতুলনীয়। তেমনি হৃদয়ানুভূতির সূক্ষ্ম আবেদনে, মনঃবিশ্লেষণের গভীরতায় ও অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনায় শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসরাজির সঙ্গে সমান প্রতিষ্ঠার অধিকারী। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা পূর্ণমাত্রায় এতদিনেও কেন এল না তার কারণ বোধ হয় বিশেষভাবে প্রণিধানের বিষয় ২৬

১ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যা : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর পৃ ২৪২ ২ তারা সার্তরা : শরৎচন্দ্র : সমতাবেদের জীবন ও সাহিত্য ৩ Henry Troyat : Tolstoy পৃ ৩৫। ৪ Tolstoy : Anna Karenina (Mod. Lib. Edn.) পৃ ৩০৯। ৫ ঐ ৩৮০ ৬ him—Vronsky ৭ Tolstoy Anna Karenina (Mod Lib. Edn) ২২৫। ৮ শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ৭ম ভাণ্ডার গৃহদাহ ১১৪ ৯ Tolstoy : Anna Karenina (Mod Lib Edn) ৩১১ ১০ ঐ ৩৮৪। ১১ ঐ ২০০। ১২ শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ৭ম সম্ভার, গৃহদাহ ১০৯। ১৩ ঐ ১১২। ১৪ ঐ ১১৩। ১৫ Tolstoy Anna Karenina (Mod. Lib. Edn.) ৩৮৪। ১৬ শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ৭ম সম্ভার, গৃহদাহ ১০৮। ১৭ ঐ ১১৯। ১৮ ঐ ২১৭। ১৯ Tolstoy Anna Karenina (Mod. Lib. Edn.) ১৫৮। ২০ ঐ Introduction. ২১ শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ৭ম সম্ভার, গৃহদাহ ৪৭। ২২ Henry Troyat : Tolstoy ৩৬৬/৩৬৭

২৩ ঐ ৩১৪। ২৪ Tolstoy . Anna Karenina (Mod. Lib. Edn) Introduction XX ২৫ থেকে ৩৫ ঐ ৩৬ শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ৭ম সম্ভার, গৃহদাহ ২৬১/২৬২ ৩৭ ঐ ২৫৯ ৩৮ Tolstoy Anna Karenina ৩৯ শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ৪০ Henry Troyat : Tolstoy ৩৬৫ ৪১ Tolstoy : Anna Karenina ৪২ শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ৪৩ J. W Beach : The Twentieth Century Novel ১৬৯ ৪৪ অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল : শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা ৫৯ ৪৫ Tolstoy : Anna Karenina ৪৬ J.W. Beach , The Twentieth Century Novel ৩৭১ ৪৭ Tolstoy Anna Karenina ৪৮ বাংলাদেশের কিছু কিছু তথাকথিত ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্‌ সাহিত্যিকগণ দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর মার্কিণী বা য়ুরোপীয় সাহিত্যের পচা বাস্তবতাকে রিয়ালিজম্‌ এর চরম অভিব্যক্তিজ্ঞানে পূজা করে থাকেন, অথচ তাঁদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র 'মরালিষ্ট' বলে ধিক্কৃত, রবীন্দ্রনাথ একসময় 'এস্কেপিষ্ট' বলে নিন্দিত এবং অবশেষে শরৎচন্দ্র 'সেন্টিমেণ্টাল' বলে অবহেলিত হয়েছেন। শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর 'An Acre of Green Grass' বইটি উৎসাহী পাঠককে পড়তে অনুরোধ করি। বুদ্ধদেব বসু-প্রভাবিত কিছু লেখকগোষ্ঠীর শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এমত উন্নাসিকতার কথা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সাহিত্য সমালোচনার ছাত্র অবশ্যই জানেন যে সকল লেখকেরই কিছু কিছু দুর্বল রচনা থাকে, শরৎচন্দ্রেরও ছিল, এমন কি মহামতি শেকস্‌পীয়ারেরও ছিল। কিন্তু কোন কালজয়ী লেখকের বিচার করতে বসে তাঁদের দুর্বল রচনাগুলির প্রতি আক্রমণ চালানো অজ্ঞানতারই নামান্তর মাত্র। শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে 'গৃহদাহ' বা 'শ্রীকান্ত' (প্রথমদুটি পর্ব) আলোচিত বলে তাঁর রচনার প্রতি সুবিচার করা হয়। শেকস্‌পীয়ারের ট্রাজেডি আলোচনায় ব্রাডলে সাহেব 'রোমিও জুলিয়েট' প্রসঙ্গ আনেন নি, এনেছেন শ্রেষ্ঠ চারটি বিয়োগান্ত নাটকগুলির একথা মনে রাখা প্রয়োজন।

[সম্পাদক . উত্তরস্মৃরি]

অরুণ ভট্টাচার্য

বিষাদ ছিল আমার সঙ্গী

আজ সারাদিন বিষাদ ছিল আমার সঙ্গী
ঘর ছিল বাহির, বাহির হ'ল ঘর
যেন কার ডাক শুনবো নিরন্তর, এমন আশা।

তখন সন্ধ্যা দ্বিতীয় যামে,
মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং
ঢাকের বোল আকাশে ছড়াচ্ছে তরঙ্গমালা।
ভীড়ের মধ্যে সংগোপনে তুমি
বললে, শেষ কথা
যাবার আগে শুনে যেও।

কখন যাবার ডাক এলো,
বাহির হ'ল ঘর। শেষ কথা
শোনা হ'ল না। এই অস্পষ্ট আঁধারে
নির্জন তারাবলী ও আমার মাঝে
তোমার অশ্রুত শব্দের ধ্বনি
ক্রমাগত তাড়া করে ফিরছে আমাকে।

আছি নির্বাসনে

[তরুণতম কবিদের প্রতি]

আমি গা মেলাই নি, কারো সাথে
পা। আমি মিলতে জানি না, তাই
নির্বাসনে আছি।

একলক্ষ লোক আমার পরিচয়পত্রে, নাম-ঠিকানা
লিখে রেখেছি। আমি তাদের
মুখ চিনি না, মিলতে জানি না
তাদের সঙ্গে মেলাই নি গা,
এক সঙ্গে
পা ফেলতে পারি না। তাই
আছি নির্বাসনে।

তোমরা সব কবিরা বেশ আছো,
টাটকা তাজা পদ্য লেখো, আমি
তাও লিখতে জানি না, যখন তখন কেউ
মারা গেলে
স্মরণীয় কবিতা লেখো। আমি তাও
পারি না। আছি
নির্বাসনে।

এই ঘরে, টেবিলের সামনে
কিছু সাদা কাগজ, ঝরনা কলম—
যখন তিনি লেখান, কেবল
তখনই লিখি—নইলে
থাকি নির্বাসনে।

পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

তিনটি হাইকুপদী

১. একটি সাবেকী হাইকু[১]

যেই না ব্যাং ঝুপুস
লাফায় খালে,—ছলচ্ছল
জল ছলকালে ফোঁস ॥

২. আয় নেংটি

আয় নেংটি, খোঁট ক্ষুদ
ভাঁড়ারে। নেই বেড়াল, নেই
যাঁতি। আয় না বে ॥

৩. কাজের সকাল

কাইয্যা করে কা,
মাইয্যা ডাকে, মা মণি।
গিন্নি কর্তাকে ॥

[১] প্রথম হাইকুপদীটি একটি পুরনো জনপ্রিয় হাইকুর তর্জমা

প্রদীপ মুন্সী
তিনটি কবিতা

১. তুমি কি আমার সব কথা জানো
তুমি চলে গেলে
একটি শব্দের ভারে
নিঃশব্দের পাড়
ভেঙে বুকে রক্তের প্লাবন আনে
তুমি চলে গেলে
কে জানতো বুকের ভিতর এমন

২. চামচে দিয়ে নাড়তে নাড়তে
সাদা ফেনা
নীচে বিনুনি কালো মদ
রক্ত পাকে পাকে জড়ায়
চামচে দিয়ে নাড়তে নাড়তে
ঝিকমিক নীলে
আমার মুখ
বৃত্তের মত ঘোরে
চামচে দিয়ে নাড়তে নাড়তে
রং খেলে হরিণের মত
আমার শরীর
গভীরে মাছ হয়ে ভাসে
শব্দ শুনি ঝন্ ঝন্ ঝন্
ধোঁয়াটে রং
সময় নেকড়ের মত ঘাড়ে লাফ দেয়

৩. কোথায় যেতে হবে কোন্‌খানে
চোখে নৈসর্গিক ছবি হাতে জবা
বুকে প্রপাতধারা
মস্তিষ্কে সুপ্রাচীন বিখ্যাত বৃক্ষের
প্রতীক ঝুপ্‌সি অন্ধকার
কোথায় অন্য কোন্‌খানে কেন যাব
কবিতা
ত্যাখো এবার চোখে প্রথম
গুহার রঙ
হাতে প্রথম দিনের হাতিয়ার
নগ্নদেহ
কবিতা আমার কবিতা।

মধুমাধবী ভট্টাচার্য

শেষ বেলায় কবিতা

তুমি থামতে জানো না যেহেতু ঝড় বন্ধ হয়েছে
মাতাল ভুবনের গন্ধে অনুভব কর না
যদিও কোন রাতের আলিঙ্গন।

দুপুরের অক্লান্ত বর্ষায় সেই মন
অন্ধ হতে পারত, শেষ বেলায়।

আলোছায়া

পোড়া বাড়িটার কাছে ঝিল্লির ডাক
আজ তত তীব্র নয়,
তোমাকে ভাবা যায়
সদ্যস্নাতা নারীর মতো।

গুন্ গুন্ করে বৃষ্টি নামলো
বোঝা যায় কি যায় না,
এমন আলোছায়া অস্পষ্ট এনে দেয় আমার কাছে।
এমন আরও দু'একটা দিন ভেবেছি তোমাকে।

ফেরে নি যে

কতদিন হয়ে গেছে
ফেরে নি বালক, আজও সন্ধ্যায়
শেষ আশ্বিনের অলস ডাঙা ভেঙে
পৃথিবীর তন্দ্রা তোমারই মতো।
কাটিয়েছো প্রতিটি শিউলি সকাল তোমার ঘরে
কাটিয়েছো বিকেলের অবগুণ্ঠণ ওই কদম্বের বনে
এখন বুঝি বা প্রতিবেশী কারাগারে, হায়।
দূরপাল্লার ট্রেন যায় হু হু শব্দে বিদেশীর ঘরে।

কবিতার ভাবনা (২)

অরুণ ভট্টাচার্য

সুরের কথা ছেড়ে আবার কবিতাব আবহাওয়ায় ফিবি।

যতদূর মনে পড়ছে, স্কুলে ভর্তি হবাব আগে দুজন কবি আমাব মনের বাজ্যে আধিপত্য কবেছিলেন। সুকুমার রায় ও সত্যেন দত্ত। পববর্তীকালে সাহিত্যজীবনে এঁদেব সম্বন্ধে কখনোই কোন আলোচনা কবি নি। স্কুলে পবীক্ষার খাতায় এঁদেব কথা লিখতে হয়েছে প্রশ্নের উত্তবে, কিন্তু আজ পঞ্চাশ পেবিয়ে ভাবছি, কেন, কিসের জন্য, কোন্ আধুনিকতার মোহে পড়ে এঁদের কথা ভাবি নি পৃথক করে। কেন উচ্চারণ করি নি কবিশেখরের নাম, জসীমউদ্দীনেব কথা। করুণানিধানকে বিস্মৃত হয়েছি—আমরা কি কেউ এখনো 'ছাত্রাধারা'ব মত একটি কবিতাও লিখতে পেবেছি (আমাব কবি-বন্ধু অরুণকুমাব সরকারই এবিষয়ে কথাচ্ছলে একদিন প্রশ্ন তোলেন)।

সুকুমাব বায় (বায়চৌধুবী)-এর 'রামগরুড়েব ছানা' আমাদেব সবচেয়ে আনন্দ দিত। 'আনন্দ' না বলে 'মজা' কথাটা বলাই ভালো। এই মজা ক্রিকেট বা ফুটবল খেলা দেখেও সে বযেসে পাওয়া যেত না সময় সময়।

রামগরুড়ের ছানা
হাসতে তাদের মানা
হাসির কথা বললে বলে
হাসব না না না।

এবং এই কবিতাব চেযেও আরও জীবন্ত ছিল রামগরুড়ের ছবিটি। অমন একটি হাস্য-বিবর্জিত মুখ দেখলে আপনা থেকেই আমবা হেসে গড়াগড়ি যেতুম আমাদের ভাড়াটে বাড়ির বারান্দায়। সে সময় আমাদের বাসা ছিল কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীটে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর পশ্চিমদিকে। মনে

আছে, সে বাড়িতে থাকতে তিনটি বিখ্যাত ঘটনা, অন্তত আমার জীবনে, ঘটেছিল। বিহারের ভূমিকম্প, দেশবন্ধু পার্কে গান্ধীজির জনসভা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা। ঐ তিনটি ঘটনাই পরস্পর সম্পর্ক-শূন্য। কিন্তু আমার জীবনে এখনো ছবির মত ভাসছে। পরে এ প্রসঙ্গে আসছি। সুকুমার রায়ের কবিতা ছাড়া অন্য যে কবির কথা সেসময় মনকে অধিকার করেছিল তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চলিত কথায় সত্যেন দত্ত।

সত্যেন দত্তকে রবীন্দ্রনাথ 'তরুণ বন্ধু' বলে কবিতায় সম্বোধন করেছিলেন। অনেকেরই জানা আছে, বিশ্বকবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পূর্বেও যে কজন অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে সত্যি ভালোবাসতেন শ্রদ্ধা করতেন এবং প্রতিভাশালী বলে মনে করতেন—এবং রবীন্দ্রসান্নিধ্যে কাটাতে পছন্দ করতেন তাঁদের মধ্যে কবি সত্যেন দত্ত ও "রবিরশ্মি"র লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে 'সত্যের পূজারি' বলেও অভিহিত করে গেছেন, এটা কথার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের অশেষ স্নেহ পেয়েছিলেন তিনি এবং রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা, বিশেষ করে, তাঁর ছন্দ-জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। ছান্দসিকরা এই 'ছন্দের জাদুকর'কে নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, ভবিষ্যতেও বলবেন কিন্তু সেই শিশুকালে আমরা তাঁর কবিতার চমৎকারিত্বেই অভিভূত হয়েছিলুম।

সত্যেন দত্তের কবিতায় কী আমাদের আকর্ষণ করতো? শব্দের ধ্বনি-সম্ভার, ছন্দের বৈচিত্র্য এবং দোলা, না অন্য কিছু? সেই বয়সে এসব ভেবে দেখবার কথা নয়। আমরাও বোধহয় ভাবি নি। কিন্তু একটা জিনিষ সত্য — তা হচ্ছে ছবি। শৈশব এমন একটা সময় যখন তাঁর বহু কিছু ছবিতেই ধরে রাখতে চায়। বারবার তার মনোলোকে ছবিগুলি ঘোরাফেরা করে — তা জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষ। ওই যে আগে বলেছি, সুকুমার রায়ের কবিত এবং ছবি — একই সঙ্গে মনের দরজা-জানালায় ঘোরাফেরা করতো, তেমনি সত্যেন দত্তের কবিতা শুধু শব্দ-সম্ভার এবং ধ্বনিমাধুর্যের জন্যই ছবি হয়ে উঠতো। ধরা যাক্ বিখ্যাত কবিতাটি 'পালকি চলে'। পুরো কবিতাটি ছবির পর ছবি। ছবি

কবিতার মাধুর্যের বা মহত্ত্বের কোন নির্ণায়ক গুণ নয়, সংস্কৃত আলংকারিকরা ছবি-কে কাব্যের মহৎ গুণ বলে স্বীকার করেন নি। কিন্তু সেই বালকবয়সে ছবিই একমাত্র বস্তু যা মনকে গভীরভাবে আর্কষণ করে। গগনতলে/আগুন জ্বলে/অথবা, শুষ্ক গাঁয়ে/আদুল গায়ে এই সমস্ত বিশেষণ এবং বিশেষ্য পাশাপাশি মুহূর্তে আমাদের মনকে কোন্ সুদূরে নিয়ে যেত।

এই স্মৃতিচারণ করতে বসে মনে পড়ছে বিশুদাকে। সাহিত্যের দরবারে যে বিশুদার অবাধ প্রবেশ—সকলের শ্রদ্ধেয় এবং আমাদের স্মরণীয় মাষ্টারমশাই, মাষ্টারমশাইদেরও মাষ্টারমশাই আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় থেকে উনিশ বছরের তরুণ কবি পর্য্যন্ত বিশুদার বন্ধু। সেই বিশুদা (শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়) সম্পাদনা করেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থাবলী, যার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেছেন বাক্ সাহিত্যের শ্রদ্ধেয় শ্রী শচীন মুখোপাধ্যায়। এতো দামী বইটি আমাকে উপহার দিয়ে শুধু ঋণী করে রেখেছেন তাই নয়, তাঁর স্নেহের ভাণ্ডার যে অফুরন্ত, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে তা ঝরে পড়ে তার অন্যতম প্রমাণ। আর আমার পরম উপকার হয়েছে এই যে এই সম্পাদিত গ্রন্থটি কেন্দ্র করে আবার পুরনো শৈশবে ফিরে যেতে পারছি বার বার।

বিশুদা সাহিত্যের দরবারে পবিত্রদারই মতোই (পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়) তবে পবিত্রদার চেয়ে সবসময় ফিটফাট থাকেন। এই বয়সেও চুল পাকে নি প্রায় (আমাদের ঈর্ষার কারণ)। ধোপ-দুরস্ত পাঞ্জাবী। কমলা রং এর গায়ের চাদর এর পাট আমি কোনদিন ভাঙতে দেখি নি, প্রচণ্ড শীতেও। পাশাপাশি আর একজনকে না মনে করে পারা যায় না। শ্রীসুপ্রিয় সরকার। আপাতদৃষ্টিতে এঁদের চরিত্রের মিল পাওয়া যাবে। কিন্তু মজা এই, বিশুদা যখন আস্তে আস্তে কথা বলে চলেন, সুপ্রিয়বাবু নির্বাক শ্রোতা। তাকে খুব প্রয়োজন না পড়লে কেউ কথা বলতে দেখে নি—আমি তো অন্তত শুনি নি—প্রায় বিশ বছরের পরিচয়ে সুপ্রিয় বাবুর সঙ্গে আমার বিশটির বেশী কথা হয়েছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু যখনই যে প্রয়োজনে গিয়েছি সাহায্য করেছেন। যদিও কবিরা সবাই জানেন আমি কথা বলতে কী প্রচণ্ড ভালোবাসি। মনে পড়ছে মৃত্যুর কিছু

আগে ধূর্জটিবাবু—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-কে এলগিন রোডের বাসায় যখন দেখতে যাই, উনি বলেন 'জানো অরুণ, গলায় ক্যানসার, ডাক্তারবাবু কথা বলতে নিষেধ করেছেন', আমি বলেছিলুম 'তবে কথা বলছেন কেন, আমি শুধু আপনাকে দেখতেই এসেছি', উনি গভীর কণ্ঠে বললেন 'কথাই যদি না বলতে পাবে ধূর্জটি মুখুজ্যের বেঁচে থেকে লাভ কি'—আমার চোখ সেই মুহূর্তে জলে ভিজে এসেছিল—অতি কষ্টে সংবরণ করেছি। ধূর্জটি বাবুর কথা বলাটা একটা আর্ট—আর আমাদের কথা বলা মানে বকবক করা। সুপ্রিয় বাবুর বৈঠকেই বিশুদার সঙ্গে পরিচয়, না ঠিক হল না, সুপ্রিয় বাবুর পিতা শ্রদ্ধেয় ৺সুধীরচন্দ্র সরকারের বৈঠকেই বিশুদার সঙ্গে পরিচয়। সেই বৈঠকে বসবার সাহস আমাদের হত না—আমরা ছোট ছিলাম আর সেখানে আসতেন নামজাদা সব সাহিত্যিকেরা, প্রমথ বিশীরা—আমাদের শুধু মাষ্টারমশাই নন, বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পাল সমালোচক, কবি, নাট্যকার, স্যাটিরিষ্ট (সম্ভবত আধুনিক যুগের একমাত্র)—দুর্বাশা মুনির মতই যাকে ভয় করে চলতেন সবাই।

যাই হোক, বিশুদার জন্যেই সত্যেন দত্তের কবিতার কথা বারবার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সত্যেন দত্তের কবিতার কী জীবন্ত চিত্র, জোয়ান জোয়ান ছয় বেহারা দুলকি চালে গ্রাম ছাড়িয়ে নামল মাঠে। তামার টাটে। সেই বয়সে একী ভোলা যায়—গোরুর বাথান চোখে পড়ে, মন অজান্তেই বলে ওঠে 'ওই গো। গায়ের ওই সীমানা।'

বাংলা কবিতার সুবিস্তৃত অধ্যায়ে এই ছড়ার ইতিহাস অতুলনীয়। এবং প্রবাদেরও। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য-কে এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। সারাজীবন লোক-সাহিত্যের ছড়া প্রবাদ ইত্যাদির সংগ্রহ করে চলেছেন। বাংলা ছড়া এবং প্রবাদগুলি শুধু কাব্য এবং 'বৌদি'র উদাহরণ মাত্র নয়, এগুলি বাঙালীর জাতীয় সম্পদ। কবে কে লিখেছিলেন, না কি মুখে মুখে তার নাতনীকে বলেছিলেন

ফিং ফিঙেটি বাবুইহাটি

অথবা আমরা দুটি ভাই। শিবের গাজন গাই
ঠাকুমা গেছেন গয়াকাশী। ডুগডুগি বাজাই

(ঠাক্‌মার ছন্দ লক্ষণীয়, কী অনায়াসে ঠাকুরমা কে দুমাত্রায় ধরে রাখা হয়েছে)

অথবা বর আসছে বাম্‌ন পাড়া
বড় বৌ গো রান্না চড়া

অথবা মা'র ওপর সেই সুন্দর ছড়াটি

কিসের মাসি, কিসের পিসি,
কিসের বৃন্দাবন—
এতদিনে জান্‌লাম
মা বড় ধন।

এই সব ছড়া বাংলা কবিতার চিরন্তন সুরটি ধরে রেখেছে। সত্যেন দত্ত সেই সব কবিদের একজন — সুকুমার রায়ের মতোই — যিনি মাত্র কয়েকটি ছড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের শৈশবকে জয় করে নিয়েছিলেন। ওপরে উদ্ধৃত ছড়াগুলির পাশেই কি মনে করা যায় না

কোথায় যাবো কম্‌লা-ফুলি ?
'সিলেট আমার ঘর'
টিয়ে বলে, 'দেখতে যাব
পাখায় দিয়ে ভর'

(কম্‌লা'র মাত্রা লক্ষ্য করুন)

আজকালকার কবিরা সবাই খুব সিরিয়াস্‌, বিশেষ ছড়া কেউ লেখেন না, সম্ভবত আমার কবি-বন্ধু শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া সার্থক ছড়া আর কে লেখেন মনে পড়ছে না। আর এক কবি-বন্ধু শ্রীনরেশ গুহর 'কুমির জন্ম' কবিতাটি অতি সুন্দর, তবে পুরোপুরি ছড়া বলা যায় কি না জনি না। প্রসঙ্গত নরেশের কথা মনে পড়ে। অধ্যাপনা এবং শিক্ষাজগতের ভীড়ে এসে কবিতা লেখা তিনি বন্ধ করে দিলেন! এর জন্য নরেশ দায়ী না শিক্ষাজগৎ দায়ী, জানি না। কবিতাই তার প্রকৃত জগৎ ছিল। যাই হোক্‌, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ 'উলুখর' বেশীর ভাগ ছড়াই লিখেছেন রাজনৈতিক কারণে। সেজন্য অনেক সময়েই কবিতা উতরোয় নি—কিন্তু যেটি উতরেছে তা প্রথম শ্রেণীর—একেবারে প্রথম সারির

কবিদের সঙ্গে তার আসন নির্দিষ্ট হয়ে আছে বলেই আমার বিশ্বাস। উনি একটু কম লিখলে ভালো করতেন (অবশ্য আমার মত কম নয়— বছরে গুটি দশেক কি না সন্দেহ) কিন্তু বীরেনবাবু কবিতা না লিখেই বা কী করবেন। ওঁর অন্য কোন কাজ নেই। অফিস গেলেও চলে, না গেলেও চলে। বাজার হাট করতে হয় না। শুধু তরুণ কবিদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া এবং বাপুকে অনবরত চা করতে বলা এবং ছেলেদের দোকানে পাঠিয়ে সিগারেট বিড়ি ইত্যাদি আনতে দেওয়া ছাড়া। আর বীরেনবাবুর কাজ বস্তা বস্তা কবিতা, বিভিন্ন বয়েসী কবিদের, বিভিন্ন কাগজে বিতরণ করা, অর্থাৎ ছাপতে দেওয়া। এই দলে আমরাও আছি। কখন যে কোন্ কবির কবিতা বাংলাদেশের কোন্ শহরের কোন্ কাগজে বেরুবে, কেউ জানে না। হঠাৎ ডাকে একটি অপরিচিত পত্রিকা পেয়ে নিজের নাম দেখে কবি আনন্দিত হবেন—এ এক মজার খেলা বীরেন বাবুর কাছে। জীবনে তিনি ঝগড়া করেছেন বহুবার, আমার সঙ্গেও, কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজনে বুকে টেনে ধরেছেন সব কিছু ভুলে। বর্তমান কালের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কবির চরিত্র তার কবিতার মতই সবল। সরু গলির কথা তাঁর জানা নেই, হয় বি টি রোড নয়তো চৌরঙ্গী দিয়ে চলাটাই তার সহজাত।

আবার সত্যেন দত্তে ফেরা যাক বিশুদাকে কেন্দ্র করে।

কবি সত্যেন দত্ত ছন্দের জাদুকর সত্যেন দত্ত রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য সত্যেন দত্ত অনুবাদক সত্যেন দত্ত বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত চিন্তাশীল মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের নাতি। নদীয়া জেলার পূর্বস্থলী গ্রামের কাছে চুপী নামক একটি গ্রামে এসে দুর্গাদাস দত্ত বসবাস শুরু করেন। তাঁর ছেলে শিবরাম তার ছেলে রাজবল্লভ তার ছেলে রামশরণ তার ছেলে পীতাম্বর তাঁর ছেলে অক্ষয়কুমার তার ছেলে রজনীনাথ (ছোট ছেলে) তার ছেলে কবি সত্যেন দত্ত। এই পরিচয় করিয়েছেন আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অলোক রায়। অলোক স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের ভাইপো। শুনেছি, অলোক

বিয়ে করে নি পড়াশুনো করবে বলে। কথাটা সত্য কি না যাচাই করি নি। সত্যি হলে বিরলদৃষ্টান্ত এযুগে। অলোক জানাচ্ছেন, সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' প্রকাশিত হয়েছে ১৯০০ খৃঃ, কবির মাত্র ১৮ বছর বয়সে। সত্যেন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে শুরু করেন ১২ বছর বয়সে, কি না রবীন্দ্রনাথের চেয়েও অল্প বয়সে—না কি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সবচেয়ে অল্পবয়েসী কবি বাংলা দেশে। আমাকে নীরেন বলেছিলেন, তাঁর হাফ-প্যাণ্ট পড়া অবস্থায় 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। দেখা যাচ্ছে একটা tie হয়ে গেল। যাই হোক, ভবিষ্যৎ কালের গবেষকরা একাজ করবেন—এঁদের মধ্যে কে সবচেয়ে তরুণতম কবি ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বি.এ. পাশ করতে পারেন নি, কিন্তু এম. এ -র ছাত্র-ছাত্রীরা এবং গবেষকরা তাঁর বই পড়ছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রের প্রাথমিক গবেষণা, যতদূর জানি, সত্যেন্দ্রনাথের 'পর, [সেই বইটি তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন]। কবিরা তো এজন্যই ঈর্ষনীয়। তাঁরা নিজেরা লেখাপড়া নাই জানুন, পরীক্ষায় পাশ নাই করুন, আমাদের যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সিঁড়ি ডিঙোতে হয়, ডক্টরেট টক্টরেট নিতে হয় তবে তাদের কাছেই যেতে হবে।

অধ্যাপক কণক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবিরশ্মি'র লেখক এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্র চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র, গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় জানাচ্ছেন সত্যেন দত্তের কবিতায় 'অন্তরঙ্গ' বাংলাদেশের কথা। সুন্দর স্তবক উদ্ধার করেছেন তিনি

জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা রং আলোক জলে,
লুব্ধ করে মুগ্ধ করে
বৌ কথা কও কেবল ডাকে।

'কাঁচপোকা রং' পড়লে জীবনানন্দর কথা মনে পড়ে। আশ্চর্য, জীবনানন্দের কবিতায় কোথাও রবীন্দ্রনাথের ছায়ামাত্র নেই—অথচ সত্যেন্দ্র দত্তর কবিতার কিছু কিছু স্মৃতির অবশেষ যেন জীবনানন্দে আলতোভাবে ধরা

পড়ে। 'হিলসে-গুড়ি' কবিতাটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃতিযোগ্য। তবুও 'আলতা-পাটি শিম' এরকম ব্যবহার হয়তো জীবনানন্দই একমাত্র করতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথ নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অন্তত, সবসময়েই, একটা high seriousness লক্ষ্য করা যায়—যার জন্য এধরণের 'অন্তরঙ্গ' ছবি বড় পাওয়া যায় না, একমাত্র শিশু ভোলানাথ ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে অবশ্য এর সহস্রগুণ পুষিয়ে দিয়েছেন—সারা বাংলাদেশের অজস্র ছোটখাটো চিত্র—পদ্মার এপার ওপার যেন গল্পে গল্পে ছড়িয়ে আছে।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদকীয়তে জানিয়েছেন, 'মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের অকালবিয়োগের পর তাঁর স্বল্পসংখ্যক ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক বন্ধুগণ তাঁর গ্রন্থগুলির প্রকাশ বিষয়ে প্রথমাংশে কিয়ৎপরিমাণ সাহায্য করলেও পরবর্তীকালে স্বল্পবয়সী সহধর্মিনী ব্যতীত এমন কোন সাহিত্যানুরাগী নিকট আত্মীয় ছিলেন না, যিনি অগ্রণী হয়ে এই প্রকাশন কার্য অব্যাহত রাখা বা কোন নূতন পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্বন্ধে প্রযত্ন প্রকাশ করেন।' অবশ্য ৺সুধীরচন্দ্র সরকার সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি কর্তব্যকর্ম করেছেন কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির একটি সংকলন 'কাব্য সঞ্চয়ন' (১৩৩০) এবং পরে ছোটদের জন্য সত্যেন্দ্রনাথের কিছু কবিতা (.৩ ২) প্রকাশ করে'।

বর্তমানে সমগ্র রচনাবলী সম্পাদনা ও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন বিশুদা ও শচীনবাবু। একাজে কবিমাত্রই আনন্দিত হবেন—বাংলাদেশের জনসাধারণ, যারা কাব্যচর্চায় আগ্রহী এবং কবিতাপাঠে, তারাও উপকৃত হবেন। আপাতত প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলেও, সমগ্র রচনাবলী চারটি খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা জানিয়েছেন সম্পাদক। আমরা আশ্বস্ত হয়েছি। একাজ জাতীয় কর্তব্য, কিন্তু আমাদের মত সখের সাহিত্যিকদের এ নিষ্ঠা নেই। বিশুদারা উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের ছিঁটেফোটা আশীর্বাদ পেয়েছেন। সেই জোরেই সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা তাদের জন্মগত। মাঘ মাসের হাড়কাঁপানো শীতে, বর্ষায় ঠনঠনের হাঁটু-ডোবা জলে, বৈশাখের তাতানো রোদে বিশুদা হেঁটে হেঁটে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট পাড়ি দেবেনই—বাস ট্রামে যেতে যেতে কতদিন দেখেছি কমলা রঙের পাট-করা বিশুদার

চাদর। অবশেষে এম. সি সরকারের দোকানের পূব দিকের দেওয়াল-ঘেঁষা চেয়ারে নিশ্চিন্ত পৌঁছে যাবেন। আমাদের যুগে আমরা সবাই পার্ট-টাইম সাহিত্যিক। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় 'পার্ট-টাইম' সমালোচকের মত আমরাও সবাই সখের সাহিত্যিক। সব কাজ করে যদি সময় বাঁচে একটা দুটো কবিতা লেখা বা একটা দুটো ইংরেজী বা ফরাসী (বলাই বাহুল্য, ইংরেজী অনুবাদে) বই নিয়ে ইন্‌টেলেকচুয়াল কথাবার্তা, চায়ের টেবিলে—এই আমাদের মানায়। মানায় না সারাদিনমান পরিশ্রম করে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ন্যাশনাল লাইব্রেরী দিনের পর দিন ঘেঁটে একটি কবির জীবনবৃত্তান্ত লোকের সামনে তুলে ধরা। আসলে, শ্রদ্ধা জিনিষটা না থাকলে যে একাজ করা সম্ভব হয় না। আর প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তো 'বুর্জোয়া বিলাস' (?) বোধহয়। সেকাজে আমাদের লজ্জা বৈকি।

বীরেন চাটুজ্যে মাইকেল-কে নিবেদিত একটি সংকলন করেছিলেন—সম্পাদক হিসেবে আমার নামটা তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু সত্যি কবুল করছি, আমি একটি কবিতা লেখা ছাড়া (তাও অত্যন্ত কাঁচা কবিতা) একদিনও কোন পরিশ্রম করি নি। এটাই অন্তত আমার স্বভাবে। শ্রদ্ধা নেই, ধৈর্য নেই তাই আমাদের রচনাগুলি ধোঁপে টেকে না, অগ্রজদের রচনা সম্বন্ধে সেকারণেই আমরা এত উদাসীন।

যাক্‌গে, শ্রীকণক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য আমার কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঠেকেছে। তিনি বলছেন, 'সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে রূপোপভোগের এক প্রখর পিপাসা ছিল'। একথাটা আরো খাঁটি বলে মনে হয়েছে জীবনানন্দের ক্ষেত্রে। "রূপসী বাংলা"র কবিতাগুলি কিম্বা প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থে যেন একটি live spirit আগাগোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে হয়—তার বর্ণ গন্ধ সুষমা স্পষ্ট টের পাওয়া যায়—প্রকৃতিই হোক, মানুষই হোক, গাছপালা পশুপাখী যাই হোক তার ভেতরকার objective রূপটিকে ধরে তোলার এক অসাধারণ দক্ষতা ছিল জীবনানন্দের। প্রসঙ্গত বলা যাক, একটা বানান বারবার ভুল হয়েছে। W. B. Yeats কে Yates বলা হয়েছে কেন বুঝতে পারলাম না। মুদ্রণ প্রসঙ্গে অবশ্যই হয়, তবে এধরণের মূল্যবান গ্রন্থে এমন একজন কবির বানান কানে লাগে, চোখেও

ল্যাগে—অবশ্য Yates বলেও একজন তরুণ কবি আছেন ইংলণ্ডে, কিন্তু তাঁর কথা নিশ্চয়ই কণকবাবু বলেন নি—সংকলন গ্রন্থ ছাড়া এই তরুণ কবির নাম পাওয়া যায় না কোথাও। কণকবাবু তাঁর ভূমিকায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, সবচেয়ে মূল্যবান পংক্তিগুলি তুলে ধরেছেন—বলা যায়, সত্যেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অতি সুন্দর পংক্তিগুলিকে তুলে ধরে বলতে চেয়েছেন তরুণ কবিদের 'ছ্যাপো হে, এতো যে হৈ চৈ করছ দশকওয়ারী কবিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ, ষাট থেকে সত্তর আধুনিক থেকে আধুনিকতর, আধুনিকতম—তোমরা কি কেউ এমনসব পংক্তি কটা লিখেছো' ?

দশক নিয়ে একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করি। বছর দশেক আগে, একদিন সন্ধ্যেবেলা আমার বন্ধু ত্রিদিব ঘোষ,—যিনি মাঝে মধ্যে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হন, অনেক পড়েন, কম লেখেন—এবং আমি, কবি বিষ্ণু দে-র প্রিন্স্ গোলাম মহম্মদ রোডের বাসায় গিয়েছি। বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে গল্প জমতে একটু সময় লাগে, কিন্তু জমলে গভীরভাবে জমে যায়, সময়ের হদিস্ থাকে না। সেদিন আমরা ভূতের গল্পে জমে গিয়েছিলুম এবং বিষ্ণুবাবু আমাদের অসাধারণ কয়েকটি ভূতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভয় খাইয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী সময়মত গরম কফি না দিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। সে সময় এক তরুণ কবি, বোধহয় দুজন, হাতে নতুন কাব্যগ্রন্থ নিয়ে এলো। বিষ্ণুবাবুকে বইটি উপহার দিয়ে বললো, 'আমরা ষাটের কবি'। বিষ্ণু দে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি দিয়ে, সপ্রতিভ ভাবে, সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন, 'কিন্তু সত্তর যে ছুঁই ছুঁই করছে, ওই এলো বলে' আমি ও ত্রিদিব প্রচণ্ড হাসতে থাকলুম। ছেলে দুটি (এতদিনে তাঁরা কবি পরিচিতি লাভ করেছেন নিশ্চিত—ঘটনাটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি তাঁদের কাছে) বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল কিছুক্ষণ—বিষ্ণুবাবুই আবার বিষয়টি সহজ করে নিলেন।

আমার বক্তব্য ছিল আসলে, ত্রিশ চল্লিশ ষাট সত্তর করে কবিতার বিচার সত্যি কি হয়—দশক ধরে ধরেই কি কাব্যের ধারা বদলাচ্ছে (আমিও সে দোষে দোষী 'চল্লিশ দশকের কবিতা' সংকলন করেছিলাম—

করবার পর থেকেই এ বিষয়টির অসারতা সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করেছি)
যাই হোক, আমরা যে এত আধুনিক, তবুও বহু বহু শব্দ বহু বহু ব্যঞ্জনা—
কবিতার পংক্তিগুলির সিন্‌ট্যাক্স ইত্যাদির জন্য কি সত্যেন দত্তদের কাছে হাত
পাততে হয় না—যেতে হয় না কি মোহিতলালের কাছে দৃঢ়তা ও সংযমের
জন্য, কালিদাস রায় বা জসীম উদ্দীনের সহজ সরলতাটুকু আমাদের
কবিতায় দেখতে পেলে কি ভালো লাগে না?

ডালপালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক্‌-ঘড়ি

কিম্বা

হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থমকে গেল

কিম্বা

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়
ঝাউ গাছ দুলছে
ঢোল-কলমীর ফুল তন্দ্রায় ঢুলছে

'ঘড়িক্‌-ঘড়ি' এমন একটি জোরাল শব্দ সৃষ্টি করতে কতখানি কবি-ক্ষমতার
দরকার হয় তা সহজেই অনুমেয়—'নাচতেছিল' ক্রিয়াপদটির অপূর্ব
ব্যবহার অথবা ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায় ঝাউগাছ দোলার চিত্রটি মনকে মুহূর্তে
কেড়ে নেয় না কি? সহজেই কি এসব আয়ত্তে আসে?

বাঙালীর হৃদয়ে সত্যেন্দ্রনাথের আসন যে কত গভীরে প্রবেশ লাভ
করেছিল তা একটি মাত্র ছোট ঘটনাতেই হৃদয়ঙ্গম হবে। শ্রীমান অলোক
রায় তাঁর জীবন কথার শেষে ৺সুধীর চন্দ্র সরকার-এর একটি রচনার
কিয়দংশ উদ্ধার করেছেন। ১৯২২ সালে ৩১ই জুলাই রামমোহন লাইব্রেরী
হলে সত্যেন দত্তের তিরোধানে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ
যে-কবিতাটি আবৃত্তি করেন সেই প্রসঙ্গে লেখক জানাচ্ছেন, "আমরা
রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনে এমন অভিভূত হয়েছিলাম যে সেদিন সত্যেন
দত্তের সেই স্মরণসভায় কোন রেসোলিউশন নেওয়া বা কমিটি গঠন হলো

না। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী কবিগুরুর কবিতা শুনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি চলে গেল। এরকম শোকপূর্ণ সভা আমি আর দেখি নি'।

সম্পাদিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় বেণু ও বীণা কাব্য, হোমশিখা, তীর্থ-সলিল (অনুবাদ), জন্মদুঃখী নামক একটি ছোট উপন্যাস, রঙ্গমল্লী নামে একটি 'নাট্য', কিছু প্রবন্ধ ৎ বিবিধ বচনাবলী সংযোজন করেছেন। 'বেণু ও বীণা' রবীন্দ্রনাথকে এবং 'তীর্থ-সলিল' জ্যোতিরিন্দ্র-নাথকে উৎসর্গীকৃত করেছেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজী ১৯০৬ সালেই সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উৎসর্গপত্রে লিখছেন :

যিনি জগতেব সাহিত্যকে অলংকৃত কবিয়াছেন,
যিনি স্বদেশের সাহিত্যকে অমর কবিয়াছেন
যিনি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক,
সেই অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন
কবির উদ্দেশ্যে
এই সাম ন্য কবিতাগুলি সসম্ভ্রমে অর্পিত হইল।

নোবেল পুবস্কার পাবাব সাত বৎসর পূর্বেই এমনকি, কবিব পঞ্চাশৎ বর্ষ পুর্তি উপলক্ষে যে দেশব্যাপী উৎসব হয়েছিল তারও চার বছর আগে সত্যেন দত্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। এতে তাঁর কাব্যবোধ ও সমালোচকের দূরদৃষ্টি সহজেই অনুমান করে নেওযা যায়। তিনি এমন সময নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এসব কথা বলেছেন যখন একদিকে সুরেশ সমাজপতি, অন্যদিকে ডি এল রায় রবীন্দ্র-বিরোধিতায় সোচ্চাব। কিন্তু জহুরী যখন ঠিক মনিমুক্তা চেনে, বসিক তেমনি প্রকৃত সৎকবিকে চিনতে ভুল করেন নি।

'বেণু ও বীণা'র কবিতাগুলি কিশোর বয়সেব রচনা, সুতরাং উচ্ছ্বাস থাকাই স্বাভাবিক। এই সব পংক্তিতে তা ধরা পড়ে . কোথা যেতে চাও, কোথা চলে যাও, হায় গো কাহার কাছে? (অনিন্দিতা), কিন্তু 'বেণু ও বীণা'র অন্যতম সার্থক কবিতা (গান বলেই জানি) 'কোন দেশেতে তরুলতা'। দেশপ্রেমের এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশেব এমন স্নিগ্ধ কবিতা আর তো বেশী আমাদের জানা নেই। কবিতাটি বাঙালী মাত্রেই পড়েছেন

এভেবে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে নিবস্ত হলুম। এই কবিতাটি তিনি গান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেননা, কবিতার ওপরে 'বাউলের সুর' নির্দেশ করা আছে। 'সন্ধ্যাতারা' বলে আর একটি কবিতায় 'কীর্তনের সুর' নির্দেশ করেছেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় আত্মকথাতে জানাচ্ছেন যে সত্যেন দত্ত শুধু যে গাইতে পারতেন তাই নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও অনেক সময় নিজের রচিত কবিতা নিজের দেওয়া সুরে গাইতেন। একথা অনেকেরই জানা নেই হয়ত। কবি হেমচন্দ্রের তিরোধানের পর রচিত কবিতাটি একই সঙ্গে বেদনার এবং অগ্রজ কবির প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধার উজ্জ্বল উদাহরণ।

হে কবীন্দ্র! হেমচন্দ্র! চলে তুমি গেলে
সে কি গাহিবারে গান দেব-সভাতলে?
গাহিতে গাহিতে হায়—চাহিছ কি ফের
অতি নিম্নে—পরাজিত ভারতের পানে?

হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির কথা কারুর তো অজানা নেই—পরাধীন ভারত-বাসীর জন্য মর্মবেদনা কবি হেমচন্দ্র স্বর্গে গিয়েও মনে রেখেছেন—এই চিত্রটি সত্যেন্দ্রনাথের ভাব-অনুষঙ্গের আদর্শ-দলিল। বাংলা দেশ নিয়ে সত্যেন্দ্র-নাথ বহু কবিতা লিখেছেন—প্রতি কবিতাতেই দেশের, ভাষার, সংস্কৃতির, এই পরাধীনতার গ্লানির চিহ্ন আঁকা। এ ব্যথা তিনি নীরবে সহ্য করতে পারেন নি। ভাষায় প্রকাশ করেছেন বারে বারে। 'ধর্মঘট' নিয়ে আজ থেকে ষাট বছর আগে আর কে লিখেছেন জানি না—গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান বাদলরাম দু'দিন ধরে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে. এ ঘটনা আজকে নতুন না হলেও ষাট বছর আগে এই বিষয়ে কবিতা লেখা দুঃসাহসেরই বটে।

'হোমশিখা'র কবিতাগুলি বক্তব্যপ্রধান, কাব্যরস নানা স্থানে বিঘ্নিত হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য তাঁর অনুবাদ-কাব্য। বন্ধুবর অধ্যাপক সুধাকর চট্টোপাধ্যায় বেশ কিছুদিন পূর্বে আমাকে তাঁর 'অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ' বইটি উপহার দেন। সেই গ্রন্থ থেকেই জানতে পারি সত্যেন দত্তের অসাধারণ দক্ষতার কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন যেন কোন রচনায় যে, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-অনুবাদ নিছক অনুবাদ নয়, নতুন সৃষ্টি।

সত্যি কথাই, যে ভাষা থেকেই তিনি অনুবাদ করুন না কেন, কবিতাগুলি যেন নতুন হযে দেখা দিয়েছে—স্বচ্ছ নিরাভরণ, এবং অনুবাদে কোনরকম কৃত্রিমতা নেই। তীর্থ-সলিল এর গোড়ায় তাই তিনি স্বীকার করছেন :

বিশ্ববাণীর বারতা এনেছি বঙ্গের সভাতলে,
ভরেছি আমাব সোনাব ফসল নানা তীর্থের জলে
নিখিল কবির সংগীত ওঠে বঙ্গেব বন-ছায়া।
আমাব কণ্ঠে গাহিছে আজিকে জগতেব যত কবি।

এবং এই পংক্তি কিছুমাত্র বাহুল্য নয়। সত্যি সত্যি জগতের সব কবির কাব্য সত্যেন্দ্রনাথেব কণ্ঠেই যেন গান হয়ে ফুটে উঠেছে। একদিকে অথর্ব বেদের সূক্ত আছে, পাশাপাশি রয়েছে ব্লেক, আবার আছে অষ্ট্রেলিয়ার মাউরী উপজাতিব ঘুম-পাড়ানি গান। পাশে রয়েছে আবেস্তা ধর্মগ্রন্থ, শেকস্‌পীযব, টেনিসন, সুইনবার্ণ। আবাব ববার্ট সাদে, শেলী ও ব্রাউনিঙ, এক পাশে রযেছে মারাঠী গাথা। গকি, কালিদাস, চীনা কবি, তামিল কবি, ভবভূতি ও ভলতেযার—অপূর্ব আন্তর্জাতিকতা। এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এমন ভালোবাসা দিযে এমন সর্বদেশীয় মহামানবতাবাদের বোধ নিয়ে অন্য কোন্ দেশের কোন্ কবি অনুবাদকার্যে হাত দিযেছেন আমাদের জানা নেই। বিশুদার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবব সুধাকব চট্টোপাধ্যায়কেও ধন্যবাদ—এঁদেব কাছে বাঙ্গালী কবিমাত্রেবই ঋণ বইলো। সত্যেন দত্তকে আবার আমাদের মত তথাকথিত আধুনিক কবিদের সামনে উপস্থিত করিয়ে দেবাব জন্য। আমরা ভাবতে শিখলুম 'আধুনিক' শব্দটি নেহাৎই খস্তাপচা—এই শব্দটি 'কবি' শব্দের সঙ্গে যোগ করে গৌরববোধ করবার কিছু নেই, বস্তুত Individual talent তখনই প্রকাশিত হতে পারে যখন Tradition সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারি [এলিয়ট সাহেবের কাছে ইংরেজী শব্দগুলির জন্য ঋণ স্বীকার্য]। সত্যেন দত্তের কবিতায মুগ্ধ হবার মত অনেক বস্তু আছে—সেই মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে এলিয়ট সাহেবের বক্তব্যে যদি আস্থা বাখতে পারি, সৎ কবি না হওয়া যাক, কবিতার সৎ পাঠক হতে বাধা থাকবে না বোধহয়।

[ক্রমশ]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'জাগরণে যায় বিভাবরী'

মহাশ্বেতা, প্রতিমা আমার !

জাগরণে

আমাদের বিভাবরী তোমার পায়ের পদ্মে

কাঁপে যেন জন্মভূমির পিপাসার জল

তুমি স্থির বিষণ্ণ পাথর ।

পৌষ সংক্রান্তি, ১৩৮৩

আলোক সরকার

মুহূর্ত

একজন বোবা লোক তার স্বপ্নের কথা
বলতে চাইছে
তার ঠোঁট কেঁপে উঠছে, তার চোখের তারা

এগিয়ে আসছে সামনে । এ এমন একটা মুহূর্ত
যখন সব আলো নিভে যায়
অন্ধকারের ভিতর ফুঁসে ওঠে অন্ধকার আগুন ।

তার হাত মুঠো হচ্ছে, খুলে যাচ্ছে
তার হাতের মুঠো ।
তার ঘাড় ঢলে পড়ছে ডানদিকে, বামদিকে গড়িয়ে পডছে তার ঘাড় ।

এ এমন একটা মুহূর্ত যা চোখ মেলে দেখবার
এসো, আমরা চোখ মেলে দেখি
একজন বোবা লোক আর একটা কালো ফেনিল উৎকাঙ্ক্ষা।

এসো, আমরা চোখ মেলে দেখি নিস্তব্ধতা ফেনিয়ে উঠছে চারদিক।
এ এমন একটা মুহূর্ত যখন
নিস্তব্ধতা লাফিয়ে চলে বিদ্যুৎ এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়।

আর অন্ধকারের ভিতর ফুঁসে ওঠে অন্ধকার আগুন
হানে তিরস্কার রক্তিম বিদ্রূপ
আস্তে আস্তে বড় হয় শ্বেতপদ্ম আবহমান অর্থহীন।

শোভন সোম

চিরকালের

জানি যেতে হবেই
এই চিরকালের অপেক্ষার
রূপকথার মানুষ মানুষীর জেগে থাকার
গল্পের ভিতর দিয়ে
স্বপ্নের ভিতর দিয়ে
রাতের ভিতর দিয়ে
এই রাত পেরিয়ে

তার আগে সারারাত
নিজেকে শোনাব নিজের গল্প
চিরকালের মানুষ মানুষীর মত
স্বপ্নের ভিতর
রাত পেরিয়ে রাতের ভিতর দিয়ে
চলে যাব
চিরকালের মানুষ মানুষীর মত।

শান্তিকুমার ঘোষ

রথ চলেছে সূর্যের

আষাঢ়ে তোমার নাচ শুরু·

খেত জুড়ে বীজ-বপনের গাভী-দোহনের উৎসব

জলধনুর সাত-রঙ ভেঙে বনবালারা ছড়িয়ে পড়ছে এ-ওর গায়ে

পিঠে ধনুক উষ্ণীষে পালক আদিবাসী যুবাদল নাচতে-নাচতে প্রদক্ষিণ
করে তাদের

এক দুই তিনবার

কে কার বিদ্ধ করলো হৃদয়

বাজনারও বিরাম নেই—সেই পুরানো ঢোলকে মাদলে সমুদ্রের গর্জন

এখন শ্রাবণের বুকের ভেতর মিলনোন্মাদনা

অঙ্কুর থেকে বেরিয়ে এল চারা

অয়নবৃত্ত ব্যেপে দুলছে শস্যের স্তবক—ফ'লে উঠছে মঞ্জরী

তরুকে আলিঙ্গনে বাঁধলো লতা—পুরুষকে রমণী

দুঃখী থেকে রাজা—সবাইকে নিয়ে

রথ চলেছে সূর্যের

গিরিশীর্ষ হ'তে বড়ো সাগরের অভিমুখে

জগদিন্দ্র মণ্ডল

বৃক্ষ-বিপুল

[ভূমেন্দ্র গুহ বন্ধুবরেষু]

বৃক্ষের সবই কি ফুল ? সৌরভ কি

সব বৃক্ষ জুড়ে থাকে ?

থাকে কি শরীর জুড়ে হৃদয় ও

প্রেম, দৃষ্টি ফোটে

সকল শরীরে ?

এ আকাশ আকুল-করা বৃক্ষ
গ্রহে গ্রহান্তরে,
সূর্য প্রাণ শূন্যতায় সে মাটি
অদৃশ্য শিকড় দিয়ে রস টানে।

আহা কুসুমরঙীন
সৌরভ এবং প্রেম দৃষ্টির উদ্ভাসে
চেতনা-গভীরে
কেন খোঁজ বসুধাকুসুম,
কেন শব্দ গানের মতন?

খুঁজে দেখ আর একবার
এমন আশ্চর্য বৃষ্টিপাত
নূপুরের তাল ফেলে নাচে ছোট নদী,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে রৌদ্র ছায়া হয়।

বৃক্ষের সবই কি ফুল? সৌরভ কি
সব বৃক্ষ জুড়ে থাকে?

রাণা চট্টোপাধ্যায়

অসম্ভব কবিতার জন্য

অসম্ভব কবিতা এখনও লিখতে পারি নি, তিরিশ বছর হলো
ছুঁই ছুঁই সুখ, ঘুণ পোকা কাটছে কবিতার শব্দগুলি
তবে কি পারব না লিখতে যা আমি লিখতে চাই
যা আমি লিখতে লিখতেও লিখতে পারি না
এরকম ভাবে বুকে ব্যাথা হয়, করুণা করেও কেউ ছুঁড়ে দেয় না
বাসী ফুলের মালা
এখন আমি কি করব, কিছুই বুঝতে পারি না

মাঝরাতে বুকের মধ্যিখানে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ হয়
উঠে পড়ি, ঢকঢক জল খাই, দাঁতের মাজনের কৌটা খোলা পড়ে থাকে,
শব্দ নিয়ে খেলায় মেতে উঠি,
অসম্ভব কবিতা এখনও লিখতে পারি না,
তবু কেন আসছে তিরিশ বছর ?

শরৎসুনীল নন্দী

এই সীমা ভেঙে

এই সীমা তুমি ভেঙে দিয়ে আমাকে অসীমে নিয়ে যাবে
তাই রাত্রিশেষে
বৃক্ষমূলে জলের ঝরোকা নিয়ে সিঞ্চন করেছি জল,
কি জানি কখন
শাখা বৃন্তে ফুটে উঠবে গেরুয়া ফুলের গুচ্ছ
কি জানি সে কোন্ গন্ধ
আমার এই জন্ম এবং আর এক জন্ম
পার হয়ে চলে যাবে শব্দহীন আলোর গভীরে।

সমরেন্দ্র দাস

দূরে, অন্য কোনো

ফাঁকা কালীঘাট একা জেগে শুয়ে আছে, তার ঘুম নেই
ট্রামের লাইন তাকে পাহাড়া দেয়, বলে—এখন ঘুমোও
কেউ নেই, গাড়ি কিংবা অবাধ মানুষজন এই বেলা
তোমার বিশ্রাম। অবুঝ মেয়ের মত কালীঘাট,
দীর্ঘ কালীঘাট নাকীসুরে বায়না ধরে, না, ঘুমোবো না।

দূরে বারান্দার এককোণে একটি প্রৌঢ় বসে আনমনে দেখে
কেন না, তার স্বপ্নাদ্য ট্যাবলেট ফুরিয়েছে আজ
তাই বসে আছে, আমি দুজনকেই দেখি,
দেখি ফুটপাথ জুড়ে ভিখারী ছেলের পাশে মা নেই
ছোট্ট মুঠোয় ফুলের বদলে ইটের টুকরো রয়েছে
আছে কুকুরের নিঃশব্দ বেপাড়ায় অভিযান
আর দেখি আমাকে, আমারও তো কেউ নেই, শূন্য ঘর
দরোজা-কপাট খোলা নিস্তব্ধ বাড়ি, হিংস্র হোঁচট গলি
ঘুম, প্রিয় ঘুম, এসো তড়িঘড়ি, নিয়ে যাও দূরে অন্য কোনো
ফুলের বাগানে!

পবিত্রভূষণ সরকার

বায়ডাকের বুকে

আয়নার মতো নীলজলে সিঙিমারির রায়ডাকে
আমার স্মৃতিতে আজও নীলচোখ ভুলু মাছ খেলা করে
ফিরে পেতে চায় তোমার চোখের ছায়া।
পা-ডুবানো বরফ ঠাণ্ডা জলে
মালিনীর মতো স্বচ্ছ জলে
স্মৃতিরা ডুব জলে স্নান করে
আমি ক্রমশ তলিয়ে যাই।
আমার চোখজুড়ে ঘুম নামে
মায়ের মতো তোমার শিরশির্ হাওয়ার হাত
আমার দেহে নামে
চোখজুড়ে ঘুম নামে
নির্ভয়ে, তোমার নরম নরম বুকে।

জয়ন্ত সান্যাল

অন্ধকারে শব্দ স্মৃতি

এক

প্রতিরাতে সেই একই ঘণ্টাধ্বনি বেজে যায়
একই শব্দেরা কাঁপে ক্রমচ্ছায়ায়
যেন ভালোবাসা মানে অকস্মাৎ ব্যথাদের কাছে
নতজানু হওয়া, যেন অঙ্গীকার আজো আছে
অন্ধকার বুকে নিঃশব্দ জোনাকির মত

স্মৃতি তুমিই তো বলেছিলে পুরনো ব্যথার স্রোত
জীর্ণ ছায়া মেখে নিজের ভেতর রাতদিন
বহে যায়, রাতদিন দুঃখেরা খোঁজে নতুন কফিন ?

দুই

সমস্ত শব্দেরা একে একে বিদায় নিলে
আমি অন্ধকারকে সঙ্গী করে বসে থেকেছি
বহুক্ষণ , বহুক্ষণ শীতের তপ্ত নিঃশ্বাস
বুকে বয়ে খরস্রোত নদীর কাছে হাত
পেতেছি—তার শীতল মৃত্যু আমাকে
ফিরিয়ে দাও, আবার আমি পেলব
বিছানায় কুয়াশা-জড়ানো স্বপ্ন দেখি

নদী নিরুত্তর। সূর্য নির্বাসনে।
অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমি
মৃত্যুর নাগাল পাই। যেন মৃত্যুর
কাছেই তার অঙ্গীকার ছিল, যেন
ভালোবাসা মানে প্রতিশ্রুতি নয়।

চুণী দাস

রাজা

রাজা তোর মলিন বেশ ততোধিক মলিন মুখখানি
পায়ের দু'পাতা তোর শিশিরের ভেজা ঘাসে
আঁকা হয়ে থাকে, পা ফেটে চৌচির হয়
রক্ত মেশে শিশিরের জলে, রক্তমাখা হয়ে
থাকে পথে পথে ধুলো।
এ-তো শীত দুঃখ তোর রাজা।

বাবা মা কোথায় তোর? চোখ মেলে
কাউকে পেলি না। অথচ সবাই ছিল, আছে
বাতাসের ভাঁজে ভাঁজে অদৃশ্য গানের সুর
অশ্রুত বিলাপ,—যেমন সজীব।
এ নাম কোথায় পেলি? রাজা তোর
মলিন বেশ, ততোধিক মলিন মুখখানি।

দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

স্বপ্ন

কাল রাতে স্বপ্ন ছিল—
সেই চেনা জায়গা, শিউলিতলায় ভোর
সমস্ত দেরাজ খালি করে বেহিসেবী ওড়াচ্ছ মমতা
দুহাতে পায়রা, শরীরে ছল ছল জলশব্দ,
ঝর্ণার স্বরের মত শাড়ী।

কাল রাতে স্বপ্ন ছিল।

সুরজিৎ ঘোষ

আমাদের

এই যা সমস্ত কিছু ভেসে বেড়ায়
কারো কাছে থাকায় কারো দূরে
বজবজে আলিপুর মৌলালীতে
এই সব কিছু সময়ের আর হাওয়ার
অবরে সবরে মাঠে মাঠে গান গাওয়ার।

আর যা সামান্য বিন্দুর বৃন্তে স্তব্ধ হয়ে জেগে থাকে
ভেতরে ভেতরে একটা নাড়ী-ছেঁড়া টান
যেন শব্দে কোন ধ্বনি নেই
জলের প্রতিশ্রুত দাগ নেই
সে সম্পূর্ণ তোমার আমার
ভীষণ হুল্লোড়ের কেন্দ্রে স্তব্ধ গভীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকার।

সমর রায়চৌধুরী

বুকের পাতালে

সারাদিন সারারাত তুমি আমার সামনে ভেসে থাকো বহে যাও
ভৌগোলিক দূরত্ব ভেঙে বাসা বাঁধো বুকের পাতালে
তোমাকে ঘিরে আমার স্বপ্নের বিদ্যুত
যেরকম নদী যায়, যেরকম গ্যাসের বেলুন মেঘ যায়
ভেসে থাকো, বহে যাও, বহে বহে যাও
কিছুই করার নেই অনিয়ম ব্যাতীত তোকে নিয়ে
তবে থাকো, তবু থাকো, বাসা বাঁধো বুকের পাতালে
বুকের পাতালে উপদ্রব ছিল আজ আমি শান্ত নীড় চাই

চাই না প্রদীপ হাতে, এলোচুলে তোমার দাঁড়িয়ে-থাকা।
একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে মাতাল হ'য়ে
তোমার বাড়ীতে যাব
যদি আলিঙ্গন দাও আমার সমস্ত অসুখ সেরে যাবে শর্বানী
তোমার বাড়ীতে আমি যাবো, তোমার বাড়ীতে প্রতিবার
যাবো আমি, বুকের ভিতরে

অনুবাদ

মেঘদূত

কুঞ্জেতে বহুক্ষণ ভ্রমে যে পাহাড়াতে, সেখানে থেকো তুমি কিয়ৎকাল ;
উৎসর্গিত করে কিছুটা জলভার ; চালিত হয়ে পড় ত্বরিৎ বেগে।
বিকীর্ণ নদী এক উপলময় পথে চলেছে বিন্ধ্যের পদরেখায়,
বিরচিত হস্তীর গায়েতে আঁকা যেন, বিসর্পিতা রেবা, ছবির মতো। ১৯

করে' শেষ বর্ষণ করবে পান তুমি সুরভি আমোদিত রেবার জল।
জামবনে প্রতিহত মত্ত গজমদ, সুবাস চারিভিতে কানন ঘিরে।
শক্তির সঞ্চার পূর্ণ হলে পরে বাতাস পরাজিত তোমার কাছে।
রিক্তের লক্ষণ, হালকা হয়ে থাকা, শুধুই গৌরব পূর্ণতায়। ২০

অগণিত নীপফুল, হরিৎ পাংশুটে দেখবে আধফোটা বৃক্ষময় ;
আঘ্রাণ মুখরিত সদ্য ফুটে ওঠা জলার ধারে যত ছত্রাক সার,
তৃণদল ভক্ষণ করছে খুশিমনে ; গন্ধ শুঁকে শুঁকে মাটির পরে—
শুনে নাও জলধর, তোমাকে দেখে বলে, ওরাই পথরেখা বনের মাঝে। ২১

ফোঁটা ফোঁটা বর্ষণ গ্রহণ করে যারা চতুর চাতকেরে দেখবে তুমি !
সারি সারি বলাকার ঊর্ধ্বে উড্ডীন সাজানো বিন্যাস পড়বে চোখে।
গম্ভীর গর্জন শুনলে সম্মান জানাবে সিদ্ধারা চমকে গিয়ে,
শঙ্কায় প্রিয়সখী যখন ভয় পেয়ে করবে দুই হাতে আলিঙ্গন। ২২

উৎসুক দুর্বার গতিতে জানি তুমি আমার প্রিয়পাশে চলতে চাও ,
পর্বতে পর্বতে তবুও বিলম্ব ঘটবে কুসুমেরি গন্ধ পেয়ে ।
হরষিত কেকারব তুলবে ময়ূরেরা সজল চোখভরা স্বাগত নিয়ে ।
দ্রুততর গতিতেই চেষ্টা করো তুমি, এগিয়ে দেবে ওরা খানিক পথ । ২৩

থরথর কেতকীবা উঠবে দুলে দুলে, কাননে চারদিকে পাণ্ডুবতা,
জনপদ মন্দিরে পাথার পাথসাটে বাঁধবে পাখিগণ তাদের বাসা ।
পরিণত হবে ফল , জামের বনে বনে, তোমার আগমনে দশার্ণতে ।
কতিপয় হংসেরা বিশ্রাম নেবে আর দেখবে তোমাকেই নয়নভরে । ২৪

রাজধানী নগরীর বিদিশাবিখ্যাত, পৌঁছে যাবে সেথা যখন মেঘ ,
কামুকের বৃত্তির, পূর্ণ পরিচয়, সকল আয়োজনে সাজানো দেখো ।
ঊর্মিতে চঞ্চল মধুর কলতানে যে আঁকে রমণীর ভুরুর ধনু,
উচ্ছল নদী এক, রয়েছে প্রবাহিত—মেটাও পিপাসা বেত্রবতীতে । ২৫

কদম্ব ফুটে ওঠে নীচে গিরিদেহে তোমার পরশেতে হৃষ্ট হয়ে ।
ভরে আছে কন্দর, বারাঙ্গনাদের রতির পরিমল নিঃসরণে ।
অস্থির যৌবন হয়েছে প্রকাশিত ঘোষিত পৌরুষ দীপ্ততায় ।
করে নিও সেথানেই বিশ্রাম কিঞ্চিৎ, শিখরে নেমে পড়ে চলার পথে । ২৬

অবসান শ্রান্তির, এবার ধীরে চল ছিটিয়ে জলকণা নদীর তীরে ,
নবজাত যূথিকার বাগানে জল ঢেলো, রচনা করো ছায়া, তাদের মুখে ,
স্বেদ মুছে কপোলের যেসব যুবতীরা ক্লান্ত হয়ে গেছে পুষ্প তুলে ।
কর্ণের কুবলয় শুকিয়ে গেছে রোদে তাদের দেখে নিও পলক ভরে । ২৭

উত্তর তব পথ, তবুও বেঁকে যাবে, কেননা সেই পথে উজ্জয়িনী,
সৌধের সুষমায় উপবিভাগ আঁকা, ভুলো না দেখে নিতে সাজানো শোভা ।
সুন্দরী সেথানের চাহনি চঞ্চল, তাদের দেখে যদি খুশি না হও,
বঞ্চনা নিদারুণ বাজবে বুকে তব স্ফুরিত বিদ্যুতে চিনে না নিলে । ২৮

ঢেউয়ের সংঘাত, পড়বে চোখে তব স্খলিত হয়ে চলে নির্বিন্ধ্যা ।
ঘূর্ণিতে নাভি তার হয়েছে বিমুক্ত, মুখর পাখি রচে অলকদাম ।

দৃশ্যের সবসতা কামনা আঁকা দেখে যাও হে তুমি তার সন্নিপাতে,
এই রীতি রমণীর, জানায় ইশারায় মনের অনুরাগ প্রিয়ার কাছে। ২৯

দেহ তার ক্ষীণকায় বেণীর মতো প্রায়, তোমার বিরহেতে থাকার ফলে,
তটময় তরুদের শুকনো পাতা ঝরে দেখায় ঠিক যেন পাণ্ডু রঙ
ভাগ্যের ঘোষণায় বেদনা লেখা আছে শরীর, মন জুড়ে এখন তার
যাতে হয় কৃশতার দুঃখ দূরীভূত ত্বরায় করো তুমি সে আয়োজন। ৩০

অবন্তী নগরীর ভিতরে দেখা দেবে ঐতিহ্যময়ী বিশাল পুরী,
কবিতায় উদয়ন গল্প কথকতা, গ্রামের বৃদ্ধরা শোনায় বসে,
স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে এনেছে এখানেই কিছুটা পুণ্যের স্বর্ণপুঁজি—
খণ্ডিত কান্তির উপজ সুষমায় নতুন সুরলোক ছন্দময়। ৩১

সারসের হর্ষের মিষ্টি কাকলিতে মধুর সেখানের প্রভাতকাল,
উন্মুখ কমলের গন্ধ ভরে রাখে মদির আলোড়িত শিপ্রা নদীকে।
প্রার্থিত প্রণয়ীর মতন সে-বাতাস, সুপটু চাটুকার ক্লান্তিহরা
দূর করে রমণীর রতির শ্রান্তিকে সোহাগ পরশেতে আবেশ ভরে। ৩২

শিখিদের নৃত্যের চপল ছন্দকে প্রীতির উপহার ভাববে তুমি।
গন্ধেতে বাতায়ন, রয়েছে ভরে সেথা, কেশের প্রসাধনে, ধূপের ধোঁয়া,
দূর হবে শ্রমভার, পুষ্ট হবে তুমি কুসুম আমোদিত ভবন দেখে।
ললিতবণিতাদের আলতা মাখা পদ যেখানে চারপাশে রয়েছে আঁকা। ৩৩

মহাকাল মহাদেব, তাঁহার মন্দিরে, এবার যেও তুমি নদীর পাশে।
কণ্ঠের রঙ তাঁর, তোমার শরীরেতে অবাক প্রমথরা দেখবে তাই।
স্রোতজলে উচ্ছল নারীরা কলহাসে স্নানের সৌরভে আত্মহারা,
আনে বায়ু সুশীতল সুবাস পদ্মের, ছড়িয়ে পড়ে তারা বাগানময়। ৩৪

থেকে যাবে ততকাল, যদিও আগেভাগে পৌঁছে যাও তুমি সেইখানেতে,
দিবাকর যেতাবৎ অস্তমিত হন সাঁঝের আরতির সময়কালে।
নিনাদিত পটাহের সঙ্গে গম্ভীর, তোমার গর্জন মিলিয়ে দিও,
মন্দ্রিত সেই নাদ ধ্বনিত দিকে দিকে পুণ্যফল দেবে একই ভাবে। ৩৫

লীলায়িত ভঙ্গীর রত্নখচিত সে চামর নেড়ে পণ্যাগণ,
নর্তন উল্লাসে, পায়ের তালে তালে তুলছে কটিতটে আন্দোলন।
মনে হবে মধুকর, যখন সারি সারি, নয়ন তুলে তারা তোমাকে দেখে।
প্রাথমিক বৃষ্টির স্পর্শে আনে সুখ, শরীরে তাহাদের নখের ক্ষতে। ৩৬

অনুবাদ অজয় দাশগুপ্ত

সীতাকান্ত মহাপাত্র

পাখি

দূরের আকাশে নীল, ঘন নীল, বিন্দুর মতন।
ঘরে ফেরে, দুচোখে ক্লান্তি।

আবার কখনো তার অস্পষ্ট ছায়া
নিথর গতিরেখা, ডানার শব্দে
যেন নৌকা ভেসে চলে হ্রদের কিনারে।

কখনো জীবন্ত হয়ে ওঠে তার শরীর
জবরজঙ পোষাক তার গায়ে,
যেন কোথাকার বোকা এক জোকার,
পিঞ্জরের শূন্যতা দিয়েছে ঢেকে।

আমি বিরক্ত হই। যদিও
আকাশ থেকে গান আসে ভেসে,
অবিরল নাড়া দেয় সমস্ত তন্ত্রীতে।

পাখিটা কোথায় যায়, কোথায় আকাশ, শূন্য
সীমাহীন তার ছায়া, পাখা মেলে।
জানি না কোথায় যায়, ওরে বোকা পাখি
শুধু কোন্ দূরাগত স্বপ্নের ধ্বনি জাগে বাতাসে বাতাসে।

অনুবাদ : জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ারদার

একটি বিশ্ববন্দিত পত্রিকা

PMLA Published by the Modern Language Association of America (volumes of 1976) 62, 5th Ave, New York N Y 10011

এ পর্যন্ত ৯১ বছর যার বয়েস তাঁকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমাদের ছাত্রাবস্থায় যেমন, তেমনি আমাদের শিক্ষকদের ছাত্রাবস্থাতেও PMLA বিশ্ববন্দিত পত্রিকা ছিল। এদেশে এত বিশ্ববিদ্যালয়, এত সোসাইটি, এত সুধীজন, এত সরকারী ও বেসরকারী অর্থ, তথাপি এমন একটি পত্রিকা তো চোখে পড়ে না, অন্তত কাব্য সাহিত্যের। সমস্যাটা এই, যাঁর যাঁর অর্থ বা সামর্থ্য আছে, তাঁর তাঁর রুচি ও যোগ্যতা নেই, যাঁদের যাঁদের রুচি বা যোগ্যতা আছে তাঁদের অর্থ বা সামর্থ্য নেই। বৃথাই অনুশোচনা। Orient Longman-প্রকাশিত ও অধ্যাপক অমলেন্দু বসু-সম্পাদিত Journal of English Studies নামক সুন্দর পত্রিকাটি কি এখনো বেরোয়? মনে তো হয় না।

জানুয়ারী ১৯৭৬ সংখ্যাটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা Howell D Chickering, Jr লিখিত Some Contexts for Bede's Death-Song; ইংরেজী সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রই Bede এর নামের সঙ্গে পরিচিত, তাঁর Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum (Church History of the English People/Ecclesiastical History of the English race), বিশাল গ্রন্থ যে Alfred অনুবাদ করেছিলেন/করিয়েছিলেন তাও অজানা নয়। কিন্তু Epistola Cuthberti de obitu Bedae নামক পাণ্ডুলিপিতে যে Death-song রয়েছে তা হয়তো আমাদের অনেকেরই জানা নেই। রচনাটির প্রকৃত লেখক কে তা নিয়ে Chickering সাহেব অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। তিনি নানা নজির তুলে সিদ্ধান্তে এসেছেন "It seems to me to make better sense, on balance, to assume Bede compose the death-song himself', কিন্তু নিছক গবেষকের এই অনুসন্ধানের জন্যই

রচনাটি মূল্যবান নয়। তিনি দেখিয়েছেন, এ ছোট্ট পাঁচ পংক্তির কাব্যটি মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিচারে একটি অসাধারণ দলিল, এবং আমার নিজের মনে হয়েছে, কাব্যের বিচারেও এর উৎকর্ষ সন্দেহাতীত। টেনিসন এজাতীয় যে কবিতাটি লিখেছিলেন, তাতে সমগোত্রীয় জিজ্ঞাসা আছে, কিন্তু মাত্র স্বল্প পরিসরে Bede সেই অনন্তকালের প্রশ্নকে তুলে ধরেছেন এইখানে তাঁর কাব্যকৃতি, মূলত একজন গদ্য লেখক হয়েও।

Jonathan Swift অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে Journal to Stella লিখে তৎকালেই বিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁর বিরোধী সমালোচকদের বিরোধিতা করে চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখেছেন Thomas B. Gilmore Jr, ষোড়শ শতকের মধ্যপাদে Earl of Surrey-রচিত কিছু সনেট এখনো সাহিত্যের সামগ্রী—তাঁর রচিত পাঁচটি elegy-র গঠন-সুষমা ও অলংকার বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করেছেন C W Jentoft; Henry James এবং আধুনিক কবিতার ব্যক্তিনিরপেক্ষ ইমেজ বিষয়ে দুটি বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে যথাক্রমে Ruth B Yeazell এবং Charles Altieri-এর।

অন্য একটি সংখ্যায় R G Peterson লিখিত প্রবন্ধটি নতুন সমালোচনা রীতি বিষয়ে, যার সূত্রপাত করেছিলেন ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে A Kent Hieatt, তাঁর রচিত Spenser এর Epithalamion প্রসঙ্গে। কিছু গাণিতিক ভিত্তি, প্রতীকী সংখ্যানির্ণয় দ্বারা মাত্রা বিচার, কাব্যে বর্ণিত ঘটনাগুলির ক্রমিক বিন্যাসপদ্ধতি সবই একটি নতুন দৃষ্টিভংগী (কতটা সার্থক বিবেচ্য।) দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। বর্তমান নিবন্ধে বহু বিশিষ্ট রচনাবলীর প্রয়োজনীয় টীকা উল্লেখ করে লেখক স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে The use of measure and symmetry must result from deep human feelings about numbers, centers, circles and limits—from the writer

অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ একটি পরিচ্ছন্ন পত্রিকা মাঝে মধ্যে বার করেন। Bulletin of the Department of English এর vol XI No. 2 (1975-76) সংখ্যাটি চোখে পড়ল, অধ্যাপক অমলেন্দু বসু সম্পাদনা করেছেন, অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী

শ্যাব সহ-সম্পাদক। এই সংখ্যাটিতে নানাবিধ লেখা আছে ইংরেজী সাহিত্য বিষয়ে, যদিও প্রথম রচনাটি গ্রীক নাটক সম্পর্কিত। 'And Agamemnon Dead' প্রবন্ধটির লেখক অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত। গ্রীক ট্রাজেডীতে hamartia অর্থাৎ sin, in the religious sense (কোষ-গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী) প্রসঙ্গটি খুবই জরুরি। অধ্যাপক দত্তের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু hamartia প্রসঙ্গটি, লেখার প্রসাদগুণ স্বীকার্য, জটিল বিষয়টির মর্মস্থলে যেতে কোন অসুবিধে হয় না।

শকুন্তলা ভট্টাচার্য মিল্টন সম্পর্কে একটি নতুন দিক তুলে ধরেছেন—প্রেমের কবিতা কি সত্যি মিল্টন লিখেছেন—না, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এই বস্তুটি অনুপস্থিত ছিল, নাকি তিনি প্রেম নামক বস্তুটিকে স্বাভাবিক এবং মানবিক দিক থেকে দেখতে সক্ষম হন নি। 'Samson Agonistes' থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পংক্তি লেখিকা উদ্ধার করেছেন। অপূর্ব সান্যাল ওয়েবষ্টার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন—বলাই বাহুল্য, শেক্সপীয়র-উত্তর যুগে এই কবি-নাট্যকারই প্রকৃত ট্রাজেডি লিখেছেন বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা। The Duchess of Malfi নাটকের সেই বিখ্যাত পংক্তিটি আমার প্রায়ই মনে পড়ে, 'Cover her face, mine eyes dazzle, she died young' চসারের The Knight's Tale খুবই বিক্ষিপ্ত আলোচনা—ঝর্ণা সান্যালের এই রচনাটি পূর্ণ প্রবন্ধের মর্যাদা পেতে পারে কি? সম্পাদক মহাশয়রা বিচারে আর একটু কঠোর হতে পারতেন।

অরুণ ভট্টাচার্য

বাংলা কবিতা

স্নেহাকর ভট্টাচার্য ঃ তৃষ্ণার তমসা। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। প্রচ্ছদ ঃ পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক কলকাতা ১৭ থেকে প্রকাশিত।

স্বীকার করছি, স্নেহাকর ভট্টাচার্যের খুব বেশি কবিতা আমি আগে

পড়ি নি। তিনি দীর্ঘদিন লেখা বন্ধ করেছিলেন, কবিতার আসর থেকে মনে হয়েছিলো চিরবিদায় নিয়েছেন। তাই হঠাৎ যখন তাঁর একটি সুন্দর ঝকঝকে ছাপা বই হাতে এলো উপহার হয়ে [নেহাৎই একজন কবি অন্য এক কবিতার পাঠককে পড়তেই দিয়েছেন এই উপহার] আমি কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলাম। এত জমানো লেখা ছিল স্নেহাকরের।

কিন্তু বিস্ময়ের আরো বাকি ছিলো। মাত্র প্রথম ৭ পৃষ্ঠা পড়তে পড়তে বেশ কয়েকবার হোঁচট খেতে হয়েছে, থামতে হয়েছে, ভাবতে হয়েছে, কবিতার স্বাদ থেমে থেমে গ্রহণ করতে হয়েছে। স্নেহাকর কি এতো ভালো লেখেন যে আমার বা আমার সমবয়েসী কবিদেরও ঈর্ষনীয়। কেন তিনি ঈর্ষনীয় একে একে বলি।

মহাকাব্যের অনিন্দিতা চরিত্র 'সীতা'র মত একটি নায়িকাকে মাত্র সাত পংক্তিতে ধরে রেখেছেন চিরকালের মত স্নেহাকর, বন্দিনী করে, অশোকবনে নয়, তাঁরই কলমে।

মানুষজন্মের প্রেম, মা গো, এত দুঃখময় বুঝি।
বসুন্ধরা, বুকে নাও ছোট মেয়েটিকে।

এমন স্বল্পভাষ কবিতায় এরূপ ব্যঞ্জনা সচরাচর বাংলাকাব্যে চোখে পড়ে না। পড়ে না এত সংযম [অথচ 'সীতার জন্যে' দীর্ঘ কবিতাটি আমার কাছে তেমন ভালো লাগে নি]।

দ্বিতীয়ত, আমি অবাক হয়েছি কী অনায়াসে তিনি শব্দের সঙ্গে শব্দের সাযুজ্য ঘটিয়ে অতি আধুনিকতম, কলকাতাবাসীদের পরিচিত শব্দগুলিকে, চিরকালের রহস্যে বিধৃত করেছেন

১. পরস্পরবিরোধী বিক্ষোভে ২ এক বিপন্ন খেলায় হা আমি নিজেকে নিয়ে ৩. গা-গুলানো ভয় ভয় ৪ কার পাকা ঘুঁটি মার খায়, কার হাতে ছক্কা পাঞ্জা ঈর্ষাযোগ্য বেশি ৫ আসন্নপ্রসবাগণ গোল হয়ে লুডো খেলে ৬ সময় থপথপ ঘোরে ৭ মাছিদের মহোৎসবে ৮. পাখি যায় ঈশ্বরের পদতলে নীলিমা অবধি ৯ বাতাসকে চিরতে যায় নখে ১০ ওই যে যন্ত্রের সুলক্ষণ পবিত্র পেশীর আলোড়নে ১১. শস্য ও

জ্যোৎস্নার ধু ধু বিশাল প্রান্তরে [একটু একটু জীবনানন্দকে মনে পড়ে, এই উদ্ধৃতিগুলি মাত্র প্রথম পাঁচটি কবিতা থেকে]।

শব্দকে শুধু নিজের ইচ্ছামত নয়, সংসারের বেষ্টনীর মধ্যে থেকে তাদের বেষ্টনমুক্ত করেছেন, ছেড়ে দিয়েছেন "ঈশ্বরের পদতলে নীলিমা অবধি"। 'হা আমি' এবং 'থপথপ সময়ের' ব্যবহার রীতিমত বিস্ময়কর।

তৃতীয়ত, আজকাল বহু-ঘোষিত, বহু-বিজ্ঞাপিত, বহু-আলোচিত কবিদের মত তাঁর কোন চিৎকার নেই। নম্র, স্বভাব সলজ্জ, অথচ ব্যক্তিত্বে অনমনীয় (ব্যক্তিগতভাবে মানুষের এবং কোন কবির এই দিকটিকে আমি বেশি করে পছন্দ করি) স্নেহাকর তাঁর কবিতাগুলির মধ্যেও সেই ছাপ রেখেছেন অবিকল। তার 'character' তার 'personality' সঙ্গে এক এবং অভেদ হয়ে মিশেছে, যেমন মিশেছে তাঁর অগ্রজ আলোকের বা অলোকরঞ্জনের কবিতায়।

চতুর্থত, তিনি পাঠককে চমকে দেবার জন্য লেখেন না। 'আকাশে গাবার রঙ মেঘেদের' হঠাৎ চমক জাগে—কিন্তু সত্যি গাবার রঙ, যা জলরঙ-এর মত হালকা, প্রথম বর্ষণশেষে মেঘের রঙ তো তাই—এত বৈসাদৃশ্য কে অনায়াস সাদৃশ্যে তিনি এই কবিতার বহু ছবিকে সার্থক উপমায় ধরে রেখেছেন। কলকাতাকে বন্দিনী বঙ্গিনী অথবা উন্মাদিনী—যা ইচ্ছে তিনি কল্পনা করেছেন—নিশ্চয়ই 'কল্লোলিনী'র কথাও ভেবেছিলেন। জীবনানন্দ এই শব্দটিকে এমনই নিজের করে রেখেছেন যে আমরা স্বতন্ত্রভাবে এই বিশেষণটি আর প্রয়োগ করতে পারি না।

স্নেহাকরের দুটি দুর্বলতা। এক জীবনানন্দ এখনো তাকে মোহময় করে রেখেছে—নানা স্থানে সেই ছাপ রয়েছে। মহান কবির ছায়াও আদরণীয় সে অর্থে স্নেহাকরের এই দুর্বলতা ক্ষমার্হ। দুই, পয়ারেই তাঁর ক্রমমুক্তি। অন্যান্য ছন্দে তিনি নিজেকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি, যদিও ছন্দের হাত তার বেশ পাকা, যেমন

ঈশ্বর জ্বলন্ত বাঘ/স্থির দীপ্ত/নিমগ্ন আপন মহিমায়
সহজেই এভাবে পড়া চলে, কিন্তু মনে হয় স্নেহাকর এত সহজ রাস্তায় চলেন নি

ঈশ্বর জ্বলন্ত বাঘ/স্থির দীপ্ত নিম্/মগ্ন আপন মহিমায়

অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ব/লন্ত বাঘ/স্থির দীপ্ত নিম/ম্‌গ্ন আ/পন্‌ ম/হিমায়

১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১

এখানে 'পন্‌ম'র মাত্রা লক্ষণীয়।

অর্থাৎ গানের ক্ষেত্রে আড়া-চৌতাল বা আড় খেমটার যে আচম্‌কা ঝোঁক এক্ষেত্রে বোধহয় তিনি তাই করেছেন, অন্তত পাঠক হিসেবে আমার তাইতেই বেশি মজা লাগছে।

অরুণ ভট্টাচার্য

সপ্তদশ অশ্বারোহী। কবিতা সিংহ সম্পাদিত। কে. পি বাগচি এণ্ড কোং, কলিকাতা ১২।

এই কাব্য সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকাতে কবিতা সিংহ জানাচ্ছেন 'এই সংকলন মাত্রই পরিচিতিমূলক'। কাব্যের জগতে এই নতুন 'সপ্তদশ অশ্বারোহী' সকলেই তরুণতম কবি—বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইতস্তত লিখছেন—দুচারজনের নাম বাংলা কবিতার জগতে কিছুটা পরিচিত হয়েছে, যেমন শ্যামলকান্তি দাশ (উত্তরসূরিতে প্রকাশিত এর একাধিক কবিতা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং উক্ত পত্রিকার একটি কবিতাই তাঁর কবিতা-বিষয়ক পুরস্কার প্রাপ্তির কারণ), শুভ মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র দাস, ধূর্জটি চন্দ এঁরা। কবিতা সিংহ অবশ্যই এই সংকলনের মধ্য দিয়ে একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। চেষ্টা করেছেন দেখতে যে কয়েকজন কবিও নিজেদের ক্ষেত্র তৈরী করতে পারছেন কি না। হ্যাঁ, তিনি কিছুটা সার্থক হয়েছেন—সংকলনের সব কবি ছাড়পত্র না পেলেও কয়েকজন, মনে হয়, সময়কালে ভালো লিখবেন।

সংকলনের প্রথম কবি মৃদুল দাশগুপ্ত বহু ছবি ধরে রেখেছেন ঘরময়, কিন্তু ছবিগুলি সাজাবার কৌশলটি আয়ত্ত করতে পারেন নি এখনো। সুভাষ সরকারের অনুভূতিমালা বলিষ্ঠ কিন্তু এই সব পংক্তি

অনন্ত প্রবাসের পথে ওরা হলুদ থেকে ছুটে যাবে আরো যেন হলুদের দিকে

ঢিলে ঢালা। প্রসূন মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ জায়গা জুড়ে যে কবিতাটি লিখেছেন তা পনেরো পংক্তিতে শেষ করা যেত। রাণা দাসের কবিতায় স্যাটায়ার-ধর্মিতা লক্ষণীয়। শ্যামলকান্তি ও সমরেন্দ্র কিছু পরিণত কবি। কিন্তু শ্যামলকান্তির অনেক ভালো কবিতা ছিল। আমার ধারণা, সম্পাদিকা তাঁর দুর্বল কবিতাগুলি পত্রস্থ করে তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন। সমরেন্দ্রর 'রাতারাতি' কবিতাটি খুবই ছিমছাম—শেষ পংক্তিটি হৃদয়ে দাগ কাটে।

ঝুলঝাড়ুটার সঙ্গে সঙ্গে নাচছে তোমার সারা বাড়ি

অরুণা বসু-র 'খুব নিকটের তিনি যখন' কবিতাটি বুকে জোর ধাক্কা দেয়। এই কবি, কবি-স্বভাব বজায় রাখলে, রীতিমত ভালো লিখবেন মনে হয়। শান্তনু গুহ বা তুষার চৌধুরী আরো কিছুদিন লিখুন—হয়তো ভালো লেখা হয়ে উঠবে। তবে দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটি চন্দ এবং শুভ মুখোপাধ্যায় বেশ কিছু মনে রাখবার মত কবিতা লিখেছেন।

অরুণ ভট্টাচার্য

চিঠিপত্র

International Writing program, Unversity of Iowa

২৩শে নভেম্বর ১৯৭৬

শ্রীযুক্ত অরুণ ভট্টাচার্য কবিবরেষু

আশা করি কুশলে আছেন।

আমি এখানে এসেছি সেপ্টেম্বর মাসে কেমব্রিজ থেকে। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে এখান থেকে কেটে পড়বো। নিউগিনি, আমার গন্তব্যস্থলে হাজির হবো ঐ সময়েই। আমার চিঠিটি পত্রিকায় ছাপিয়েছেন জানতে পাবলাম প্রবোধ সেন মহাশয়েব একটি চিঠিতে। জীবনানন্দেব ছন্দ সম্পর্কে আমাব লেখাটার উপব একটু মন্তব্য করেছেন উনি, এবং চিঠির ঐ অংশটি প্রকাশ কবার অনুমতি দিয়েছেন উনি। টুকে দিলাম স্বতন্ত্র কাগজে। ইচ্ছে কবলে ছাপবেন। প্রবোধ সেন মহাশয়েব ছন্দ-সম্পর্কিত রচনাবলীব প্রথম খণ্ড হিসেবে "ছন্দ-জিজ্ঞাসা" বেরিয়েছিল কয় বছর আগে। সেটি পড়ে আমি একটুখানি লিখেছিলাম ওঁকে গত বছব, এই চিঠির অংশটুকুও টুকে দিলাম। ইচ্ছে করলে এটিও ছাপতে পারেন ঐ সঙ্গে।

জাপানী হাইকুব রূপসজ্জাটি বাংলায় আনতে চেষ্টা কবেছি তিনটি হাইকুপদীতে। সতেবো সিলেবলের এই ক্ষুদ্রায়ত পদ্যরূপটিতে মিলেরও বৈশিষ্ট্য আছে। আমাব পবীক্ষানিবীক্ষাটি একেবারে ছেলেমানুষী বলে না ঠেকলে প্রকাশ কবতে পাবেন।

এখানকার প্রোগ্রামে কুড়িটি দেশেব একুশজন লেখক-লেখিকা সমবেত হয়েছেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই সেমিনাব বসে। একেক দেশের সাহিত্য নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়। প্রায়ই কবিতা পাঠও চলে। এই বছবেও কবিতা পাঠেব আসব প্রায় সপ্তাহেই থাকে। এই আসবগুলিব সঙ্গে আমাদেব প্রোগ্রামের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু কোনো কোনো আসরে আমাদেরও ডাক পড়ে। এই রকম একটি আসব চব্বিশঘণ্টা ধরে চলেছিলো একনাগাড়ে—১২ নভেম্বর রাত্রি দশটা থেকে ১৩ নভেম্বর রাত্রি দশটা

পর্যন্ত। এতে কেউ কেউ গল্পও পড়েছিলাম। ১৩ তারিখের বৈকালিক আসরে আমি কয়টি বাঙলা কবিতার অনুবাদ পড়ি। আপনার "LOVE IS LIGHT, LIGHT LOVE" এবং "THE SPRING BREEZE"[১] এই কবিতাদুটি পড়েছিলাম আর পাঁচজন নবীন কবির কবিতার সঙ্গে। এই দুটি অনুবাদের খসড়া আপনাকে নিউগিনি থেকে নিশ্চয়ই পাঠিয়েছিলাম। কপি যদি না থাকে জানাবেন, পাঠিয়ে দেবো। আপনার এই কবিতাদুটির ক্ষুদ্র আয়তনে যে স্নিগ্ধ গভীর বোধটিকে বন্দী ক'রে রেখেছেন, তা আমার অনুবাদে কতটা রক্ষা করতে পেরেছি জানি না। তবে শ্রোতৃবৃন্দ যে আনন্দ পেয়েছেন তাতেই তৃপ্তি পাই। আপনি ও প্রকৃতিদেবী আমার প্রীতিনমস্কার জানবেন॥ ইতি পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

[আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন-কে লিখিত]

য়ুনিভার্সিটি পাপুয়া, নিউগিনি সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

শ্রীচরণেষু,

আপনার ছন্দ-জিজ্ঞাসা গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি পড়ছি। এর বেশির ভাগ প্রবন্ধই আমার অপরিচিত ছিলো। পত্র-ধারা অংশটি এবং রাখালরাজ রায়ের লেখাটি বইটির মূল্য বাড়িয়েছে বলে মনে করি। প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে পড়ে গেলে বাংলা ছন্দচর্চার ইতিহাস যে মুখ্যত আপনারই ছন্দচিন্তার ইতিহাস তা বেশ বোঝা যায়। ছন্দ কী, সৃজনমূলক রচনায় ছন্দের ভূমিকা কী, ছন্দ-আক্রান্ত রচনার কোন্ বৈশিষ্ট্য আকারগত আর কোন্ বৈশিষ্ট্য গুণগত—এসব আলোচনায় আপনার দৃষ্টি প্রথম থেকেই পড়েছে ধরা-ছোঁওয়া যায় এমন একটা উপাদান আবিষ্কারের দিকে। ছন্দের একটি বস্তুনির্ভর এবং ব্যাখ্যাযোগ্য কাঠামো অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা আপনার

---

১ অরুণ ভট্টাচার্যের 'প্রেমই আলো, আলোই প্রেম' এবং 'বসন্তবাতাস' ['সময় অসময়ের কবিতা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত] পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী-কৃত অনুবাদ॥

প্রথম পর্বের লেখাতেই বেশ স্পষ্ট। ধ্বনিতাত্ত্বিক ভৌত উপাদানের কোন্‌গুলি ছন্দে প্রসঙ্গোচিত, এগুলির স্বভাবপরিচয়ই বা কী—এসবের যে আলোচনা আপনার 'ছন্দ-পরিক্রমা' বইতে আপনি করেছেন, তা যে বিশেষভাবে আপনার দ্বিতীয়পর্বের তর্কমুখর ও যুক্তিনিষ্ঠ নিবন্ধগুলির সার্থক ফসল তা কারও দৃষ্টি এড়াবে বলে মনে হয় না।

আর একটা কথা উল্লেখ না ক'রে পারছি না। আপনার ও অন্যান্য ছান্দসিকের গত পঞ্চাশ বছর ধরে সাধনার ফলে যে বাংলা ছন্দ-অলোচনা-ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তা বাংলা ভূমির একটি নিজস্ব দান। বাংলা ব্যাকরণশাস্ত্র এখনও অংশত সংস্কৃত এবং ইংরেজির অধীন। কিন্তু বাংলা ছন্দ-শাস্ত্র একটি স্বাধীন স্বভূমিজাত বিদ্যা। এটি যে হতে পেরেছে তার পিছনে আপনার অবদান সব থেকে বেশী মনে জেনে গর্বিত বোধ করি॥

পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

Santıniketan, W. Bengal (Indıa , 8 11 1976

পরমস্নেহভাজনেষু

উত্তরস্মৃরিতে জীবনানন্দের ছন্দ সম্বন্ধে তোমার লেখাটা পড়ে খুব ভাল লাগল তুমি তাঁর কোনো কোনো পঙ্‌ক্তিকে বলেছ 'নিষ্পদী'। এক হিসেবে কথাটা ঠিক। কিন্তু তার আসল কথা হল যতিলোপ। ত্রিপদীর মধ্যবর্তী দুটো যতিকে লুপ্ত করার ফলেই ও-রকম হয়েছে। এটা একটা কৃতিত্বের বিষয় বলেই মনে করি। কিন্তু কবি নিজে এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। তিনি মনে করতেন তিনি দীর্ঘ, অতিদীর্ঘ পঙ্‌ক্তি রচনা করছেন। আধুনিক পাঠকরাও তাই মনে করেন। মোট কথা এগুলিকে 'নিষ্পদী পঙ্‌ক্তি' না বলে 'লুপ্তযতি ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি' বলাই সমীচীন মনে করি।· · · ·

প্রবোধচন্দ্র সেন

Prithvındra Chakravaıtı, Unıversity of Iowa, U. S. A.

আপনাব বক্ত অন্য একজনকে জীবন দিতে পাবে

ছবি

প্রবন্ধ

কবিতাবলী

সাহিত্য

অনুবাদ

সংগীত

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড কলিকাতা ৫০

বসন্ত সঙ্গী : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত নৃত্যনাটক
ও চারুকলা আকাদেমির সৌজন্যে

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ : দুই বিপরীত মেরুপ্রান্ত

সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আপোষ করে চলেন তাঁরাই যাঁরা নিজস্ব জীবনদর্শনে প্রত্যয়শীল নন। যদিই বা অবস্থাগতিকে ঐ ধরণের প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষী একত্রিত হন কালে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। দুজনে কেউই আপোষ করতে পারেন নি বলে দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর ভিন্নপথে তাঁদের আদর্শগত সামাজিক দায়িত্বপালনে ভিন্নপথ নিতে বাধ্য হন। এই ধরণের আদর্শগত মতভেদ তাঁদের কাছে সমস্যারূপে উদিত হয় না, সাধারণভাবে শিক্ষিত এবং জীবনবোধ নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিদের কাছে যাঁরা, অসাধারণত্বের মোহে, কাকেও ছাড়তে কষ্ট অনুভব করেন। গ্রহণ অথবা বর্জন করার মত মানসিক দৃঢ়তা অর্জন না করতে পারলে ক্রমাগত আপোষ দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিনষ্টিই একমাত্র পরিণতি।

বিংশ শতাব্দীর বাঙালী শিক্ষিত সমাজ নিজেদের একটা বিভ্রান্ত দ্বান্দ্বিক পটভূমিকায় এনে ফেলেছেন। তাঁদের 'রূপনারাণের কূলে' জেগে উঠে কঠিন সত্যের মুখোমুখি হবার সাহস নেই, সেজন্য বঞ্চিত হয়ে চলেছেন। আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী সমাজ যে দুজন বিরাট ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ, অন্যজন বিবেকানন্দ। গরিষ্ঠতম অশিক্ষিত জনসমাজ এঁদের দ্বারা এখনও অ-প্রভাবিত। ঐ বিরাট জনগোষ্ঠী উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অন্ধবিশ্বাস, আচার এবং প্রথাগত ধর্ম দ্বারাই চালিত, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ অথবা বিবেকানন্দ কারও বাণী তাদের উপর কার্যকর হয় নি। শিক্ষিত সমাজে কিন্তু একজনও নেই যিনি এঁদের দুজনের নামের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচিত নন, বক্তব্যের সঙ্গে না হলেও।

দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর প্রথমে কিন্তু সচেতন ছিলেন না যে তাঁদের পথ ভিন্ন, কর্মপন্থাই বিভেদকে স্পষ্ট করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ কিন্তু প্রথম থেকেই স্থির বুঝেছিলেন যে তাঁদের লক্ষ্য এবং পথ ভিন্ন। স্থান এবং কালে তাঁদের সহাবস্থান, কিন্তু পাত্ররূপে তাঁরা ছিলেন দুই বিপরীত মেরুপ্রান্তবাসী। এই বৈপরীত্য বিষয়ে তাঁরা নিজেরা ছিলেন নিঃসংশয়ী, কোনও নিয়ন্ত্রণবাদই এই দুই ব্যক্তিত্বে সমতা আনতে পারে নি। স্বীয় চেতনায় তাঁদের কোনও ভ্রান্তধারণা ছিল না বলে চিন্তাক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রে তো নয়ই, সামাজিক ক্ষেত্রেও তাঁরা একত্রিত হন নি বললেই হয়। সামাজিক জীবনে একত্রিত হবার ঘটনা এতই বিরল যে প্রমাণ উপস্থিত না করেই গবেষক বলে চলেন, 'কলিকাতায় উভয়ের বসবাস তখন এত সন্নিকট ছিল এবং যৌবনে যখন নরেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের কাছে যেতেন তখন দুই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যুবকের নিশ্চয় দেখা হত।' যুক্তির ফাঁক এখানে এতই বিস্তৃত যে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। নেতিবাচক যুক্তি দ্বারা শারীরিক নৈকট্য প্রমাণিত হয় না। অন্য একজন গবেষক উল্লেখ করেন এমন এক সভার যেখানে দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। এই যুক্তি অনুসারে গান্ধী এবং জিন্নাকে সহমতের পোষক বলা চলে, কারণ গোল-টেবিল বৈঠকে দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। কোন জন কার রচিত গান কোন দুর্লভ মুহূর্তে করেছেন তার উল্লেখ দুজনকে অভেদ করে না। দুজনের একজনকেও যে শিক্ষিত বাঙালীর ছাড়তে কষ্ট হয় এই ধরনের পৌনঃপুনিক উল্লেখ কষ্টকল্পিত প্রচেষ্টার আভাস দেয়।

দুই ব্যক্তিত্বের মানস জগৎ এমনই ভিন্নপ্রান্তীয় ছিল যে উভয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েও নিবেদিতার মত দুর্লভ প্রতিভাও দুজনকে একত্রিত করতে সামান্যতম চেষ্টাও করেন নি। নিবেদিতার মহত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন বলেই তাঁকে লোকমাতা বলেছেন। নিবেদিতার কাছেও দুজনের লক্ষ্য ও আদর্শের পার্থক্য অবিদিত ছিল না। এমনকি, বিবেকানন্দের জীবিতকালে নিবেদিতা ততটা রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি আসেন নি যতটা এসেছিলেন পরবর্তী কালে। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ এবিষয়ে সচেতন ছিলেন, এবং সে বিষয়ে নিবেদিতাও ছিলেন সম্পূর্ণ অবহিত, যে তাঁরা

বিপবীত মেরুপ্রান্তবাসী। জানেন না এখনও অগণিত মোহগ্রস্ত ব্যক্তি, যে জন্য তাঁরা একই নিঃশ্বাসে দুজনেব সম আদর্শ ও পথেব কথা বলেন।

আঘাত পেযেও বিরূপ মন্তব্য ববীন্দ্রনাথ কদাচিৎ করতেন, বিশেষতঃ প্রকাশ্যে। সুরেশ সমাজপতিকেও তিনি অচ্ছ্যুৎ গণ্য কবেন নি যদিও ববীন্দ্র-কুৎসায তিনি ছিলেন অগ্রণী। বিবেকানন্দের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁব নিজস্ব প্রত্যয ভিন্নতব হলেও যখন তাঁব সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন তা শ্রদ্ধামিশ্রিত। কিন্তু, এটাও সত্য যে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি যত কথা বলেছেন বা লিখে গেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি লিখেছেন স্বল্পতব প্রতিভাশালী ব্যক্তি সম্বন্ধে। বিবেকানন্দ কিন্তু ববীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নীবব, যদিও বিবেকানন্দ যখন প্রতিষ্ঠাব শীর্ষে তখন ববীন্দ্র-প্রতিভাও দেশে স্বীকৃত। যেটুকু উল্লেখ বিবেকানন্দ ববীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কবেছেন তা প্রশংসাবাচক নয। সংগ্রামী প্রচাবক না হওযাতে রবীন্দ্রনাথেব পক্ষে আঘাত দেওযা স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। অপরপক্ষে বিবেকানন্দ ছিলেন স্বমত প্রতিষ্ঠার্থে ক্ষমাহীন ধর্মযোদ্ধা বিপক্ষেব ধূলিসাৎই যাঁব একান্ত কাম্য। ববীন্দ্রনাথেব প্রতিপক্ষ ছিল না, বেদান্তে অবিশ্বাসী মাত্রই বিবেকানন্দেব প্রতিপক্ষ।

ভাববিলাসী হওয়াতে অধিকাংশেব মধ্যে এই রূঢ় সত্য আজও স্বীকৃত হল না। স্বীকাব, বিজ্ঞানেব সত্যই হোক অথবা নীতির সত্য-প্রতিষ্ঠা, দুইই সময়সাপেক্ষ। কিন্তু মানসিক অলসতা প্রসূত গতানুগতিক-তাব প্রতি প্রবণতা ব্যক্তিজীবনের এবং সমাজজীবনেব প্রতি বাধাস্বরূপ হযেছে যার জন্য মূল্য দিযে চলেছে শিক্ষিত সমাজ। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে পাবস্পবিক বিবোধী মতেব সহাবস্থান যে যুক্তিনিষ্ঠ যুক্তিসম্মত হতে পাবে না সেই সত্য সম্বন্ধে সচেতন না হওযায অধিকাংশই বিশ্বাসের দ্বিচাবণত্ব সম্বন্ধে অনবহিত। গ্রহণ বর্জনের দায়িত্বপালনে তাঁবা অপীড়িত, সত্যানুবাগে অপ্রতিশ্রুত।

ক্ষতিব পরিমাণ যে কত গভীর এবং বিস্তৃত সেটা বোঝা যায় যখন দেখা যায় আধুনিক শিক্ষিতদেব মধ্যে একটি বিশাল অংশ সন্দেহাতীত ভাবেই গুরুবাদী। এটা যদি কেবলই সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত আচবণ হত

তাহলেও তত ক্ষতি হয়তো ছিল না, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে নীরব থাকা চলত। কিন্তু যখন দেখা যায় যে বুদ্ধির মুক্তি ও গুরুবাদ একই সঙ্গে সমর্থিত তখন উদ্বেগ দুঃসহ হয়ে পড়ে। দুই বিরোধী মতের একীকরণ করার প্রবণতাকে রবীন্দ্রনাথ গোঁজামিলন বলেছেন। এই গোঁজামিলনও ভাবের ঘরে চুরি, ব্যষ্টির জীবনবোধ ও সমাজজীবনদর্শনকে ভ্রষ্টাচারী হতে বাধ্য করছে। দুনৌকায় পা রেখে উত্তরণের চেষ্টা যে অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক সে বোধ তখনই জন্মাতে পারে যখন অস্তিত্ব সম্বন্ধেই স্ব-নির্ভর হওয়া যায়। ভরসা নেই কোন নৌকা ঘাটে পৌঁছে দেবে, অর্থাৎ জীবন যথার্থভাবে প্রকাশিত হবে। যে মুক্তি সম্পূর্ণ হলেই গ্রহণবর্জ নর দায়িত্ব পরিহারে সম্ভবপর সে মুক্তি মেলে না। উদাসীনতা নয়, গোঁজামিলনে উৎসাহই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক।

একটিমাত্র ক্ষেত্রে দুজনের সহাবস্থানের কথা বলা যেতে পারে, তা হল উভয়েরই ভারতীয়ত্বের উপর গুরুত্বদান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালিরা যখন নকল সাহেবিয়ানার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল তখন রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ ভারতীয়ত্বের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। এখানেও কিন্তু দুজনের প্রত্যয় এক ধরণের ছিল না। বিবেকানন্দের সাহেবপ্রীতি কিছু কম ছিল না। জাতি বিভাগের সমর্থনে বিবেকানন্দ বলেছেন, "জাতি বিভাগ না থাকলে তোমাদের বিদ্যা ও আর আর জিনিষ কোথায় থাকত। জাতিবিভাগ না থাকলে ইউরোপীয়দের পড়বার জন্যে এসব শাস্ত্রাদি কোথায় থাকত? মুসলমানেরা তো সবই নষ্ট করে ফেলত।" (৯।৪৬৫)।**

"ইংরাজ-জাতি সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল, তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমি বুঝতে পারছি অন্য সব জাতের চেয়ে প্রভু কেন তাদের অধিক কৃপা করেছে। তারা অটল, অকপটতা তাদের অস্থি-মজ্জাগত, তাদের অন্তর গভীর অনুভূতিতে পূর্ণ।" (৭-৩০৮)। বিবেকানন্দের এই ইংরাজ-প্রশস্তি কি তাদের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার সঙ্গে মানানো যায়? শার্ট পড়া বিবেকানন্দ পছন্দ করতেন না। সেটা বিদেশী পোষাক এবং বাঙালীর পোষাকের সঙ্গে খাপ খায় না বলে নয়, যদিও

স্মৃতির সঙ্গে শার্টের চল আটকানো যায় নি, "আরে ওগুলো সাহেবদের underwear (অধোবাস) সাহেবরা ঐগুলো পরা বড় ঘৃণা করে।" (৯-৪০৮)। সাহেবদের ঘৃণাই আপত্তির কারণ। ভিক্টোরিয়ার কাছে পাঠানো মহারাণী-প্রশস্তিতে পাই, "তাঁহার পবিত্র ভারতবাসীর প্রতি দয়া—দুর্ভিক্ষে স্বয়ং দান দ্বারা ইংরাজদিগকে উৎসাহিত করা। তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা ও তাঁহার রাজ্যে উত্তরোত্তর প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি প্রার্থনা।" (৭-৩৫৩)। প্রভুই ইংরাজদের পাঠিয়েছেন উক্তিও তো বিবেকানন্দের। সুতরাং সর্বতোভাবে ভারতীয়ত্বের দিকে দৃষ্টি ফেরানোই বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল নূতন সমাজবোধের বিরোধিতা, বেদান্তের সাহায্যে। এর জন্যও তিনি সাহেবদের মুখাপেক্ষী ছিলেন। সমস্ত নৃপতিরা এমন উচ্চমানবিকগুণে ভূষিত ছিলেন না যে অর্থ সাহায্য দ্বারা বিবেকানন্দকে পশ্চিমে নিজেদের স্বার্থের বিরোধিতা করতে পাঠাবেন। বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন যে বিদ্যাসাগর-কর্তৃক পরিত্যক্ত বেদান্তকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহেবদের প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন। ঐ প্রশংসাপত্র আদায়ে তাঁর চেষ্টার অবধি ছিল না। পাশ্চাত্যদের বিষয়ে তিনি বলেছেন, "এরা আমার ideas (ভাব) যেমন বোঝে, আমার দেশের লোক তেমন পারে না, এবং এরা বড় স্বার্থপর নয়।" (৭-১২৩)। বেদান্তধর্ম ভারতের হলেও তাঁর প্রতিষ্ঠার জন্য সাহেবদের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। ভারতীয়ত্বের প্রতি ততটুকুই অনুরাগপ্রকট হয়েছিল যতটা বেদান্ত-প্রসারের পক্ষে অনুকূল।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য মৌলিক। রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়ত্ব কোনও সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। ভারতকে তিনি সমগ্র জগতের অংশরূপে দেখেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়ত্ব মানবতাভিত্তিক, আত্মনির্ভর। অহেতুক সাহেব-প্রীতি তাঁর ছিল না এবং সাহেবদের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র আদায়ের চেষ্টাতেও তিনি ব্যাকুল ছিলেন না। ভারতীয়েরা তাঁর কাছে সমগ্র মানবসমাজের যেমন একাংশ ছিল, দোষ গুণ মিলিয়ে পাশ্চাত্যবাসীরাও তাঁর মতে মানবসমাজের একাংশ। গোরায়, মেঘ ও রৌদ্রে, ঘুষোঘুষি প্রবন্ধে যে মনোভাব প্রকট তার মধ্যে

সাহেবপ্রীতির ক্ষীণতম সূত্রও দেখা যায় না। যেখানেই ইংরাজ শাসক বলে অন্যায় বা অত্যাচার করেছে রবীন্দ্রনাথ তাদের রেহাই দেন নি। ভিক্টোরিয়ার কাছে যে আবেদন বিবেকানন্দ করেছিলেন সে ধরণের কোনও কাজ রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে কটাক্ষে এককালে করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদই রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়ত্বের পরিচয়। য়ুরোপের সত্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টার কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু ঐ উক্তি তাঁর মানুষের সত্য ও স্বাধীনতার প্রতি আকর্ষণেরই প্রকাশ। একটি বিশেষ ভারতীয় দর্শনের ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের পুনঃপ্রবর্তনের উদ্দেশ্যেই বিবেকানন্দ বলেছিলেন "অতীতের ছাঁচেই ভবিষ্যৎ গড়িতে হইবে, এই অতীতই ভবিষ্যৎ হইবে।" (৮।২১৩)। বেদান্ত ভারতীয় বলেই ভারতীয়ত্বের প্রতি বিবেকানন্দের আকর্ষণ, ভারতীয়ত্ব যে মানবত্বের অংশীদার সে কারণে নয়। সেটা যদি হত তাহলে জাতিভেদকে সমর্থন তিনি কখনোই করতে পারতেন না।

অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়ত্ব অচলায়তন সংরক্ষণে নয়। যে অতীত বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের পথ আটকে রেখেছে তার পরিবর্তনই রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম। রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়ত্ব কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মানুষঙ্গ ন.। দুজনের ভারতীয়ত্ব বোধের চরিত্র ভিন্ন। জ্ঞানতঃই হোক অথবা অজ্ঞানতঃ, ভারতীয়ত্বের মানদণ্ড যে দুজনের এক নয় সেটা অস্বীকৃত হয়ে এসেছে। এই মৌল পার্থক্য বিশ্লেষণ-নির্ভর, সুতরাং পরিশীলন তথা বুদ্ধি-গ্রাহ্য। যেহেতু বুদ্ধির মুক্তি বাঙালীসমাজে বিংশ-শতাব্দীর মধ্যপাদেও তেমন সুলভ নয় সেজন্য এই প্রভেদ দৃষ্টিগ্রাহ্যও হচ্ছে না, বুদ্ধিগ্রাহ্য তো নয়ই।

কিন্তু, বিস্ময়কর এই যে সে ক্ষেত্রে কষ্টকল্পনাতেও দুই বিপরীত দৃষ্টি-ভঙ্গীকে একমুখী করা অসম্ভব সেখানেও বুদ্ধিজীবীরা হয় আপোষ করে চলেছেন, নয় নীরব থাকছেন। দুজনের ভারতীয়ত্ব বোধের চরিত্র বুঝে নিতে বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু জাগতিক জীবনবোধ তথা জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ যে ভিন্নমার্গী সেটা স্বতঃ প্রকাশিত, তার জন্য বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। দুজনের উক্তিই

তাঁদের পরিচয় বহন করে। বিবেকানন্দের কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।

"এই জগৎ আমাদের বাসভূমি নয়।" (১।৭৮)

"যেখানে এই ক্ষুদ্র জগতের শেষ, সেখানেই প্রকৃত ধর্মের আরম্ভ।" (১।১২৫)।

"এই ক্ষুদ্রজীবন, এই ক্ষুদ্রজগৎ, এই পৃথিবী, এই স্বর্গ, এই শরীর এবং যাহা কিছু সীমাবদ্ধ সব ত্যাগ করা মুক্তির উপায়।" (১।১২৫)

"আরও স্বীকার করিতে হয় যে, এখানে মুক্তি নাই, মুক্তি পাইতে হইলে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে।" (১।১৩৭)

"'মনোরম জগৎ', 'সুখের সংসার', 'সামাজিক উন্নতি' এসব কথা 'তপ্ত বরফ', 'অন্ধকার আলো' প্রভৃতি কথার মতোই। ভালই যদি হত তবে এটা সংসারই হ'ত না। অজ্ঞানতা বশতঃ জীব অসীমকে সসীম বিষয়ের মধ্যে, অখণ্ড চৈতন্যকে জড় অণুর মধ্যে প্রকাশ করবার কথা চিন্তা করে, কিন্তু শেষে নিজের ভুল ধরতে পেরে পালাতে চায়।" (৭।২৭৭)

"আমি চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি—পৃথিবীর এই নরককুণ্ডে আর ফিরে আসছি না।" (২।২৭০)।

"যে এজগতে পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা করে সে উন্মাদ বই নয়, কারণ তা হবার জো নেই।" (৭।২৮২)।

"সসীম জগতে তুমি কি করে অখণ্ডের সন্ধান পাবে?" (।২৮২)।

"যে মানুষ একাকী, সেই সুখী" (৭।৮০)।

পৃথিবী ও জীবন সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মনোভাব বেদান্ত-অনুসৃত। মতবাদ ঠিক অথবা ভুল সে প্রশ্ন আপাততঃ থাক। ধরা যাক মতবাদ ঠিক। ঠিক বলে মনে করলে বেদান্ত-ভিত্তিক মতবাদপ্রসূত উপরোক্ত ধারণাগুলিকেও গ্রহণ করতে হয়, মৌখিক গ্রহণে নয়, সত্যনিষ্ঠ হলে জীবনেও গ্রহণ করতে হবে। সেটা না করলে হয় মিথ্যাচারী, নয় জীবন-বোধে মূঢ় প্রমাণিত হতে হবে। এই বিশ্বাসের শেষ এই গ্রহণেই নয়, যে মতবাদ এর বিপরীত তার সম্পূর্ণ বর্জনে। কেবল বর্জনে নয়, বিপরীত মতবাদের সম্পূর্ণ খণ্ডনই নীতি-সঙ্গত। যুক্তির মধ্যে ফাঁকি রেখে বিচার করা চলে না। একটা মত সত্য হলে তার বিপরীত মত সত্য হতে পারে না।

এবার রবীন্দ্রনাথের মতবাদ ও তদ্বিষয়ক উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। অবশ্যই এই সব উক্তির মধ্যে আছে বহুপঠিত উক্তি যা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিনি, কিন্তু যে মানদণ্ড দিয়ে বিবেকানন্দকে চিনতে চাই না।

"লভিয়াছে জীবলোক মানবজন্মের অধিকার
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।" বর্ষশেষ (পরিশেষ)

"জীবন পবিত্র জানি।" ৭নং (শেষ লেখা)

"বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি সমাধিতে।" মুক্তি (সোনার তরী)

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" প্রাণ (কড়ি ও কোমল)

"হয় যদি ধূলি
হোক ধূলি, এ ধূলির কোথায় তুলনা।" খেলা (সোনার তরী)

"জন্মেছি যে মর্ত্য কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।" আত্মসমর্পণ (সোনার তরী)

"ভালোমন্দ দুঃখ সুখ অন্ধকার আলো
মনে হয়, সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।" ধরাতল (চৈতালি)

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।" (গীতাঞ্জলি)

যেখানে বিবেকানন্দের কাছে এই পৃথিবী নরককুণ্ড, এখান থেকে চলে যাবার জন্য তিনি তৈরী, চলে গেলে আর ফিরে আসবেন না এবং তাঁর বক্তব্যানুসারে, জগতের বাইরে যেখানে যেতেই হবে সেখানে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এই রকম :

"সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হতে
কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু, আপন কুটিরে
আপনার তরে। তুমি মিছে ধর দোষ
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।"
বৈষ্ণব কবিতা (সোনার তরী)

রবীন্দ্রজীবন যে উপনিষদ-আশ্রিত সেটা সুবিদিত। কিন্তু জীবনের

সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হতে গিয়ে তিনি কোনও অপরিবর্তনীয়, অনড় ক্লিষ্ট প্রয়াসে বিশ্বাসী ছিলেন না। এবং ছিলেন না বলেই তিনি নিজের জীবনকে উপনিষদের সীমার বাইরে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। শাস্ত্রের অনুশাসন অথবা বিশিষ্ট তত্ত্বের প্রতি অটল বিশ্বাস তাঁর প্রাত্যহিক অর্জিত জীবন সত্যকে শাসন করতে পারে নি। তাঁর সত্য যেমন স্বোপার্জিত তেমনি তিনি চেয়েছিলেন অন্য সকলেও নিজের মত করে সত্যের সম্মুখীন হোক।

এর পরও কি বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে যে বিবেকানন্দের উক্তি-গুলি যে মনোভাব এবং বিশ্বাস-প্রসূত রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলি তার সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্বাস-প্রসূত? এই দুই ভিন্ন মতবাদের মিলন চেষ্টা গোঁজা-মিলনের চেয়েও বোধহীন অপচেষ্টা। অথচ বুদ্ধিজীবীরা দুজনকেই একই সঙ্গে গ্রহণ করতে আগ্রহী।

অনাদি এবং অনন্ত চৈতন্য বিষয়ে বিবেকানন্দ স্থির বিশ্বাসী। অর্থাৎ "সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মত অদ্বৈতবাদ।" (২।৯৮)। শেষ কথা বলা হয়ে গেল। তুলনা করা যাক এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধারণার : শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।" বিশেষ মতবাদের প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী বিবেকানন্দের পক্ষে অমন উক্তি স্বাভাবিক, কিন্তু স্বাধীন চিন্তায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের পক্ষে অমন চরম দাবি অযৌক্তিক মনে হতে বাধ্য। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন না তুলেও কি এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না যে রবীন্দ্রনাথ কোনও সত্যের শেষ আছে বলছেন না, কারণ মানবচিত্ত, তার কাছে, সত্যের সন্ধানে অনির্বাণ, এক সত্য থেকে অন্য সত্যে উত্তরণ মানব-চৈতন্যের প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ হয়েছে, মানবজীবনের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি না হওয়া পর্যন্ত সেই উত্তরণ চলতেই থাকবে। একদিকে রয়েছে মানবের নিতান্ত সীমায়িত চিন্তন যার শেষ উত্তর বহু শতাব্দী পূর্বেই নির্ধারিত এবং ভবিষ্যতে যার নূতনতর প্রকাশ অসম্ভাব্য, অপরদিকে রয়েছে মানুষের চিন্তার সীমাহীন সম্ভাবনা। এই দুই পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীকে কিছু বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা পৃথক বলে বুঝতে চান না এটাই আশ্চর্য।

চিন্তার ক্ষেত্রে মূলগত পার্থক্যহেতু দুজনের কর্মক্ষেত্রও ভিন্ন, সেখানে

তাঁদের প্রকাশও ভিন্নতর। বিবেকানন্দের ভূমিকা বেদান্ত-ভিত্তিক ধর্মের হিন্দু প্রচারকরূপে। যাতে ঐ ভূমিকায় তাকে দেখতে পাওয়া যায় বৃহত্তর ক্ষেত্রে সেজন্যই সামন্তশ্রেণীর আনুকূল্যে তাঁর বিদেশ ভ্রমণ। তার পর থেকেই তিনি ঐ ভূমিকায় উত্তরোত্তর পরিচিত। যদিও তিনি একাধিক-বার বলেছেন যে তিনি মিশনরী নন, প্রচারক নন, কর্মের দ্বারাই সেই উক্তি খণ্ডিত। শেষ পর্যন্ত তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে তিনি প্রচারক "সকলেই প্রচার কার্যে রত, কিন্তু তারা সেটা অজ্ঞাতসারে করে। আমি সেটা জেনেশুনে করব।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড, পৃ ২৩৪)। অনিবার্যভাবে প্রচারকদের পথ ও মতের মধ্যে অসামঞ্জস্য এসেই পড়ে। এই অসামঞ্জস্য নীতি-বিরোধীও হয়। এই অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে যে বিবেকানন্দ সচেতন ছিলেন সেটা বোঝা যায় যখন তিনি বলতে বাধ্য হন "তোরা যে আমার লেকচারে পড়েছিস—সংসারে থেকেও ধর্ম হয় অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে মনে করিস নি যে আমার মতে ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস ধর্মজীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। কি করব, সে লেকচারের শ্রোতৃ-মণ্ডলী সব সংসারী, সব গৃহী—তাদের কাছে যদি পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের কথা বলি তবে তার পরদিন থেকে আর কেউ আমার লেকচারে আসত না।" (৯।৩৫৩)। ধর্মপ্রচারক এবং রাজনীতি প্রচারকের মতে চরিত্রগত সমতা থাকে, কারণ উভয়েরই লক্ষ্য বৃহত্তর জনসংখ্যার সাক্ষাৎ সমর্থন আদায়। এই উদ্দেশ্য প্রধান হওয়ায় উপায়কে যে বলি দিতে হয় তার স্বীকারোক্তি বিবেকানন্দই করেছেন। "এখন এর মধ্যে বুঝতে হবে এইটুকু যে উপায় আর উদ্দেশ্য। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে।" (১০।১৯৩)। রাজনীতিতে রণকৌশল কথাটার আংশিক ছায়া পাচ্ছি এই স্বীকৃতিতে। রবীন্দ্রনাথ কোনও দিনই উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে বাক্যে ও কর্মে অসামঞ্জস্য সমর্থন করেন নি, নিজের পিতৃদেবের জন্যও নয়, যাঁর প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল সেই গান্ধীজির জন্যও নয়, তাঁর স্নেহধন্য সুভাষচন্দ্র অথবা দীনবন্ধু এণ্ডরুজের জন্যও নয়।

ধর্মপ্রচারকের পক্ষে সঙ্ঘ অপরিহার্য। সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা

উপলব্ধিহেতু বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ "আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে আমি এমন একটি যন্ত্র চালাইয়া যাইব—যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে।" (৬।৩৯১)। বলাই বাহুল্য, তাঁর কাছে উচ্চ ভাবরাশির আধার একমাত্র বেদান্ত এবং তার অদ্বৈতবাদ। অন্যত্র বিবেকানন্দ বলেছেনঃ "আমি অর্থ সংগ্রহ করিয়া আপনাদের মঠ স্থাপন করিব, ইহাতে যদি লোকে আমার নিন্দা করে তো আমার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি দেখি না।" (৭-৪০) "আমি ইতিমধ্যেই (নভেম্বর, ১৮৯৪) নিউইয়র্কে একটা সমিতি স্থাপন করেছি। আশা করি আরও কয়েকটা জায়গায় সমিতি স্থাপন করতে সমর্থ হব।" (৭-১৩)। "কিভাবে প্রায় বৎসরাধিক কাল আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম প্রচার করিতেছি।" (৭-২২)।

সঙ্ঘ স্থাপনে তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ এবং ঐ প্রয়োজনে যে অনড় নিয়মাবলী, সার্বিক আনুগত্য ও গুরুবাদ অত্যাবশ্যক সে বিষয়ে তার দ্বিধা নেই। তিনি স্পষ্টভাষায় বললেনঃ "যদি আমার বুদ্ধিতে চলা তোমাদের উচিত বিচার হয় এবং এই সকল নিয়ম পালন কর, তাহলে আমি মঠ ভাড়ার এবং সমস্ত খরচপত্র পাঠিয়ে দেবো। নতুবা তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ একদম।" (৭-২৪৪)। আনুগত্য আদায় করতে বিবেকানন্দ ১৮৯৫ সালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখলেনঃ "থাক, এখানে তোমাকে গোটা দুই উপদেশ দিই। এই চিঠি তোমার জন্য লেখা হচ্ছে। তুমি এই উপদেশগুলি রোজ একবার করে পড়বে এবং সেই মত কাজ করবে।" (৭-১৯৭) "মৃত্যু পর্যন্ত অবিচলিত ভাবে লেগে পড়ে থাক, আমি যেমন দেখাচ্ছি করে যেতে হবে—তবে তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত। আসল কথা হচ্ছে গুরুভক্তি, মৃত্যু পর্যন্ত গুরুর উপর অগাধ বিশ্বাস আমি সর্বদা তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখছি।" (৭-৩৫)।

যে মিশনের প্রতিষ্ঠা বিবেকানন্দ করে গেছেন তা বৌদ্ধ সঙ্ঘ এবং ক্রিশ্চান সঙ্ঘের (মোনাষ্টারি) নবীনতম সংস্করণ দুটি সঙ্ঘই সমাজের বহির্ভূত এবং "বন্ধনমুক্ত" শ্রমণদের দ্বারা পরিচালিত যে শ্রমণদের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, "আমাদের একজন ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীও যে-কোনও গৃহস্থ অপেক্ষা

শতগুণে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ।" (৫।৪০০)। তিনি নিঃসন্দেহ যেঃ "আমি এইসব যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" নিয়মের অমোঘ অনুশাসন, আনুগত্যের দাবি, গুরুবাদ ও সমাজ-বহির্ভূত অস্তিত্ব ব্যক্তিত্বের এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ভিতর থেকেই হোক অথবা বাইরে থেকেই হোক সঙ্ঘকে ঐভাবে স্বীকৃতি দিলে জীবনের উপর তার সার্বিক আধিপত্যকেও স্বীকার করতে হয়। কার্যতঃ তাই হচ্ছে। সঙ্ঘের পরিণতি সম্বন্ধে বিবেকানন্দও কিছুটা সন্দেহ পোষণ করতেন। যথা, "যে মুহূর্তে তোমরা নিজেদের একটি সঙ্ঘে পরিণত করিলে, সেই মুহূর্ত হইতে ঐ সঙ্ঘের বহির্ভূত সকলের প্রতি বিদ্বেষ আরম্ভ হইল।" (১০।২৫৯)। তবুও প্রয়োজনের দায় মেটাতে তিনি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন। সন্দেহ যাতে বিস্তার লাভ না করে তার জন্য তাঁকে এক স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা করতে হল। "সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বলতে 'চার্চ' বুঝায় না এবং সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা পুরোহিত নন।" (১০।১৬২)। ব্যাখ্যার মৌলিকতা বিরল এবং যুক্তি অসিদ্ধ। বাহ্যিক লক্ষণে বৌদ্ধ অথবা ক্রিশ্চান সঙ্ঘের কোনও পার্থক্য নেই। তিনটিই শ্রমণ পরিচালিত, পরিচালনায় স্তরভেদ (hierarchy) আছে। জন্মাধিকার বলে পুরোহিত যেমন বিবেকানন্দের সঙ্ঘে নেই তেমনি অন্য দুটি সঙ্ঘেও নেই। পুরোহিতের সংজ্ঞা বদল এবং কৃত্যের পরিবর্তন হতে পারে। বস্তুত, রামকৃষ্ণ মিশনে তাই হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা দীক্ষা দেন। 'চার্চ' অথবা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন উৎস হতে অনুদানে এবং তার স্বাভাবিক পরিণতি সম্পত্তি আহরণে। তাঁদের সঙ্গে বাইরের অনুগামীদের সম্বন্ধ অধ্যয়ন অধ্যাপনার নয়, ধর্মীয় গুরুশিষ্যের।

যেহেতু বিবেকানন্দের সংগ্রামী সাংগঠনিক প্রতিভার চরমবিকাশ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় সেজন্য তাঁর লক্ষ্য ও পথ অনুধাবন করতে প্রতিষ্ঠানের চরিত্র বিশ্লেষণ বিশদভাবে করতে হল। দেখা গেল, সব সঙ্ঘই যেমন অনুসরণকারীদের সার্বিক আনুগত্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়, যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিপরীত মেরুস্থিত, বিবেকানন্দের সঙ্ঘও তাই।

এবার রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ও পথ সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখা যেতে

পারে যে তাঁর সঙ্গে বিবেকানন্দের ভেদাভেদ কতটা। ভেদ যদি সংশয়াতীত প্রমাণিত হয় তাহলে বুদ্ধিজীবীদের একই সঙ্গে দুজনকে গ্রহণের অযৌক্তিকতাও প্রতিষ্ঠিত হবে। বিবেকানন্দের মধ্যে স্ব-বিরোধিতা প্রবল বলে তাঁর উক্তি এবং কর্মের গতিপ্রকৃতি জটিল। সে কারণে বিশ্লেষণ বিস্তৃত পরিসরে করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথে স্ব-বিরোধিতা অল্পই, নেই বললেও চলে। তাকে নিয়ে আলোচনায় অল্পপরিসরে ব্যাখ্যা সম্ভব, যেহেতু জটিলতা কম।

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয় "তোমার উপর নাই ভুবনের ভার।" বিবেকানন্দের প্রত্যয় যে কি তার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। সেটা যেন ভুবনের ভার তাঁরই উপর। রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ নেই, বিবেকানন্দের আছে, বেদান্ত-অনির্ভর ব্যক্তি মাত্রই তাঁর প্রতিপক্ষ। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী এবং তাঁর ধর্মবোধও নিজস্ব, ব্যক্তিগত। নিজে সেশ্বর কিন্তু তাঁর ত্রিভুবনেশ্বর তাঁর কাছেই নেমে আসেন। তাঁর প্রার্থনা আবিঃ যেন তাঁরই কাছে প্রকাশিত হন। তাঁর ধর্মবোধের প্রকৃতি শান্তিনিকেতনের গ্রন্থের উপাসনাগুলিতে স্পষ্ট। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে উপাসনা করলেও সবটাই যেন স্বগতোক্তি, অন্য কেউ আকৃষ্ট হল কিনা, উপকৃত হল কি না সে ভাবনাই নেই। উপাসনাতে বিবেকানন্দ-সুলভ "আমি বলছি," "আমি দেখেছি," "আমার নির্দেশমত চলবে" এমন ধরণের গুরুবাদী বাণী অনুপস্থিত। যেমন কণ্ঠে, তেমনি লেখনীতেও। সে কারণে রবীন্দ্র-নাথের পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক, আচারগত ও সঙ্ঘনির্ভর ধর্ম নিষ্প্রয়োজনীয়। নিজস্ব পথে, নিজস্ব মতে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হবার দায়িত্ব ব্যক্তির, সেখানেই তার মুক্তি। বিবেকানন্দের ধর্মমত যেখানে সার্বিক আনুগত্য (totalitarian) দাবি করে রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ সেখানে ব্যক্তিনির্ভর। রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্যে যে হৃতমানবত্বের প্রকাশ দেখেছেন তার প্রতিবাদ তাঁর মনুষ্যত্বের প্রতি, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনে। গীতাঞ্জলিতে যে আত্মনিবেদন তার পিছনে কোনও গুরুবাদী নির্দেশ নেই। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সার্বিক আনুগত্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী প্রবণতা, তাদের মেলানো যায় না। গুরুবাদী, পুরোহিত-শাসিত বাঙালী সমাজ অতি

সহজেই সার্বিক আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে যে জন্য বিবেকানন্দ-পন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রজীবনাদর্শ চালিত ব্যক্তিরা সংখ্যায় অল্পই। দায়দায়িত্ব বহন করার চেয়ে অনুগত হয়ে চলা অবশ্যই সহজ। বিবেকানন্দপন্থীরা সেই সহজ পথে চলতে চান। সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হলেও সত্যপ্রতিষ্ঠায় না হতে পারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় না।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ পিতার নির্দেশে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এতে যতটা পিতার প্রতি আনুগত্য দেখা গিয়েছে ততটা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি নয়। যে কোনও দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ নিতেন তা সুষ্ঠুভাবে পালন করা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যে জন্য ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের সচেতনতা তাঁর কর্মে প্রকাশিত। কিন্তু, ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারে তিনি কখনই সংগ্রামী হতে পারেন নি, যে সংগ্রামী মনোভাব দ্বারা বিবেকানন্দ আমরণ পরিচালিত হয়েছেন।

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে সঙ্ঘপরিচালনায় কিভাবে নিয়মের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিবেকানন্দ বেঁধে দিয়েছিলেন। নিয়মের অমোঘ বিধানের প্রতি রবীন্দ্রনাথ চিরকালই সন্দেহশীল ছিলেন। "ঐটাই নিয়ম", এই মনোভাবকে রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ', 'অচলায়তন' প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর কর্ম জীবনের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়েছে। কর্মজীবনে তার কীর্তি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, শিলাইদহ ও পতিসরের গ্রামীণ সমাজ ও শ্রীনিকেতন। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তাঁর লক্ষ্য ছিল কর্মীরা এবং গ্রামবাসীরা যাতে আত্মনির্ভর হতে শিক্ষা পায়, যাতে তারা নিজেদের পথ নিজেরাই ঠিক করে নেয়। ঐ আত্মনির্ভরতা, শিক্ষার প্রসারে তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। এখানে যে সাহায্য তাঁর কাছ থেকে সকলে পেয়েছে সে সাহায্য তিনি দিয়েছেন তাদের একজন হয়ে, বাইরে থেকে নয়, সমাজে অঙ্গাঙ্গী হয়ে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন যাতে তারা সমাজের অংশীদার হয়ে পল্লীসংস্কারের কাজে উদ্যোগী হয়। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে গঠিত কোনও প্রতিষ্ঠানের চরিত্র সঙ্ঘসুলভ ছিল না। পল্লীসংস্কারে ব্রতীরা কেউ শ্রমণসুলভ শ্রেষ্ঠতা বোধ নিয়ে বাইরে থেকে উপকার করতে

অগ্রণী হত না'। তাঁর বক্তব্য: "হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার, সেটি প্রীতির। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষীতার দানে মানুষ অপমানিত হয়।" (লোকহিত কালান্তর) প্রতিষ্ঠানগুলির চরিত্র সঙ্ঘসুলভ ছিল না বলে তাদের নিয়ম কানুনও আঁটসাট ছিল না। তাঁর কর্মপ্রণালীর রীতি স্পষ্ট করে গেছেন শ্রীমতী নির্মলা মহলানবিশকে লিখিত পত্রে। "আমি নিজের ইচ্ছা দ্বারা বা কর্ম-প্রণালী দ্বারা কাউকে অত্যন্ত আঁট করে বাঁধি নে—তাতে করে কোনও কোনও অসুবিধা হয় না বলি নে—আমি নিজেই তার জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছি তবু এইটে নিয়ে গৌরব করি। অধিকাংশ কর্মবীরই এর মধ্যে ডিসিপ্লিনের শিথিলতা দেখে—অর্থাৎ না-এর দিক দেখে, হাঁ-এর দিক দেখে না। স্বাধীনতা ও কর্মের সামঞ্জস্য সংঘটিত এই যে ব্যবস্থা এটা আমার একটি সৃষ্টি—আমার নিজের স্বভাব থেকে এর উদ্ভব।"

অন্যপক্ষে বিবেকানন্দের স্বভাব নিজস্ব ইচ্ছার বাঁধন দিয়ে অন্যকে বাঁধা যায়, অনেক প্রমাণই পূর্বে উদ্ধৃত।

এমন সন্দেহাতীত ভাবে বিপরীত স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দকে একই সঙ্গে গ্রহণ করার মত অসম্ভবের প্রয়াসী।

বিবেকানন্দের নির্দেশ, গুরু ভিন্ন মুক্তি নেই। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, "বাহ্য ফলের দ্বারা নয়, আপন অন্তর্নিহিত সত্যের দ্বারাই কর্ম সার্থক হোক, তাতেই মুক্তি।" নির্বিকারে গুরুবাদী হবার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি উক্তি স্মর্তব্য: "মানুষ যেখানে কোনো জিনিষকেই পরখ করিয়া লইতে দেয় না, ছোট বড়ো সকল জিনিষকেই বাঁধা বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করিতে ও বাঁধা নিয়মের দ্বারা ব্যবহার করিতে বলে, সেখানে অবস্থা যতই অনুকূল হউক না কেন মনুষ্যত্বকে শীর্ণ হইতেই হইবে। সেই পথ পরখ করিবার প্রবৃত্তিকেই আমরা অপরাধ বলিয়া সর্বাগ্রে দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়াছি।" (শিক্ষা)

যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের সংযোগ মুক্তির, চেতনা উত্তরোত্তর তাঁর মধ্যে স্পষ্ট হওয়াতে উত্তরজীবনে আনুষ্ঠানিক

ব্রাহ্মসমাজের ভাব নিতে তিনি অস্বীকার করেন। কর্মে ও চিন্তায় সমন্বয়হেতু রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ শিক্ষক, প্রচারক নন।

দুজনেই ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে নিরীশ্বরবাদীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। বিবেকানন্দের কাছে নাস্তিকতার বাড়া নিন্দনীয় কিছু ছিল না। "কখনও ভাবিও না আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব। এরূপ বলা ভয়ানক নাস্তিকতা।" (বিবেকানন্দ—২-২১৭)। রবীন্দ্রনাথের উক্তিঃ "ঈশ্বর সম্বন্ধে যাদের সঙ্গে আমাদের মেলে না তাদেরই আমরা পাষণ্ড বলি, নাস্তিক বলি, সংশয়াত্মা বলি" (শান্তিনিকেতন)। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন চতুরঙ্গের জ্যাঠামশাই চরিত্র সৃষ্টি আর কার পক্ষে সম্ভব? নিরীশ্বরবাদীরা যে নিজেদের জন্য কৌশল বা উপায় অবলম্বন করে বিবেকানন্দ একস্থানে ঐকথা বলে ইতি টেনেছেন। (১-১৩০)। যেটুকু তির্যক স্বীকৃতি ঐ সামান্য উক্তিতে আছে তাকে ছিন্ন করতে তিনি এই বলে স্ববিরোধিতা করেছেন. "হতভাগ্য ব্যক্তিত্ববাদী তাঁহার নিজের যুক্তিগুলিকে যথার্থ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করিবার সাহস পায় না।" (১-১৩৮)। "চার্বাকেরা মনে করে সব কিছুই জড়। মন বলিয়া কিছু নাই, ধর্মমাত্রই প্রবঞ্চনা এবং নৈতিকতা ও সততা অপ্রয়োজনীয় ও কুসংস্কার।" (৮-২৫৩)। চার্বাক-দর্শন সনাতন ভারতীয় দার্শনিকদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিল এমনভাবে যে মূল সূত্রগুলি অপহৃত। চার্বাকদর্শনের কিছু কিছু সূত্র অন্য সংক্রান্তে পাওয়া যায়। যতটুকু পাওয়া যায় তাতে এটাই স্পষ্ট হয় যে চার্বাক-দর্শনকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকৃতরূপে উপস্থাপিত করা হয়। বিবেকানন্দও তাই করেছেন। ঈশ্বরের অনস্তিত্বে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে অবশ্যই অবিশ্বাসী, কিন্তু ন্যায়বোধে, নীতিবোধে নয়। মনকেও চার্বাক-দর্শন অস্বীকার করে না। বরং বিবেকানন্দেরই মত: "মন পদার্থটা তো জড়।" (৯-১০১)। "মনোবিজ্ঞান থেকেই জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি।" (৯-৩৯৬)। স্বয়ং মনকে জড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। এই সিদ্ধান্তের পরিণতি কি সেটা না চিন্তা করেই চার্বাকদর্শনের নিন্দা করেছেন। সমস্ত

বক্তব্যটাই অসার, বিকৃত এবং অসমর্থিত। এ পর্যন্ত যত চিন্তাশীল নিরীশ্বরবাদী দেখা গিয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই নির্ভীক ভাবে স্ব-বিশ্বাসে স্থিত। সামাজিক অত্যাচার তার জন্য তাঁদের কম সহ্য করতে হয় নি। তাঁরা সৎ হন, সৎ হওয়াতেই তাঁদের আনন্দ বলে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূরণ করতে নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে শুধু সমাজের রোষ নয়, রাজরোষও তাঁদের আদর্শচ্যুত করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু নাস্তিকের সততা যে প্রশ্নাতীত হতে পারে সে বিশ্বাসও তাঁর ছিল। চতুরঙ্গ উপন্যাসের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। ঐ উপন্যাসের জ্যাঠামশাই ও শচীন দুই অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টিই তার প্রমাণ। শচীন নাস্তিক জেনে শ্রীবিলাসের মাথা নিচু হয়ে যায়, কিন্তু দেখতে পায় শচীনের "মুখে সেই জ্যোতি, যেন অন্তরের মধ্যে পূজার প্রদীপ জ্বলিতেছে।" জ্যাঠামশাই-এর মুখে যে উজ্জ্বল সত্যের প্রকাশ তার তুলনা বিরল। "দেখ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুই মানি না বলিয়া আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।" (চতুরঙ্গ)

রবীন্দ্রনাথে নীতির সঙ্গে আপোষ, পথ ও লক্ষ্যে অসামঞ্জস্য নেই, বিবেকানন্দে যে আছে তার একাধিক প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। এই পার্থক্য রূঢ় ও নির্মম হলেও সত্য।

হিন্দুধর্মকে কেন্দ্র করেই বিবেকানন্দের চরিত্রের বিকাশ। তিনি নির্দ্বিধ যে হিন্দুধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। "প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি করিয়া মূল স্রোত থাকে। ধর্ম ভারতের মূল স্রোত, উহাকে শক্তিশালী করা হউক তবেই পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্রোতগুলিও উহার সঙ্গে চলিবে।" (৭-৬২) ভারতে যে একাধিক ধর্ম প্রচলিত সেই সত্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই তাঁর কর্মপ্রণালীর ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে "হিন্দুদের দেখানো যে তাহাদিগকে কিছুই ছাড়িতে হইবে না, কেবল ঋষি-প্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে ও শত শত শতাব্দীব্যাপী দাসত্বের ফলস্বরূপ এই জড়ত্ব দূর করিতে হইবে।" (৭-৭১)। এবং "অতীতের ছাঁচেই ভবিষ্যৎ গড়িতে হইবে, এই অতীতই ভবিষ্যৎ হইবে।" (৮।২১৩)। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ এত

দূরদর্শী ছিলেন যে, তাঁহাদের জ্ঞানের মহত্ত্ব বুঝিতে জগৎকে এখনও অনেক শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইবে" (-৮-২১৩)। হিন্দুধর্মের শক্তি ও সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মনোভাব উদ্ধৃতিগুলিতে স্পষ্ট। তাঁর নিজের মনে কোনও সংশয় ছিল না এবং সেই অসংশয় তাঁর অনুগামীদের মধ্যে প্রচারিত করাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল।

এই প্রত্যয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়ের মিল নেই। রবীন্দ্রনাথের মানবের ধর্ম কোনও বিশেষ দেশগত ও কালগত নয়। প্রত্যয়ের চরিত্র তাঁর একটি উক্তিতেই প্রকট। "কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র যদি স্বীকার করে যে কোনো অংশে তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত তবে তাহার প্রতিষ্ঠাই চলিয়া যায়। · ধর্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে গেলে মূঢ়তাকে নয় কপটতাকে প্রশ্রয় দিতে হয়।" (শিক্ষা)। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে জ্ঞান শব্দটির ব্যবহার দ্বারা বক্তব্যে একটি বিশেষ মূল্য অর্পণ করেছেন। এই মূল্যায়ন দ্বারা উভয়ের পার্থক্য বিস্তৃততর হল। রবীন্দ্রনাথের উক্তি: "জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য।" (শিক্ষা) বক্তব্য মানবিক মূল্যে সমৃদ্ধ। অন্যদিকে বিবেকানন্দ জ্ঞান-লালসাকে পরিত্যাগ করে গুরুর নির্দেশের প্রতি অটল বিশ্বাস রাখতে বলেছেন। জ্ঞান যে সকলের বড়ো এই প্রত্যয়কে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। "সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয় না। এইজন্য সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে।" (সমাজ)। "এখন সময় এসেছে নূতন করে বিচার করবার, বিশ্বলোকের সঙ্গে চিন্তার ও অভিজ্ঞতার মিল করে ভাববার।" (সমাজ)। এই মতবাদের সঙ্গে বিবেকানন্দের মতবাদ "অতীতের ছাঁচেই ভবিষ্যৎ গড়িতে হইবে," অথবা "হিন্দুধর্মের বিষয় সম্যক অবগত হতে জগৎকে বহুশতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে" মতবাদ তুলনা করলে দুজনের মানসিক অবস্থান যে বিপরীত মেরুতে তাতে কোনও সন্দেহ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বিচার ও প্রয়োগ কর্মে মানবের নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভরশীল হতে বলেছেন। "কিন্তু যে জগতের গূঢ় তত্ত্বকে মানব আপন অন্তর্নিহিত

চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা মিলিয়ে পাচ্ছে তাকে অতিমানবিক বলব কি করে।" (মানবধর্ম)। রবীন্দ্রনাথের মতে জ্ঞানার্জন শক্তি মানবের অন্তর্নিহিত, বহিঃ নির্ভর নয়। এই বিশ্বাসে তিনি এতই স্থিত যে মানবতাবাদের প্রথম সূত্র সন্দেহাতীত ভাবেই তাঁর কাছে পাওয়া গেল "স্বাধীনতা-প্রিয়তা যেমন উক্ত আদিম মনুষ্যত্বের একটি অঙ্গ তেমনি সত্যপ্রিয়তা আর একটি।" (সমাজ)। জ্ঞানের উৎস যে দেশকালাতীত, শাস্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষ সেটা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে: "সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না।" (শিক্ষা)। এই ভাবে সত্য-নির্ভর জ্ঞান মানুষকে আত্মকর্তৃত্বের অধিকার দেয় এবং সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা তার পরিচয়। তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে।" (আত্মশক্তি ও সমূহ)। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিন্তাধারা শাস্ত্রনির্ভরতা এবং গুরুবাদের প্রবলতম প্রতিবাদ। শিক্ষার আদর্শে গুরু-শিষ্যের যে সম্বন্ধ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তাতে গুরুর নির্দেশ নির্বিচারে গ্রহণ করতে সর্বদাই নিষেধ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর আকাশপাতাল প্রভেদ। গুরুবাদের সমর্থনে বিবেকানন্দ যে কতটা সোচ্চার সেটা প্রবন্ধের আরম্ভে দেখানো হয়েছে। জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা গুরুবাদী ধারণা থেকেই উদ্ভূত। অধ্যয়ন, পুস্তকের প্রয়োজন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি শিষ্যবর্গকে যে উপদেশ দিতেন সেগুলি জেনে—যদি জানা থাকে—তবে অনেকেই যে কি করে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দে সমভাব কথা বলেন সেটা বিস্ময়কর। বিবেকানন্দের নির্দেশ: "যত কম পড়বে তত মঙ্গল। গীতা এবং বেদান্তের উপর যে সব ভাল ভাল গ্রন্থ রয়েছে সেগুলি পড়। কেবল এই গুলি হলেই চলবে।" (১০।৩০৬)। পাশ্চাত্যদের তিনি সমালোচনা করেছিলেন এই বলে: "যতটা জানিলে তোমাদের পক্ষে কল্যাণ তোমরা তাহা অপেক্ষা বেশী জানো ইহাই তোমাদের মুস্কিল।" (৫-৫৩৫)। ভারতীয়দের ঐ ভুল থেকে মুক্ত রাখতে তাঁর উপদেশ: "অত্যন্ত জ্ঞান

লালসাকে পরিত্যাগ কর কারণ তাহা হইতে চিত্ত বিক্ষেপ ও ভ্রম আনয়ন করে।" (৬-২৯)। কি ধরণের পুস্তক পাঠ্য—সে বিষয়ে তিনি শুধু নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, পুস্তক বিমুখতায় তিনি মুখর। "কিন্তু আমার মতে গ্রন্থদ্বারা জগতে ভাল অপেক্ষা মন্দ অধিক হইয়াছে। এই নানা ক্ষতিকর মতবাদ দেখা যায় সেগুলির জন্য এই সকল গ্রন্থই দায়ী। মতামতগুলি সব গ্রন্থ হইতেই আসিয়াছে, আর এই গ্রন্থগুলিই জগতে যত প্রকার গোঁড়ামির জন্য দায়ী। বর্তমানকালে সর্বত্র মিথ্যাবাদী সৃষ্টি করিতেছে।" (৪-১৪৫)। বিবেকানন্দের এই উক্তিতে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথম, যাবতীয় গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করার প্রস্তাবটাই গোঁড়ামির পরিচায়ক। দ্বিতীয়, রাজনীতি এবং বর্ণবিদ্বেষী নীতিতে যে সার্বিকতা (totalitarianism) বুদ্ধির মুক্তিকে প্রতিহত করে সেই সার্বিকতারই সমর্থন এখানে স্পষ্ট।

অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ তাঁর সৃষ্ট বিশ্বভারতীতে প্রকাশ। শুধু দেশীয় নয়, পৃথিবীর সর্বত্র তিনি খুঁজেছেন জ্ঞানী গুণীদের এবং সসম্মানে তাঁদের অধ্যাপনায় আহ্বান করে জ্ঞানের যে কোনও সীমা থাকতে পারে না সেকথাই জানিয়েছেন। দুজনের মধ্যে এই যে বিরাট পার্থক্য সেটা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। বিশ্বভারতী ও রামকৃষ্ণ মিশন কোনোও মানদণ্ডে যে এক হতে পারে না সেটা অন্ততঃ বোঝবার চেষ্টা করা উচিত।

বিচারের প্রয়োজনের কথা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গুরুত্বের কথা বিবেকানন্দ কোথাও কোথাও উল্লেখ করলেও সামগ্রিকভাবে সে কথা মূল্যহীন হয়ে যায় যখন তিনি বলেন: "আমি বাস্তবিকই দেখেছি ঋষিরা যা বলেছেন সব সত্য।" (৯-১৩৮)। কিংবা, "গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যয় হয়—পড়বার শুনবার দরকার হয় না।" (৯-৪৫)। কিংবা, "কিন্তু এমন সত্য বা বিধিই নাই, যাহা বেদে নাই।" (৯-৪৫৬)। "আমাদের দেশের আহাম্মকদের ব'লো আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরাই জগতে শিক্ষক, বিদেশীরা নয়।" (৭-২৬৫)। "সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যা একমাত্র 'বেদ'।" (৬-৩)।

যে অন্তর্বিরোধিতা বিবেকানন্দের চিন্তায় ও কর্মে প্রকট তা থেকে

রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মুক্ত। বিবেকানন্দের সমস্ত যুক্তি মায়াবাদ থেকে বলে ত্যাগের স্থান জ্ঞানের উর্দ্ধে কারণ, জ্ঞানের পরিধি, তাঁর মতে, সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের যুক্তি মানবতাবাদ-ভিত্তিক বলে, তাঁর মতে, জ্ঞানের কোনোও সীমা নেই। বেদবেদান্তকে চরম বলে দেখেছেন বলে বিবেকানন্দ ভারতকে একান্ত করে দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথের মত সত্য করে দেখেন নি।

সঙ্ঘ হয়তো শরণ করেন নি বিবেকানন্দ, কিন্তু সঙ্ঘের উপর গুরুত্ব অর্পণ করে প্রতিপাদ্য হিসাবে দেশের সামনে সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠতা উপস্থাপিত করেছেন। সঙ্ঘবাসী শ্রমণদের সঙ্গে সমাজের যে যোগ সেটা অন্তরের বা অন্তরঙ্গতার নয়। শ্রমণজীবনের সমর্থক বলে অনিবার্যভাবে নারীদের প্রতি যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে সেটা যদি ঘৃণার নাও হয় সন্দেহের তো বটেই, অবহেলারও বলা যায়। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের কোন মিল নেই বিবেকানন্দ সর্বদাই পাশ্চাত্যদের আকৃষ্ট করতে উৎসাহী ছিলেন। ভারতীয় সংরক্ষণশীলতায় 'কামিনী-কাঞ্চন' কে কিছুটা অশ্রদ্ধেয় বলা হয়। নারীদের সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্যদের ধারণা ভারতীয় ধারণার অনুরূপ নয়। পাশ্চাত্যদের কথা মনে রেখে বিবেকানন্দ শব্দের পরিবর্তন করে নির্দেশ দিলেন, "কামিনী-কাঞ্চনকে কাম-কাঞ্চন করবে।" (৭-২৫২)। একদিকে নারীকে বলছেন ভগবতীস্বরূপা, অন্যদিকে নারী সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করছেন। নারীর সান্নিধ্য যারা দুষ্য মনে করে না তাদের তিনি "মেয়ে-নেকড়া"র (৭-২৫৩) মত গ্রাম্য বিশেষণ ব্যবহারেও কুণ্ঠিত নন। "তোরা স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে একদম আসবি না। আমি তোদের স্ত্রীলোকদের ঘেন্না করতে বলছি না, তারা সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা, কিন্তু নিজের বাঁচার জন্যে তাদের কাছ থেকে তোদের তফাৎ থাকতে বলছি।" (৯-৩৫৩)। ভগবতীস্বরূপাদেরও যদি ভয় করতে হয় তাহলে তাঁরা কেমন ভগবতী ? নারীর সার্থকতা যদি মাতৃত্বে বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয় (৫-৪৩২) তাহলে বিবেকানন্দের এই উক্তি কিভাবে সমর্থনীয় ? "ভগবতীর প্রতিমারূপা নারীকে সন্তান ধারণ করিবার দাসী-স্বরূপা করিয়া

ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, একথা তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদিত হয় না।" (৬-৩৬৬)। গাভীকে মাতা বলে ভারতীয় হিন্দু যেমন অযত্ন দ্বারা তাদের দুর্দশার শেষ রাখে না নারীকেই তেমনি দেবী, মাতৃস্বরূপা ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেও বিবেকানন্দ নারীকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তাকে সম্মানের বলা চলে না। এর জন্য অবশ্যই 'অনেকাংশে দায়ী শাস্ত্রীয় আচার যার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা প্রশ্নাতীত ছিল। আশ্চর্য লাগে চিন্তা করলে যে সহমরণের মত নিষ্ঠুর ও ঘৃণ্য প্রথাকেও বিবেকানন্দ সমর্থন করেছেন পাশ্চাত্যের কাছে হিন্দুধর্মের ভাবকল্প প্রতিষ্ঠা করতে। "এই আদর্শের চরম অবস্থায় হিন্দুবিধবারা সহমরণে দগ্ধ হইতেন।" (১-১৬)। অন্যত্র সহমরণের ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে, "পতির উপর পত্নীর এত গভীর ভালবাসা থাকে যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবনধারণ করা পত্নীর পক্ষে অসম্ভব। একদিন উভয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, মৃত্যুর পরও সেই সংযোগ তাঁহাদের ছিন্ন হইবার নয়।" (১০-৮) প্রচারকের চরিত্র এমনই স্ববিরোধী হতে বাধ্য যে এখানে বিবাহ জন্ম জন্মান্তরের অচ্ছেদ্য বন্ধন যার জন্য রোম্যান ক্যাথলিক ও হিন্দুদের মধ্যে "মহাশক্তিমান পবিত্র বহু নরনারীর জন্ম" হয়েছে বলেছেন (যেন অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তেমন নরনারীর জন্ম হয় নি), অথচ বিবাহের প্রতি বিরাগও একাধিক স্থানে প্রকাশ করেছেন। নিজের ভাই বিবাহ করলে তাঁর সঙ্গে সব সংস্রব ছিন্ন করবেন জানিয়েছেন (৬-৪২৬) অথচ মিস হ্যারিয়েট হেল ও তাঁর ভাবী বরকে তাঁর অনন্ত আশীর্বাদ জানিয়েছেন। (২-২৮১)। নারীর কৃত্য : "মনে রাখিও, কায়মনোবাক্যে পতি সেবা করা স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম।" (৬-৩৫২)। বস্তুতঃ যে মতবাদ এই পৃথিবীকে অতীব দুঃখের আকর বলে সে মতবাদে নারীর অস্তিত্ব সম্মানের হতে পারে না। যুক্তিসম্মত ভাবে পরিণতিতে উপস্থিত হতে চাইলে এটাই স্বীকার করতে হয় যে বিবাহ নামক প্রথার অবলুপ্তি দ্বারা সমগ্র মানব সমাজের অবলুপ্তিই কাম্য, অবশ্য রাসেলপন্থী না হলে আর সেটা তো ভয়ানক কথা। কারণ বিবেকানন্দের মতে "প্রার্থনা ব্যতীত যদি আপনাদের সন্তান হইয়া থাকে তবে তাহারা মানব জাতির অভিশাপ হইবে।" ··· "শিশু জন্মগ্রহণ করে—

হয় দেবতারূপে, নয় দানবরূপে—শাস্ত্র এই কথাই ঘোষণা করে।" (৫।৪৬৩) শিক্ষা এবং আর সব কিছু পরে আসে, ঐগুলি অতি তুচ্ছ। "তাহাদের সন্তানগণ (প্রেমজ বিবাহের সন্তানগণ) অগ্নিসংযোগকারী, হত্যাকারী দস্যু, পরস্বাপহারী, মদ্যপ, জঘন্যচারী ও ক্রুর কর্মা—সাক্ষাৎ দানব হইতে পারে।" (৫-৪৩৫)। ছোট প্রশ্ন—হিন্দু নরনারীর সব সন্তানই কি প্রার্থনার ফল? কোনোও যুক্তি অনুসারে বিবেকানন্দ কথিত ঐ অঙ্গীকার স্বীকার করা যায়?

বিবেকানন্দের নারী সম্বন্ধে এক ধরণের মনোভাব দেখা গেল। বিধবাদের বিষয়ে যা বলেছেন সেটা নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পড়ে। "তাহাদের (বিধবাদের যারা বিবাহ করতে চায়) দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে।" (৫-৪৩৯)। "দেখ আমরা বিধবা সমস্যাটিকে ছোট মনে করি। কেন? কারণ তাহাদের সুযোগ মিলিয়াছিল। তাহারা বিবাহিত হইয়াছিল। যদিও তাহারা সুযোগ হারাইয়াছে, তথাপি একবার তো তাহাদের ভাগ্যে বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং এখন শান্ত হও এবং সেই সৌভাগ্যহীনা কুমারীদের কথা চিন্তা কর—যাহারা বিবাহ করিবার সুযোগ একবারও পায় নাই।" (৫-৪৪৮)। তিনি বললেন: "ছোট জাতিদের মধ্যে বিধবার বিবাহ হয়।" (৮।২৩)। এই তথ্য পরিবেশনে ছোটজাতি ও ভদ্রজাতির মধ্যে পার্থক্য স্বীকৃত এবং ব্রাহ্মরা যখন বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে আন্দোলন করছিলেন তখন তাঁদের সেই সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন এই বলে: "আমরা বিধবাদের বে দিই আর পুতুলপুজো করি নে।"

নারীর স্থান যে পুরুষের পাশে নয় তার একাধিক নির্দেশ বিবেকানন্দ দিয়েছেন। "ধর্ম, শিল্প বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীর পালন—এসব বিষয় স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখানো উচিত। নভেল ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়।" (৯-৩৮)। "রাধাকৃষ্ণ প্রেম শিক্ষার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। শুদ্ধ সীতারাম ও হর-পার্বতী উক্তি শিখাইবে। এবিষয়ে কোন ভুল না হয় যুবক যুবতীদের [পক্ষে] রাধাকৃষ্ণলীলা একেবারেই বিষের মত জানিবে।" (৭-৩২২)। সঙ্ঘের পরিচালনায় নারীদের

আলাদা করে রাখাব নির্দেশ কিছু নূতন নয় কারণ, ক্রিশ্চান ও বৌদ্ধ সঙ্ঘেব ব্যবস্থাও অনুরূপ। এর দ্বারা এটাই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে নারীর সান্নিধ্য, বিবেকানন্দের মতে, কাম্য নয়, প্রেয় তো নয়ই। "বিলিগিরির দুটি বিধবা কন্যা আছেন। তাঁদেব শিক্ষা দিবে ও তাঁদের দ্বারা ঐ প্রকাব আরও বিধবারা যাহাতে স্বধর্মে থাকিয়া সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা পায়, এবিষয়ে যত্ন সবিশেষ করিবে। কিন্তু এসব কার্য তফাৎ হইতে। যুবতীব সাক্ষাতে অতি সাবধান। একবার পডিলে আর গতি নাই এবং ও অপরাধেব ক্ষমা নাই।" (৭-৩২১)।

রবীন্দ্রনাথ নারীকে নানা ভাবে দেখেছেন। অর্ধেক মানবী রূপে এবং অর্ধেক কল্পনায় দেখেছেন, জীবনপাত্রে উচ্ছলিযা নাবী যে মাধুবী দান কবে সেটা অনুভব করেছেন, রাত্রে ও প্রভাতে নাবীর দুই রূপ তাঁকে আবিষ্ট করেছে।

"মনেব অনন্ত তৃষ্ণা মরে বিশ্ব ঘুরি
মিশায তোমার সাথে নিখিল মাধুবী।" (নাবী চৈতালি)

রবীন্দ্রনাথের নাবী বলে ·

যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কব
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কব সহচরী
আমার পাইবে তব পরিচয়।* (চিত্রাঙ্গদা)

অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে যেমন নারীর সম্বন্ধেও দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী আকাশ পাতাল পার্থক্য। "স্ত্রীর পত্র" লেখা রবীন্দ্রনাথে সম্ভব, বিবেকানন্দের কাছে মৃণালের চিন্তাও পতনের। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনী বিবেকানন্দের কাছে সম্পূর্ণ ত্যাজ্য।

বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ সোচ্চার, রবীন্দ্রনাথের পুলিন ও মঞ্জুলিকা বিবাহ করে ফরাকা চলে যায় আর মঞ্জুলিকার বাবা বারে বারেই অভিশাপ দেন। বিবেকানন্দও দিতেন। রবীন্দ্রনাথ পুলিন ও বিধবা মঞ্জুলিকার

বিবাহ কবিতাতেই ঘটান নি, নিজের পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন বিধবার সঙ্গে। কতভাবে, কত সমবেদনার সঙ্গে, বিস্ময়ের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নারীকে দেখেছেন তার অন্ত নেই। এই দেখার সামান্যতম দেখাও বিবেকানন্দে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের গোরা বলতে পারে সুচরিতাকে, "আমি তোমার কাছে এই বলে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমার হাত ধরে তোমার ওই গুরুর কাছে আমাকে নিয়ে যাও।" রবীন্দ্রনাথের যুবতী নারী পুরুষকে উত্তরণে সাহায্য করে এবং পুরুষ "একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই" ভাবে না। আনন্দময়ীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনায় ধরতে পেরেছেন সেটাই তাঁর নারীর নিজস্ব অস্তিত্বের শৌর্যের স্বীকৃতি। যে পার্থক্য দুজনের মধ্যে বিধৃত হল এখানে তার প্রতিটিই জীবনদর্শনের মূল কথা। জীবনের গভীরতায় কেবল নয়, বাহ্যিক আচরণেও যে পার্থক্য আছে সেটাও ব কি করে অস্বীকার করা যাবে?

দেখা যাক, বিজ্ঞানের প্রতি দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী কি রকম। বিবেকানন্দের মতে "আধুনিক বিজ্ঞান যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে, বেদান্ত অনেক শতাব্দী পূর্বেই সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, কেবল আধুনিক বিজ্ঞানে সেগুলি জড়শক্তি রূপে উল্লিখিত হইতেছে মাত্র।" (৫-১৩)। "ডারউইনের কথা সঙ্গত হলেও evolution (ক্রমবিকাশবাদ) এর কারণ সম্বন্ধে উহা যে চূড়ান্ত মীমাংসা একথা আমি স্বীকার করতে পারি না। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্তই ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা বলে আমার ধারণা।" (৯।১১৯)। দৃষ্টিভঙ্গীটাকে বৈজ্ঞানিক কখনও বলা চলে না। চূড়ান্ত মীমাংসার কথা কোনও বৈজ্ঞানিক কখনও বলেন না। তা ভিন্ন অতীতেই শেষ কথা বলা হয়েছে এমন ধারণাও বিজ্ঞান-বিরোধী।

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে আধা বিজ্ঞান ও মেকি বিজ্ঞান নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ করেছেন। কবি ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ বিস্ময়কর। "বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় আমরা যে জগৎকে জানি বা কোনো কালে জানবার সম্ভাবনা রাখি সেও মানব জগৎ।" (মানুষের ধর্ম)। "এখন সময় এসেছে নূতন করে বিচার করবার, বিজ্ঞানকে সহায়

করবার, বিশ্বলোকের সঙ্গে চিন্তাব ও অভিজ্ঞতাব মিল করে ভাববার। (সমাজ)। "সত্যকে অবিরোধে অসংশযে সহজে গ্রহণ করলে তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ কবা হয় না। এই জন্য সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোব ভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে।" (সমাজ)। "য়ুরোপেব সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কায কাবণ বিবিব সার্বভৌমিকতা, আর একদিকে ন্যায় অন্যাযেব সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রকারে র নির্দেশে, কোনো চিবপ্রচলিত প্রথাব সীমা বেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীব বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।" (কালান্তব)। "য়ুবোপের প্রাচীন সম্পদ বিজ্ঞান এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্বলাভ।" (কালান্তব)। বিজ্ঞানকে এইভা.ব গ্রহণ করেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নি। বিশ্বভারতীতে বৈজ্ঞানিকদেব আহ্বান কবে এনেছিলেন এবং স্বয. বিশ্বপবিচয় গ্রন্থ লিখে বিজ্ঞানেব প্রসারে অগ্রণী হয়েছিলেন।

সমাজ সম্বন্ধেও দুজনেব দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন। বিবেকানন্দ বলছেন: "সমাজ আপনার ভাবনা আপনি ভাবুক গে।" (৬-৩৯৮)। যাঁব উদ্দেশ্য বেদান্ত-ধর্মেব প্রচাব তাঁব পক্ষে একথা বলা অতি স্বাভাবিক। এজন্যই সমাজ বিযুক্ত শ্রমণগোষ্ঠীব প্রবর্তন এবং সমাজ সংস্কারকদের প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষ-পাত। অপরপক্ষে ববীন্দ্রনাথের কাছে সমাজই প্রধান, এমন কি রাষ্ট্রেব অপেক্ষা সমাজ তাঁব কাছে বড়ো। সেজন্য সমাজেব কল্যাণ ছিল তাঁর আমবণ চিন্তা এবং কর্ম।

সমাজ বিষযে বিবেকানন্দেব বৈঠকী উক্তি আছে, উক্তিকে কার্যকব করার প্রচেষ্টা নেই, কারণ সমাজ সম্বন্ধে তিনি দায়িত্ব বোধ করেন নি। "কতকগুলি অবিবাহিত graduate (গ্রাজুয়েট) পাই তো জাপানে পাঠাই, যাতে তারা সেখানে কাবিগরি শিক্ষা (technical education) পেযে আসে। যদি এরূপ চেষ্টা কবা যায, তাহলে বেশ হয়।" (৯-১০৬)। তেমন অবিবাহিত গ্র্যাজুয়েট পাওযা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাগিদ ছিল না বলে কোন চেষ্টাই তিনি করেন নি কারণ, তাঁর সমস্ত সামর্থ্যই বেদান্ত প্রচারে নিয়োজিত ছিল। মঠ গড়তে এবং মঠে সন্ন্যাসীদের দীক্ষা

দিতে অর্থবল বা লোকবলের অভাব হয় নি। অর্থনৈতিক মত মৌখিক আলাপচারিতার উর্দ্ধে ওঠে নি। ধনীদের কাছ থেকে বিবেকানন্দ কম অর্থ পেতেন না।

অপর পক্ষে, রবীন্দ্রনাথ যখন অনুভব করলেন যে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্যের শিক্ষা দেশের ছেলেদের পক্ষে আবশ্যিক তখন তিনি তাঁর সন্তানকে ও বন্ধুপুত্রকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়েও নিজের অর্থে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। পরে সমাজের হিতার্থে সেই শিক্ষা এবং নিজের সর্বস্ব নিয়োজিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে যখন তাঁর সমস্ত নিয়োজিত মূলধন আইনের ফলে হাতছাড়া হয় তখন তার জন্য আপশোষ করেন নি।

*বিবেকানন্দের উদ্ধৃতিগুলি বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে উদ্বোধন প্রকাশনের বিবেকানন্দ রচনাবলী থেকে গৃহীত। বন্ধনীর মধ্যে প্রথম সংখ্যায় খণ্ড ও পরের সংখ্যায় পৃষ্ঠা বুঝতে হবে।

সল বেলো : আধুনিক মানুষের জিজ্ঞাসা

উনিশশ' ছিয়াত্তরে ঘোষিত সাতটি নোবেল পুরস্কার সব কটির প্রাপক মার্কিন নাগরিক। সাহিত্যের পুরস্কার পেয়েছেন একষট্টি বছর বয়সের ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখক সল বেলো। তাঁর নামের মধ্যে রয়েছে মার্কিন রুচির প্রতিফলন। বড় বড় শব্দগুলিকে আধাআধি করে সামনের আধখানা ব্যবহার করার যে চলন মার্কিন দেশে শুরু হয়েছিল, সেই হাওয়া এখন পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে গেছে। গ্র্যাজুয়েট থেকে গ্র্যাড্, ফ্যাবুলাস্ থেকে ফ্যাব্ যেমন, তেমনি সলোমন (Solomon) থেকে সল্ (Saul)।

সল্ নিজেকে একজন সাধারণ সেকেলে ধরণের লেখক বলে থাকেন, কিন্তু, তাঁর পাঠক মাত্রই জানেন, এটি বিনয়ভাষণ মাত্রই। ব্রিটিশ সমালোচক ড্‌বলু জে ওয়েদারবি সম্প্রতি তাঁর সমকালীন লেখকদের সম্পর্কে সলের মতামত জানতে চেয়েছিলেন, নোবেল পুরস্কারের জন্য সল্‌কে তালিকা দিতে বলা হলে, সল্ কাদের সুপারিশ করতেন। মালরো এবং সিলোনে-র সঙ্গে তাঁর বিশেষ প্রিয় আরো দুজন লেখকের নাম উল্লেখ করে সল্ বলেছিলেন, এই পুরস্কার এ বছর এঁদের একজনকেও দেওয়া যেতে পারতো। সলের প্রিয় এই দুই লেখক আর কে নারায়ণ এবং ভি এস নইপল। একজন ভারতীয়, অন্যজন ভারতীয়ের বংশধর।

ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে সল্ রীতিমত ওয়াকিবহাল। এদেশে কিন্তু সলের নাম, তাঁর পুরস্কার পাবার আগে, বিশেষ শোনা যায় নি। বরং তাঁর সমকালীন নবোকভ এদেশে বিশেষভাবে প্রচারিত। নবোকভের গ্রন্থ 'ললিতার' অভূতপূর্ব কাটতি অবশ্যই এদেশের পাঠকদের সাহিত্য-প্রীতির পরিচায়ক নয়। ন' বছর আগে, উনিশশ' আটষট্টি সালে, টাইম্ পত্রিকায় সল্‌কে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন সাহিত্য জগতের সর্বাধিক সৃজনাত্মক, নূতন শৈলী সম্পন্ন, বিদগ্ধতম এবং উচ্চ মানের লেখক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিলো। ঐ আলোচনায় নবোকভকে

স্ব-সৃষ্ট কল্পনালোকের মহান শিল্পী বলা হয়েছিল। মার্কিন নাগরিক জীবনের নরনারীর সম্পর্কের যে অংশ মাত্র অভিজাত পরিবারের সন্তান নবোকভের অলস মন্থর কল্পনা-পুষ্ট তথাকথিত নান্দনিক রুচির সঙ্গে মেলে, তাঁর কাজ কারবার শুধু সেটুকু নিয়ে। তাই তাঁকে আমরা পাই একা, বিচ্ছিন্ন, অতৃপ্ত, বয়স্ক এক অন্তর্মুখী ব্যক্তি রূপে।

তুলনায় সল্ নীতিবাদী। সেই নীতিতে রাজনীতি বা গির্জার পাদ্রীর নীতিকথা নেই। উচ্চ মার্গের দর্শনের প্রচারও তিনি করেন না। সলের নীতি নিতান্তই স্ব-নির্ধারিত। জীবন সম্পর্কিত আধুনিক মানুষের জিজ্ঞাসা তাঁর লেখার উৎস, এবং তাই তাঁর লেখায় আমরা দেখি, ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব, গণতন্ত্রের সম্ভাবনা ইত্যাদি সব ব্যাপার। মানুষের উদ্দেশ্য কি বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির প্রকৃষ্টতম ব্যবহার মানুষ কি ভাবে করতে পারে, এই সব প্রশ্নের উত্তর তিনি তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যেমে খুঁজতে চেষ্টা করেন। সল্ অবশ্য নিশ্চিত উত্তর এখনো পান নি। তবে, চরিত্র সৃষ্টির অসাধারণ প্রতিভার উত্তরোত্তর বিকাশ, মানুষের সংজ্ঞা নিরূপণের লক্ষ্যের দিকে ব্যক্তি হিসেবে তাঁকেও এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

চে গীভেরা : কবিতার নিরাময়

বিপ্লবী মাত্রেই রোমান্টিক, তাদের স্বপ্নে যে কোনো মুহূর্তে যে-কোন অর্গল খুলে যায়, যে-কোনো দিকের হাওয়া অকস্মাৎ আনাগোনা করে, যে-কোনো ফুলের মরশুমে যে-কোনো সময় ছেয়ে যায়। লেনিন কবি ছিলেন, কবি ছিলেন হো চি মিন এবং মাও। জীবন মৃত্যু যার পায়ের ভৃত্য ছিলো, এ যুগের অন্যতম সেই দুর্ধর্ষ বিপ্লবী চে গীভেরা ও কবি।

উনিশ শ' সাতষট্টির এক দিনে, বোলিভিয়ার এক অখ্যাত, দুর্গম গ্রাম প্রান্তে বোলিভিয়ার সেনাবাহিনীর উদ্ধত বন্দুকের সামনে দাঁড়ানো চে-কে উপহাস করে বলা হয়েছিলো, তিনি অমর বলে যে এক জনশ্রুতি রয়েছে, চে-নিজে এই মুহূর্তে সে কথার অসত্যতা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন। চে বলেছেন, আমি নিজের কথা ভাবছি না, আমি ভাবছি বিপ্লবের চির-অমরত্বের কথা।

আর্জেন্টিনা-জাত, ডক্টব অফ মেডিসিন ডিগ্রি-ধারী, হাঁপানি-রুগী, দুর্বলদেহী এই মানুষটিকে কোন্ বিপ্লবের মরীচিকা ল্যাতিন আমেরিকার স্যাঁতসেতে, অস্বাস্থ্যকর, দুর্গম ভয়ঙ্কর জঙ্গল থেকে জঙ্গলে নিরন্তর তাড়িয়ে বেরিয়েছে—সে কথা আমবা অনেকেই ভুলে গেছি বটে, কিন্তু চে নামক ব্যক্তিটিব নাম আমবা ভুলি নি।

চে হত্যাকাণ্ডেব পব বোলিভিযা সবকাবের আহ্বানে মার্কিন দেশের একজন ফ্রি লান্স সংবাদদাতা, অ্যাণ্ড সেণ্ট জর্জ চে-র দিনপঞ্জী ও কাগজ-পত্র উদ্ধাব, পঞ্জীকবণ এবং টাইপ কবাব জন্য গিয়েছিলেন। অ্যাণ্ড্রু কিউবা-তে কিছুদিন চেব সঙ্গে ছিলেন। অ্যাণ্ড্রুব পবিশ্রমেব ফলে, চে-দিনপঞ্জী মুদ্রিত হযেছে, যদিও চে-র মূল দিনপঞ্জীব বহুলাংশই বোলিভিয়-সরকাব ছাপবাব অনুমতি দেন নি। তথাপি, সেই খণ্ডিত দিনপঞ্জীব পংক্তিতে পংক্তিতে আমবা পাই, চে-ব জীবনেব শেষ অধ্যায়ের মর্মস্পর্শী, দুঃখজনক অভিজ্ঞতা। তখন ভাবি, দূর থেকে যাকে মনে হযেছিলো আগুনের টুকরো, কাছে এসে দেখি, সে-যে আর দশজনেবই মত ভালোবাসা ব্যথা আশা দিয়ে গড়া একজন নিছকই মানুষ।

চে-ব দলে কখনোই সর্বাধিক একান্নজনেব বেশী লোক থাকতো না। বোলিভিযাতে তিনি ঐ সংখ্যক লোক নিয়েই গিয়েছিলেন। তাদেব মধ্যে অগ্রগণ্য সতেবো জন ছিল কিউবান যারা স্থানীয় ক্যেচুয়া ভাষা জানতো না। ফলে বোলিভিয় ক্যেচুযা ভাষী জনগনের সঙ্গে চে-ব দলের আত্মিক যোগ পড়ে উঠতে পাবে নি বোলিভিয় লোকেদেব সম্পর্কে চে তাঁব দিন-পঞ্জীতে লিখেছেন, 'এবা পাথরেব মত দুষ্প্রবেশ্য।' বোলিভিয় সেনাবাহিনীর ক্ষমতাকে চে ছোট করে দেখেছিলেন। তাদের হাতে একেব পর এক চে-র অনুগত দলের লোকেরা প্রাণ দিতে থাকে। জঙ্গল থেকে জঙ্গলে অহরহ তাড়া খাবাব কালে তাড়াহুড়োতে, প্রাণের দায়ে, চে তাঁর ওষুধেব বাক্স সহ বহু জিনিষপত্র ফেলে আসতে বাধ্য হন। বোলিভিয় সেনাবাহিনী ক্রমশঃ যতই সন্নিকট হয়ে আসতে থাকে, পর্যুদস্ত অসহায় ভগ্নবল মরীয়া চে-র দলের লোকেদের মধ্যে আত্মকলহ বাড়তে থাকে। হাঁপানি রুগী, ক্ষমতাহীন চে তাঁর চোখেব সামনেই দলের অবশিষ্ট গুটি কয় লোকের মারা-

মাবি, ঝগডা আদর্শভ্রষ্টতা নির্বাক দর্শকের মত দেখেছিলেন। দলের কাছে তখন তিনি ভূমিকাহীন নেতা মাত্র। সেদিন চে সান্ত্বনার জন্য কবিতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। দিনপঞ্জীতে কবিতায় সে কথা লেখা আছে।

'এখন আমবা অবশিষ্ট কজন,
পিঠেপিঠি ভায়ের মত , পিঠেপিঠি ভায়েব মতই
ঝগডা করি, রুষ্ট হই, চেঁচাই।
যুদ্ধ বিষম কষ্টদায়ক অভিশাপের বাস্তা—
কিন্তু বিজয় ধবল এবং
শিষ্টতা উজ্জ্বল.
শূন্য মুখেব ধবল হাসি,
শাদা মিথ্যে স্তোক-পোষিত অশেষ পথ।
তবু যে কেন সেই বিজয়ের উজ্জ্বল লগ্নেও
স্মবণে আসে শ্রান্ত, ক্রুদ্ধ এ-সব মুখ,
বডো ব্যথায় এদেব স্মৃতি উজিয়ে ওঠে মধুরতাব,
ছাপিযে সব ধবল হাসির তোড ?' (স্মৃতি)

বোলিভিয়াব জঙ্গলেব যাযাববের জীবন-নাটকে নাযিকার ভূমিকায় ছিলেন, সাংকেতিক নামধাবিনী তানিয়া। তানিয়া-রহস্য এখনও সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয নি। কুডিব কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্ব বযস্ক, মাজা ত্বক, সুন্দবী তানিয়া নিজেকে আর্জেন্তেনিয বলতো, যদিও পবে জানা গেছে, সে ছিল পূর্ব-জার্মান, ওর নাম ছিল মাবিয়া বান্‌ক্ এবং তাকে সোবিয়েত গোযেন্দা বিভাগ হাভানা-তে পাঠিয়েছিলো চে-ব গতিবিধির পব নজর বাখবাব জন্য। হাভানা-তে চে-ব সঙ্গে ওব প্রথম সাক্ষাৎ হয। চে যদিও তখন দ্বিতীয়বাব দার পরিগ্রহ কবেছিলেন, তবু তিনি তানিয়াকে ভালোবাসলেন এবং ওকে গেবিলা কায়দা শিক্ষা দিয়ে অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে বোলিভিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। তানিয়া লা-পাজ-এ এসে বাষ্ট্রপতির প্রচার দপ্তরে চাকরি পেয়ে গেলো এবং গোপনে গোপনে চে-ব বোলিভিয়ায় আসার ক্ষেত্র তৈরি করতে লাগলো। তানিয়া ছিলো শখের সঙ্গীত-বিশারদ এবং চে-র আদেশ অগ্রাহ্য কবে বোলিভিয় লোক সঙ্গীতেব টেপ রেকর্ড করার অভিলাষ চে-র

গোপন আবাসে এসে বসবাস করতে শুরু করলো। উনিশশ' সাতষট্টি সালের মাঝামাঝি তানিয়া সহ ন'জন বোলিভিয় সেনাবাহিনীর গোপন ফাঁদে ধরা পড়ে এবং এদের মধ্যে আটজন মারা যায়। তানিয়ার শব ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গেলো, সে তখন চার মাসের গর্ভবতী। তানিয়ার মৃত্যুর খবর চে বোলিভিয় বেতার মারফৎ জেনেছিলেন, কিন্তু তাঁর দিনপঞ্জীতে কোনো বিষাদ তিনি লিপিবদ্ধ করেন নি। অ্যাণ্ড্রু চে-র কাগজ পত্র ঘেঁটে পরে একটি কবিতা পেয়েছিলেন, যেটি 'ত'-র উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিলো :

অরণ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয় জুড়ে
অন্ধকার নৈঃশব্দ
মানুষের গান থেমে গেছে
সে গুটিয়ে রাখছে
ছোটো, প্লাষ্টিকের ফিতেয় ধরা গান। সে গান
এখন থেমে গেছে।
কিন্তু ওর হৃদয়ে বেজে উঠছে কোন্ গান? হায়,
সে তো আমি আর কখনোই জানব না,
যে সুরের টানে সে এখানে এসেছিলো
তাও আমি আর শুনতে পাব না।
অরণ্যের তরুগুল্ম তাকে কোনো ছন্দে বেঁধে রাখতে পারলো না,
সঙ্কেত লিপির আর হৃদ্‌ঘাতের ধ্বনি
প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় থাকবে না।
সে আর গাইবে না
গুনগুনিয়ে তার ভালোবাসার গান।
তবু গান তাকে ছেয়ে রয়েছে, যে গান তাকে
এগিয়ে নিয়ে চলেছে অরণ্যের ভয়াল নিঃশব্দ থেকে
সেই বিজয়োজ্জ্বল উচ্চারণের দিকে, সে গান
একমাত্র সে-ই শুনতে পাবে।

শোভন সোম

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ॥ ভালোবাসাব প্রত্যয়ে

আমি তোমাকে এক আশ্চর্য বাড়ী বানিয়ে দিতে পারি
যার প্রত্যেকটি তল এবং প্রত্যেকটি কক্ষ তোমাকে আশ্চর্যান্বিত
করবে, তুমি যা চেয়েছিলে তাব চেয়ে অনেকগুণ মহীয়ান
সুন্দর, অন্য অনেকেব যা আছে সেই সব হর্ম্য, অট্টালিকা
প্রাসাদ ইত্যাদিব তুলনায় অনেক বেশী আকর্ষণীয়, প্রত্যেকটি
কক্ষতেই তোমাব ইচ্ছা করবে কিছুক্ষণ থাকি বসি, ছেড়ে
যেতে ইচ্ছে কববে না, না, তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা
সেই কক্ষে থাকতে পারো, তোমার বন্ধু পরিজন নিয়ে আলাপ কবতে
পারো—যখন সে কক্ষে থাববে, সেই কক্ষে বসেই,
যা কিছু ইচ্ছা কববে সব পাবে, অথচ প্রত্যেকটি কক্ষ
আলাদা—কোনোটি চতুষ্কোণ, কোনোটি ত্রিকোণ, কোনোটি
পঞ্চকোণ, কোনোটি ছোট, কোনোটি বড এবং প্রত্যেকটি কক্ষই
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সজ্জিত, প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে এক একটি
উজ্জ্বল অথবা মৃদু আলো
তোমার উপস্থিতিকে অনুভব করবাব চেষ্টা এবং প্রকাশ
করবার চেষ্টা কবে। আমি যখনই তোমাব জন্য একটি বাডীব কথা
ভেবেছি, তখনই এই বকম একটি নবতল বাড়ীর কথা ভেবেছি
যার প্রত্যেক তলায় আবার নটি ক'রে কক্ষ থাকবে—
কেননা তোমার মনের আলোআঁধারি ভাব অনুযায়ী
তুমি যে কোনো একটি কক্ষ বেছে নিতে পারবে—
এই রকম একটি বাড়ী তোমাকে
তৈরী ক'রে দেওয়া আমার কথা ছিলো, কথার উপর কথা
গেঁথে গেঁথে সেইরকম একটি বাড়ী তোমাকে আমি

রচনা করে দিতে পারি, সিঁড়িতে পা দিলেই তুমি সেই সব কক্ষে
চলে যেতে পারো—সিঁড়িগুলি অবশ্য ভাব এবং
ভালোবাসার।

জগন্নাথ বিশ্বাস ॥ তপগাঁ-র চূড়ায়

হৃদয়, নিস্তব্ধ হও।
এই সব দীর্ঘকায় গাছগুলো
একসার নীরব প্রার্থনা।

এই সব পিতামহ গাছ
অন্ধকার জ্রূণ থেকে
আলো আর জীবনের কাছে আসে।
বহু দূরে ভুটিয়া বস্তিতে
মণিপদ্মে হুম শব্দ, শিঙাধ্বনি,
মন্ত্রপূত এক সার পতাকা উড়ায়।

ধূপিবনে তপগাঁ-র চূড়ায়
এখন নিস্তব্ধ হওয়া।

সুনীলকুমার নন্দী ॥ পুতুলের খেলা

কী যেন তোমাকে বলতে গিয়েও
বার বার আমি থতমত খাই
গমগমে আলো, আলো আবডাল
টুক ক'রে খুলে
ফিরে আসি একা, একা হয়ে যাই

মাঠ ..

মানে

এই কাদা মাটি জল ভালোবাসা? সে তো

যেন পিকনিক, পুতুলের খেলা।

বস্তুত, আলো—বঙমশালের—

লোফালুফি নিয়ে রাত্রি নাচায়

অথচ হয়তো

পাশফিরবার

কয়েক পা শুধু পিছনে এলেই

কাদা মাটি জল

কাদা মাটি জলে নীহারিকা থেকে খসে-আসা আলো জড়ানো ছায়ায়

গাঢ় মেটেমেটে যে-অন্ধকার

তার কে মিশে অনায়াসে বলি: ও কিছুই নয়, পুতুলের খেলা।

প্রকৃতি ভট্টাচার্য ॥ কোন কবিকে

সব ছেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে

নিজের মধ্যে রইলেন মুখ বুঁজে।

দশদিক থেকে হাজার হাওয়া তারু

এসে দরজা ভেঙ্গে ফেলতে চাইল

সে তখন গভীর অনুভবের মধ্যে যোগনিদ্রায়।

১লা নভেম্বর

স্বদেশরঞ্জন দত্ত ॥ এ-ও এক খেলা

খেলা সবি খেলা
সবুজ পাহাড়ে সাদা পাখি গন্ধ তার ডানা হয়ে ওঠে
রঙিন গন্ধ প্রজাপতি হয়ে ওড়ে
ঘাসের শিরায় এতো আয়ু
সবুজের এতো
খেলা সবি খেলা

খেলা সবি খেলা সারাবেলা
উদ্যান সবুজ মাটি সরিয়ে সরিয়ে উঠে আসে
ছোট ছোট উঁচু মাথা কচি কচি হাতে
ছুঁতে চায় আকাশের নীল
আকাশে উধাও হতে চায় তার পাখি

সারারাত অন্ধকারে ভিজে যাই বৃষ্টির মতন সারারাত
অন্ধকার , অন্ধকারে শান্ত হয় স্নায়ুশিরা উপশিরা ক্রুদ্ধ মাংসপেশী
কখনো হঠাৎ আরামে বিশ্রামে শিরশিরে স্রোত রক্তে তোলে নাচ
শিরায় পেশীতে হাড়ে খেলে সাপ-খেলানোর-খেলা
মগজ উন্মাদ চীৎকার উত্তেজনা
এক মুহূর্তের নাচ শান্তি ক্লান্তি ক্লেদ ঘৃণা ক্রোধ
শান্ত ঘুম জাগা ভেসে ওঠা ভোর
অঙ্গীকার ছিল শুধু ছ ঘণ্টার অন্ধকারে বিশ্রামের
ছ ঘণ্টার রাতে সব দুরন্ত খেলার
জটিল সূত্রের সমাধানের

সে দারুন কৌতুকে যার হাতে খেলার শাসন
আমাকে ছলক্ষ রাত দিয়ে দিল
ছলক্ষ ঘণ্টায় গাঁথা রাত

ছলক্ষ মাইলের কালো দড়িতে নিষ্ঠুর হাতে বেঁধে দিল
কি যে করি এতো রাত এতো অন্ধকার দিয়ে
এতো তীব্র অন্ধকারে ঘাসহীন বঙহীন জনহীন এতো অন্ধকারে
সুখ নেই শান্তি নেই শুধু ঘৃণা শুধু ক্লেদ বাড়ে, কী যে করি ··
শুধু হাহাকার। এক বিন্দু আলো দাও
এতো আলোহীন আমি বাঁচতে পাবি না সে তো জানো।
তবু খেলা সবি খেলা তার হাতে
যে আমাকে এত অন্ধকাবে ছুঁড়ে
বুদবুদে শবীব দিযে ভাসায় সমুদ্রে লোনা জলে
যে আমাকে বাঁচায় তৃষ্ণায়
প্রচুর উদ্যম, ভালোবাসায় নাচায়
তার হাত থেকে শুধু বদলে নিতে চাই সেই তাস
ছলক্ষ দিনের সাদা তাস
ছলক্ষ অশ্বের রক্ত

সবি খেলা ভালোবাসার খেলায কেটে যায়
ছলক্ষ ঘণ্টার ভালোবাসায সবুজ ডাকে :
আর আমার শরীব নিংড়ে ফুটিয়েছি লাল নীল ·
তোর সব বঙ ফুটিয়েছি নিয়ে যা আঁজলে কেন দ্বিধা

খেলা সবি খেলা
তবু যখন যে হাতে সেই খেলার শাসন
তাকে ছেঁটে দিতে হয় ঘাস, কিছু ঘাসের শবীর
কিছু লাল নীল সাদা ফোটানো যাদুকে শুদ্ধ করে দিতে হয়
কিছু আয়ু
কিছু ভালোবাসা
শুদ্ধ করে কিছু দীর্ঘায়ুর প্রত্যাশায় ছেঁটে দিতে হয়।
এ-ও এক খেলা, খেলার শাসন।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য ॥ শব্দেরা

স্পষ্টত শব্দেরা কারো আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস নয়,
তারা স্বেচ্ছাসুখী। সব আসে যায় যে কোনো সময়
অথবা আসে না। কিম্বা আসে কি আসে না তাই ভেবে,
তুমি বসে আছো কি না সে-কথা ভাবার দাম নেই
এতোদূর স্বেচ্ছাচারী। শব্দেরা নিজের ধরণেই
চলে ফেরে আসে যায়, মরে বাঁচে এবং বাঁচায়,
কেয়ারও করে না, তাকে, কে-বা চায়, কে-ই বা না চায়,
সেই সব অশরীরী প্রাণঘন, ছায়াপাতহীন
অদৃশ্য আলোর কণা ঝলোমলো। অন্ধকারে লীন
নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখে, আকাশে কি রক্তের অতলে
পিতৃপুরুষের স্মৃতি-চেতনায়। সে কথা কে বলে ?
শুধু তারা আসে যায় একাকী অথবা দলে দলে
দীর্ণ করে চেতনাকে। সৌধ পড়ে। লোটায় তোমার
প্রত্যয়ের চূড়াগুলি, সময়ের শ্যামল শাদ্বলে
পড়ে থাকে নাম নেই কঙ্কালের নিহিত অঙ্গার ॥

সুনীথ মজুমদার ॥ সূর্য বিষয়ে দুটি অনুভব

এক

সূর্য নিশ্চিত কোথায়ও রয়েছে
তা না-হ'লে
রক্তচন্দনে ছেটানো আমার
সাদা রেকাবির আকাশ
সূর্যবন্দনার জন্য এই মুহূর্তকে এমনভাবে সাজাতো না—

আমি সূর্যের কাছে দীক্ষিত হব ,
সূর্যস্তব আমার কিশোর বয়স থেকে রক্তে মিশে আছে।

দুই

রোদ্দুরের মতো না পারি, জ্যোৎস্নার মত যেন অন্তত
আঁধার সাম্রাজ্যে মাখনের কমনীয়তা আনি !

সূর্যবন্দনা তাই ভোরে ও রাত্রে ,

ভোরবেলা উদিত সূর্যকে কৃতজ্ঞতা জানাতে,
আর রাত্রিবেলা পরের দিনের সূর্যকে আমন্ত্রণ করতে।

আশিস সান্যাল ॥ তৃষ্ণার ভেতরে

তৃষ্ণার ভেতরে
সারাক্ষণ ডানা নাড়ে
রক্তাক্ত জোনাকি।
চারদিকে
কলমীলতার মতো
পড়ে আছে
গাঢ় অন্ধকার।
বিদ্রূপে আহত করে
অযুত বছর আগে পদ্মার মেঘনার
ধূসর প্রতিম দুঃখ
মৃত সব মানুষের মুখ।
এখনো তারাই সুখী এই পৃথিবীতে
যাদের বুকের মধ্যে অসংখ্য অসুখ
কৃমি-কীট পড়ে আছে।

যাদেব সঙ্কল্পহীন পিচুটি চাহনি
মানবতাহীন আলো
বিরংসা, বিদ্বেষ
কামনায় উল্লসিত।

পড়ে আছে চারদিকে কুটিল কুয়াশা।
নক্ষত্রেব নিবিড় নির্জনে
রক্ত ঝবে অবিরাম।
প্রবল বাতাসে বাজে
বেদনার মতন রঙীন
প্রাগৈতিহাসিক দুঃখ।
ভাবি আর কতোদিন
এভাবে চলতে হবে?
মানুষেব বুক থেকে
সব অন্ধকাব
ঝরে যাবে শব্দহীন?
প্লাবিত স্রোতেব নীলে
বিপন্ন হৃদয়
হবে এক উদ্ভাসিত স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়?

যতদূব প্রতিভাত মানবেতিহাস
শুধুই রক্তিম স্মৃতি—
পড়ে আছে অন্ধকারে
মৃত সব মানুষেব মুখ।
এখনো তাবাই সুখী এই পৃথিবীতে
যাদের বুকের মধ্যে
অসংখ্য অসুখ,
কৃমি-কীট পড়ে আছে।

যাদের বিষন্ন চোখে

অপ্রেমের ঘৃণিত আবেশ
দ্বিধাহীন আন্দোলিত
যাদের নিভৃত স্পর্শ
বিষাক্ত করেছে এই
স্নিগ্ধ পরিবেশ।

সারাক্ষণ ডানা নাড়ে
উড়ে উড়ে অন্ধকারে
রক্তাক্ত জোনাকি ,
সঙ্গতিবিহীন দুঃখে
আমি শুধু নিরুপায়
স্থির হয়ে থাকি ॥

বিজয় কুমার দত্ত ॥ চাবি

দরজা খুলতে এসে দেখি, চাবিটা কোথায়
হারিয়ে গিয়েছে, ওই
পথে কি বিপথে—
তখন সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি,
তখন পড়ন্ত রোদ স্কাইস্ক্রেপারের,
আমার দরজার ভাঙা চৌকাঠের কাছে
খুনী কি পাপীর মত।

এখানে সেখানে যাই, চাবি খুঁজে ফিরি
মাথা ঠুকি বন্ধ দরোজায়।

এভাবেই কাটে দিন
আগাছায় ভরে ওঠে ঘরের চারপাশ
মরচে পড়ে পুরনো তালায়

তাতে কি ধরছে জং ? এইসব বালকসুলভ
জিজ্ঞাসার মুখোমুখী হয়ে
আমি যাই ঘরে ঘরে, যেখানে চাবির সঙ্গে, সব তালা গিয়েছে হারিয়ে,
সেই সব খোলা দরোজায় ।

প্রদীপ মুন্সী ॥ মবণ

টুকটুকে ফুল ভাসলো
নদীতে ঢেউ
নদীব জলে মরণ
ফুল জানে না
ফেনাব আগায় বিষ
ঢেউয়েব গায়ে ধার
নদীব জলে মবণ
ফুল জানে না
জলেব বুকে হিম
হিমের নদী ছুটছে
নদীব জলে মবণ
ফুল জানে না

তুলসী মুখোপাধ্যায় ॥ এখন আমি

কবিতার চরণে আমি ছুটে গেছি দুহাত বাড়িয়ে
তুমি নিরেট গন্ধে কিছু মস্করা করেছ—
দুই হাতে বুক চিরে রক্তজবা অঞ্জলি দিয়েছি
পিত্তল বিগ্রহ তুমি—নীরক্ত হেসেছো ।

এভাবেই দূষিত হোল ফুসফুসের জরুরী বাতাস
এভাবেই নিহত হোল আমার সুন্দর—
ফলত এখন আমি
মৌলিক ধ্যানের আসন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
দিবানিশি গান গাই নিতান্তই লঘু অনুবাদে ॥

রবীন আদক ॥ দীক্ষা

'এখানে শীত মানে দু'ঘর সোজা এক-ঘর উল্টো,
কিংবা দু'ঘর উল্টো এক-ঘর সোজা নয়,
এখানে যাবতীয় উলের গোলা বেফাঁস খুলে যায়—
ব'ঘমুণ্ডি থেকে মাঠাবুরুর জঙ্গলে
বুকের ভিতর হাঁটু এবং হাঁটুর ভিতর মাথা-গোঁজা শীত,
(বেজায়া রা বাংকানা)
পাতা-খসা শাল ও পলাশ
সারা শীতকাল গাজনের সন্ন্যাসীর মতো শীর্ণবাহু দাঁড়িয়ে থাকে।
তবু একদিন হামাগুড়ি দিয়ে মাঘ ঢুকে যায় ফাল্গুনের পেটের মধ্যে
লেলিহান শিমূলের ভিতর চৈত্র।
আগুনের উল্কি-পরা বৈশাখ আসে বনে প্রান্তরে
সারারাত পাহাড়ের গলায় আগুনের চন্দ্রহার,
মাদল বাজে গুরু গুরু। অযোধ্যাপাহাড়।

(আমার দিস্তা সময় সেন তান)
ডিমি ডিমি মাদল বাজে। বুদ্ধপূর্ণিমা।
(স স লেকা গ স ছাবা যান)
এই তো যৌবনের দীক্ষাকাল, মারাংবুরু আশীর্বাদ করুন।
নারীসঙ্গের এই তো সময়, মাঠাবুরু আশীর্বাদ করুন।
মানভূম সিংহভূম হাজারীবাগের হাজার হাজার সাঁওতাল কিশোর

যৌবনে দীক্ষা নেয়, চন্দ্রসাক্ষী।
পিতা পুত্রের হাতে তুলে দেয় কুঠার, জীবনসংগ্রাম।
এখানে জীবন মানে রুদ্র বৈশাখ, বুদ্ধের প্রতিস্পর্দ্ধী।
জীবন মানে মাদল মহুয়া ধনুক ও কুঠার, বুদ্ধপূর্ণিমা।

মাঠাবুরু বাগমুণ্ডি অযোধ্যাপাহাড় দীক্ষান্ত রক্তে ও জ্যোৎস্নায় ভেসে যায়।

দেবী রায় ॥ সহজ হও

ছোট হও, তুমি সহজ আর ছোটো হও
টালমাটাল পায়ে শিশুটিও যেনো তোমার
খুউব সহজে, হাত বাড়িয়ে নাগাল পায়,
পৃথিবীর সব ভালোবাসাই ত'—
সম্ভাবনাময়, উজ্জ্বল এক বাঁচার দিকে যায়।

চেয়ে ছাখো, সবুজ ঐ মাঠের দিকে—
কাস্তে হাতে, সারি সারি কৃষাণ
বাতাসের সাথে গলা মিলিয়ে
সতেজ এক, ঢেউ খেলানো গান গায়।

জমিনের ধান, কি ভাবে যে বুঝেছে তাল
হেলেদুলে সেও, ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে যায়।

খেতের ধানের সুমিষ্ট হাসির কাছে, চিরটাকাল
পৃথিবীর সেরা রূপসীর মোহময়ী হাসিটিও
বুঝি বা ম্লান হয়ে যায়
আর আমি সেই বাতাস কে ও জানি
যে কখনো নূপুর পরে নি পায়…

এর চেয়ে, কি ভাবে আর স্পষ্ট করে বলি
ছোটো হও, তুমি সহজ আর ছোটো হও॥

মঞ্জুভাষ মিত্র ॥ রবীন্দ্রনাথের গানে দুঃখের পাথর

রবীন্দ্রনাথের গানে দুঃখের পাথর ছোট ছোট নুড়ি হয়ে যায়
দেখ সুরের ঝর্ণাটি এই কেমন সুন্দর, দেবতাগণের কাছে যাবে
মর্তকন্যাদের কাছে যাবে। আর দেখ ওইসব মেয়েদের নিজস্ব প্রেমিক
আঁধার মাণিকজ্বলা জানালার পাশে
আকাশকে বুকে নিযে সপ্তাহে দুটি রাত বসে থাকে একা
ধীরে ধীরে গলে যায় তার সব অনুভূতি শব্দচিহ্নিত এক দেবতার মতো
সে নিজে মহৎ এক নদী হয়ে যায়, মনে হয় পৃথিবীর
সকল মেয়ের থেকে একটি মেয়েকে যেন ঈষৎ পৃথক বলে ভেবে নিতে পারে।
দেখ চেয়ে সুরের ঝর্ণাটি এই কেমন সুন্দর। টলমল এ গীতবিতান
পৃথিবীর উদাসীন সন্ন্যাসী এক ধারে এর নগ্ন কমণ্ডলুর বুকে
যেদিন সে সৃষ্টিকর্তা হবে: গানের ভিতর দিযে চেনা এই বিপুল ভুবন
চন্দনমালায় মালায় সেজে উঠবে মর্মকন্যার মত।
ভবিষ্যৎ হে ভবিষ্যৎ তোমার বীভৎস বাঁশী বাজাও এখন
আমাকে বিষণ্ণ করো। রাত্রির রাস্তায় প্রতিবিম্বিত করো
বিভিন্ন পশুদের স্খলিত বিকৃত শবছায়া
আমি আমার দুঃখের ছোট ছোট নুড়িতে ছুঁড়ে দেব গান।

সুতপা মিত্র ॥ সবুজ সংক্রান্তি

তুমি অনেক কিছুই জেনে গেছো।
তুমি জেনে গেছো
সামনে যেটাকে একটা মাঠ বলে মনে হচ্ছে
আসলে সেটা একটা পানাপুকুর
তোমার পদক্ষেপে এখন তাই
সবুজ নেশা নেই

রাত্রির ভয়াবহতায় এখন তুমি
কবিতা খুঁজে পাও না
রণদামামার মধ্যে এখন তুমি
ছন্দ খুঁজে পাও না।

তুমি যত জানছো তত এগুচ্ছো
তুমি যত এগুচ্ছো ততই পিছিয়ে যাচ্ছো।

জয়ন্ত সান্যাল ॥ এক এক দিন

এক এক দিন অন্ধকার আমাকে হাতছানি দেয়,
আমি পাল্‌টা হাত নেড়ে
রোদ্দুরের মতো
অন্ধকারকে দূরে যেতে বলি। কেন না আমি নিশ্চিত জানি
আমার সোনালী সিন্দুক থেকে সেই
পুরনো দুপুর সন্তর্পণে গড়িয়ে পড়েছে সন্ধ্যায়।

আব, এক উত্তপ্ত কুয়াশা বুকে বয়ে
জ্যোৎস্নাব রাতগুলিকে পেরিয়ে
আমি সন্তপ্ত অপরাহ্ণে ভ্রষ্টা হয়ে গেছি।

স্বপন ঘোষাল ॥ দুপুব এখন দুপুব

এখন চারিদিকে সোমত্ত রোদ্দুর
শীতল পরিপাটি সময়,
বেদনার্ত সুখে ঈশ্বরের নিষিদ্ধ ফল।

দুপুর এখন দুপুর তোমায় কোথায় রাখি
শিশুর স্নিগ্ধ মুখে, প্রণয়নীর এলোচুলে
নাকি নিজস্ব করতলে ধরে রাখি
তোমার ভীষণ এই অপরূপ শান্তিতাকে।

ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য ॥ কিছু গোপনতা

ঐ পোড়ো বাড়িটার বাগানে
সযত্নে কিছু গোপনতা রেখেছি,
বহুদিন হল
আমাব সমস্ত পৃথিবী তোমার চাবপাশে
আচ্ছন্ন।
আমার হাত দুটোও ক্রমশ শিথিল,
তবু তুমি মুক্তি দাও নি ॥

প্রভাত মিশ্র ॥ থামো

কাল সারাদিন এত বৃষ্টিপাত হবে, ঝড়, যে কুসুমগুলি
কোরকিত, কে দেবে প্রহবধ্বনি, আমি যাবো
অমবতা ফিরে যাচ্ছে ফেলে রেখে সুখের সিন্দুক
সে কোথায় যাবে, স্বপ্ন তাব শিকারীর তীরে
আনন্দেব সময় এল এবাব ফাল্গুনে, যুধিষ্ঠির
তোমাকে দেখাবে পথ অনেক কুকুব, ওই পথ ভুল
থামো, নষ্ট স্বাতী, এখনও উজ্জ্বল আছে ড্রাগনেব শিং
তুমি থামো, ভূমিতে উত্থিত ধোঁয়া, থামো
বৃষ্টিপাত হবে, তারপর ভূমি চিনে নিও।

নারায়ণ ঘোষ ॥ বুকেব মধ্যে

নিয়ত বুকের মধ্যে কে যেন অথবা কারা ইট ভাঙছে
খোয়া ভাঙছে সতর্ক সতত
কখনো ঘুমের মধ্যে উল্টে যাচ্ছে ল্যাম্পপোষ্ট টেলিগ্রাফ তার

আচম্‌কা উঠছে বেজে সাইরেন   কেঁপে উঠছে
কালো বিড়ালের গোঁফ জ্বলজ্বলে চোখ
সমস্ত দেয়ালগুলো ভেঙে পড়ছে
মাটি খুঁড়ছে কেউ যেন কবরখানায়
শিয়ালকাঁটার ঝোপে বঁইচি গাছের ডালে ফিঙে পাখি
নেচে ওঠে অমেয় আনন্দে
এভাবে অস্থির চোখ ক্রমশঃ আহত হয় সনির্বন্ধ তীরের ফলায়
ফুটপাতে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে থাকে কচি ডাব আমার শৈশব
আমি ইদানীং চলে যাই দূরে ট্রেণের হাতল ধরে যৌবন পেরিয়ে
মুহূর্তে চিলৌনীফুল ভেঙে পড়ে
আমার রোমশ বুকে মাথা রাখে
নিয়ত বুকের মধ্যে কেউ যেন হাতুড়ির ঘায়ে
খোয়া ভাঙছে সতর্ক সতত

দিলীপকুমার সাহা ॥ দুটি কবিতা

১. সমস্ত ফুল ছিঁড়ে নিয়ে গেলে
বাগানকে বড় নগ্ন দেখায়
মানুষের চোখে জল গড়ালে
মানুষকে বড় বিষণ্ণ দেখায়
এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে তুমি ?
এখানে সুখের ম্যাজিক জমবে না হে ।
জহ্লাদেরা ছিঁড়েছে ফুল
শয়তান নেমেছে রণক্ষেত্রে ।

২. তুমি বলেছিলে, 'আমার হাত ধরো
আমি তোমাকে পৌঁছে দেব ওপারে ।'
এতকাল তোমার হাত ধরেই পথ চলেছি নিঃসংশয়ে

এপারে এসে দেখি
কোথায় এলাম ?   এখানে নেমেছে নৈরাশ্য
অমোঘ শূন্যতার ভেতর থেকে
বারংবার ঝল্‌সে উঠ্‌ছে নিষ্ফল তরবারি ।

প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ তাঁবুর বাইরে

সকাল বেলা ঝক্‌ঝকে রোদ,
সারাটা দিন আঁচল আঁচল,
ঢলঢলে চোখ,   রঙিন শাড়ী,
নীলকণ্ঠ পাখীর আশায়
শুধুই আঘাত শুধুই আঘাত,
তাঁবুর বাইরে বিষন্ন ঝড়,
পায়ের নীচে আগুন ।

কঙ্কণ নন্দী ॥ কয়েকটি কবিতা

১   কেলেণ্ডারের পাতা থেকে নেমে আসছে সময়
প্রহরগুলো সকাল-বিকেল দিন ও রাত
সবুজ দেয়াল জুড়ে কেলেণ্ডার ঝুলে আছে
যেন প্রপাত
নেমে যাচ্ছে নদী হ'য়ে সাগর মহাসাগর
কালের গতি
আমি যেনো দেয়াল-থেকে গড়িয়ে-পড়া পাথর
ছন্নমতি

২.   পাখীরা উড়তে চায় ওড়ার প্রতিই যেনো লোভ
আমি গৃহমুখী—একটি টেবিল জুড়ে আমি
এক একটি স্মৃতি ও কল্পনা

পাখীর মতন চায় উড়ে যেতে চায়, যদিও জানে না
ওড়ার পদ্ধতি
ভীষণ মজার শব্দ, শব্দ করে হাসে বারবার
সেই শুধু সামান্য আহার
এটুকু স্বভাব আজো বেঁচে আছে
অথবা এটুকু আমি বেঁচে আছি, যেটুকু স্বভাব
৩. যেটুকু পাথারগুচ্ছ ফুলের মতন ফুটে আছে
যেটুকু জালের মধ্যে যেটুকু প্রত্যক্ষে
রক্তমাংসে স্বপ্নে স্মৃতিতে
সব মিলিয়েই তুমি
বাজছো শিশুর হাতে সারাক্ষণ যেনো ঝুমঝুমি

অতীন্দ্র রায় ॥ পরবাস

ফুলের বিছানা দেখে মনে হল পরবাস
নিকটেই আছে, অবিরাম ধূপ জ্বলে
বিবর্ণ লতার শাখে হাওয়া লাগে, মনে হয়
কথা নয়, কথার বিকল্প কোন ছবি।

পরবাস স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের নিকটে রাখো বীজ
কিছু তার ফোটে, কিছু নিয়ে যায় পাখী
জলস্রোতে ভেসে যায় দীঘল জলের ঢেউ
স্থির হাসে পূর্ণিমার মধুমতী চাঁদ

মলয় ঘোষ ॥ দেবতা প্রেমিক

যে পাহাড়ি গুম্ফায় দাঁড়িয়েছিল
এক নারী
সূর্যাস্তের পাথর ছুঁয়ে সে বলেছিল
"এক দেবশিশুর কথা"

মানস শুশ্রূষার দেবতাকে প্লেট তুলে দিয়েছিল,
পবিত্র ফুল খেতে।
সিঁড়ির নীচ থেকে তা শুনে
লোভী যুবক অন্ধকার থেকে লাফিয়ে সামনে দাঁড়ায়
বলে, আমিই দেব তোমাকে ঐ শিশু।
অনভ্যস্ত যুবক এই নারীকে সাপের মত জড়ায়
এই দেবতার কোন প্রেমিকা ছিল না, তাই আনন্দ
পায় সঙ্গম দেখে।

মায়াঞ্জনা গোস্বামী ॥ শমী বৃক্ষ

চোখ বুঁজলেই দেখতে পাই,—
টক্‌টকে গাছটা জ্বলছে।
খাড়া রোদ্দুরের তলায় দাঁড়িয়ে
সঙ্গীহীন উদ্ধত।
মৃত প্রবালের রং-মাখা পথ খুঁজলে
তখনো তার পায়ের ছাপ পাওয়া যেতো।
বর্ণহীন ঔদাসীন্যে মুখ মেজে
ঐ গাছটার ওপারে এইমাত্র সে চলে গেছে।
সারাটা দিন, তারপর রাত
খাড়া রোদ্দুরে গাছটা জ্বলছে।
স্বপ্ন দেখেছে অনেক দূরের
এক শ্যাওলা ভরা কালো পুকুরের,
অথচ পুকুরটা নেই।
চোখ বুঁজলেই দেখতে পাই
টক্‌টকে গাছটা অনির্বাণ ঔদ্ধত্যে জ্বলছে।

কবিতার ভাবনা (৩)

অরুণ ভট্টাচার্য

আমি পড়তুম বাগবাজারে মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউশন-এ। সে স্কুলে ক্লাশ ফোর থেকে শুরু হ'ত পড়ানো। সুতরাং ক্লাশ থ্রি-র মান পর্যন্ত বাড়িতেই পড়তে হয়েছিল। পড়ায়, বলাই বাহুল্য, মন বসত না। সারা দুপুর বারান্দায় ঘুরে বেড়াতাম, খুব বড় বারান্দা ছিল আমাদের বাসায়—প্রকৃতপক্ষে, কলকাতার ভাড়া বাড়িতে যতদিন বাস করেছি, বেশ লোভনীয় বারান্দা ছিল সবগুলিতেই—যেজন্য আমাদের সিঁথিতে যখন বাড়ি করবার কথা হল আমি দক্ষিণে বেশ বড় বারান্দা রেখেছিলুম—আমার জীবনে, কবিতার সহায় ছিল এই বারান্দা—পরে সে কথায় আসছি বারান্দা কেন আমার জীবনে মস্ত বড় দিক্‌-নির্ণায়ক হয়ে উঠলো। ঐ বাড়ির সামনে সরু গলির মুখ পর্যন্ত গিয়ে, মার্বেল খেলার সঙ্গী সাথি জুটিয়েও সময় কাটতো না—বেলা এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত অফুরন্ত সময়। ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ একদিন বড়দা, ৺কুসুমকুমার ভট্টাচার্য, হাতে করে নিয়ে এলেন একটি অবাক-করা বই। কভার ছিলো রংবেরং-এর, আর নানারকম চিত্র। বইটির নাম আবোল তাবোল, লেখক সুকুমার রায়।

এমন বই তার আগে হাতে পড়ে নি। কী যে জাদু ছিল বইটাতে। আমাদের বাড়িতে তখন জ্যাঠতুতো, পিসতুতো ভাইবোন মিলে সংখ্যায় অনেক ছিলুম। বড়দের মধ্যে বড়দা, তিনি সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে দুর্গা পিতুরি লেন-এ মর্ডান আর্ট প্রেসে কাজ করতেন, মেজদা কলেজে, বাদবাকী ভাই বোনেরা স্কুলে। আমি এবং আমার ঠিক ছোট জ্যেঠতুতো বোন তখনো বাড়িতেই, স্কুলে ভর্তি হই নি। বাইরের জগৎ বলতে শ্যামবাজার, বাগবাজারের রাস্তাঘাট, দেশবন্ধু পার্ক, গঙ্গা, একবার বুঝি

গিয়েছিলুম সে-বয়েসে মামার বাড়ি রংপুর। এর বাইরে কোন জগৎ ছিল না আমার। অন্তত সে বয়েসে।

বইটি নিয়ে মুহূর্তে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। যারা যারা স্কুল-কলেজে যেতো তারাই সকাল বিকেল বইটি আটকে রাখতো। আর আমি পেতুম দুপুরে। বিশেষ করে, মনে আছে, একবার জলবসন্ত হয়েছিল। মশারীর মধ্যে সময় আর কাটে না, কিছুতেই সূর্য গড়ায় না বিকেলে। দুপুর যে কী অসহনীয় মশারির মধ্যে সে কথা একমাত্র ভুক্তভোগীই জানেন। জলবসন্তের বালক রোগী সারা দুপুর মশারির ভেতরকার জগতে বাস করলে কী এক আকুল কান্না, ঘন গভীর অন্ধকার আতঙ্ক জমে ওঠে, অনেক পরে, এ যন্ত্রণার একটি ছবি এঁকেছিলুম :

মশারির ভেতর তোমার আপন জগৎ।
চারিদিক অন্ধকার করে ঘুম আসে
একলা ঘরে তুমি চমকে চমকে ওঠো,
সেই দামামা শোনো।

মাঝে মাঝে আতঙ্কে তোমার
বুক কেঁপে ওঠে
আমি অদূরে, তোমার জানালার দিকে, তাকাই
পশ্চিমদিগন্তে। দামামার শব্দের তালে তালে
রাঙা মেঘের ঢেউগুলি মেলাই।

(সময় অসময়ের কবিতা)

সেই সময়, মশারীর ভেতর সুকুমার রায়কে আপন করে, নিজের করে পেতুম। আবোল তাবোল নামটিই যথেষ্ট—এই নামটিই আমাদের মন হরণ করেছিল মনে পড়ে। সুকুমার রায়ের সমগ্র রচনার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। লেখবার সময় সেই আবোল তাবোল আর নেই, হাতের কাছে রয়েছে "সমগ্র শিশু সাহিত্য"—যে প্রকাশক এটি প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রকাশনা-বোধকে প্রশংসা করতে পারছি নে। সমগ্র বইটি আটোসাটো বাঁধুনিতে এত ছোট লাইনো টাইপে ছাপলে প্রত্যেকটি শিশুর অন্তত মাইনাস চার চশমা লাগবে ছ মাস বাদে। বিজ্ঞজনেরা

জেনেশুনে এমন অস্বাস্থ্যকর একটি কাজ করলেন কেন ভাবতে অবাক লাগছে। কী জানি, এইটেই বোধহয় বই বাজারের ধরণ—কত তাড়াতাড়ি বই এর সংস্করণ শেষ করা যায় বিজ্ঞাপনের সাহায্যে। বইটি দামে কিছু সস্তা এবিষয়ে সন্দেহ নেই—কিন্তু মাত্র দশ টাকায় কিনে যে চল্লিশ টাকা চশমা পড়তে হবে শিশুদের, এটা কি সুধী প্রকাশকরা ভাবেন নি। কেনই বা তাঁরা ভাববেন, চশমা তো কিনে দেবে শিশুদের বাবা মা। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা ডাক্তারবাবুদের মতে, এমনিতেই malnutrition এ ভোগে এবং চোখের ডাক্তারবাবুদের মত, মাওপিয়ার কারণ শতকরা ৯০ ভাগ তাই। এরও পরে ঠাসবুনুনি ক্ষুদ্রতম লাইনো ফেস্ এ কোন শিশু এই সমগ্র শিশু-সাহিত্যটি পড়লে চোখের ডাক্তারবাবুর কাছে যেতেই হবে। যাক্ গে। আমারই বা মাথাব্যথা কেন।

সুকুমার রায়ের বইটি নতুন করে পড়বার আনন্দ আমারও স্তিমিত হয়ে আসছে এই টাইপ দেখে। তবু সেই শিশুকালের স্মৃতিকে ধরে রাখবার জন্যই আবার এর পাতা ওলটাচ্ছি। সত্যজিৎ বাবু তাঁর পিতৃ-দেবের গ্রন্থের ভূমিকায় দুটি উল্লেখযোগ্য খবর দিয়েছেন। আর কেউ জানতেন কি না জানি না, আমি অন্তত জানতুম না। একটি হচ্ছে ননসেন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। সত্যজিৎ বাবু লিখছেন 'সুকুমার সাহিত্যের মূল ধারাটি কোনদিকে প্রবাহিত হবে তার ইঙ্গিত ক্লাবের নামকরণেই রয়েছে'। এ থেকে মনে হয়, যদিও সত্যজিৎ বাবু স্পষ্ট করে লেখেন নি, ক্লাবের নামটিও সুকুমার রায়ের দেওয়া। দ্বিতীয় খবর হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ যখন গীতাঞ্জলি নিয়ে ইংলণ্ডে যান তখন সুকুমার রায় ইংরেজীতে "The spirit of Rabindranath" নামে একটি স্বরচিত প্রবন্ধ কোয়েষ্ট সোসাইটির একটি অধিবেশনে পাঠ করেন। আর মণ্ডে ক্লাব (সুকুমার রায়ের ভাষায় মণ্ডা সম্মেলন) এর অধিবেশন উপলক্ষ্যে সত্যজিৎবাবু যে কবিতাটি উদ্ধার করেছেন তার জন্যও বাংলাদেশের পাঠক কবি-পুত্রের কাছে ঋণী থাকবে। প্রথম পংক্তিটি অনবদ্য .

সম্পাদক বেয়াকুফ কোথা যে দিয়েছে ডুব

সুকুমার রায়ের কাব্যপ্রতিভাব অপূর্ব নিদর্শন মেলে এই একটি মাত্র পংক্তিতেই। কবিতায় কৌতুকপ্রিয়তা, ব্যঙ্গ, ঠাট্টা, নির্মল হাসি ইত্যাদি সবই পাওয়া যাবে প্রচুব, কিন্তু সব ছাপিয়ে তাঁব কাব্যে যা ধবা দিয়েছে, আব যেখানে তাঁব কোন জুডি নেই, অন্তত বাংলা সাহিত্যে, তা হচ্ছে নিতান্ত absurd কে কাব্য সাহিত্যেব মূল বসে সঞ্জীবিত করাব অপূর্ব কৌশল। হাসজারু বা বকচ্ছপ একমাত্র সুকুমার বাযই সৃষ্টি কবে গিয়েছেন তাঁব প্রথম গ্রন্থেব নামই তাঁব সমগ্র কাব্যগ্রন্থেব ভূমিকা, অর্থাৎ আবোল তাবোল —আমাব মনে হয তাই absurd কথাটির আশ্চয বাংলা প্রতিশব্দ। সত্যজিৎ বাবু এ কবিতাকে 'nonsense' ভার্স বলেছেন, আমি তা বলি না, এ কবিতা আশ্চর্য 'sense' এর কবিতা—এবসার্ড কে যা রিযাল-এ কত অনায়াসে রূপান্তবিত করতে পারে—কোনভাবেই তা 'nonsense' verse এর পর্যাে বোধহয় পডে ন।

আজকাল যে কোন কবিই কযেকদিন কবিতা লিখেই বই বাব করেন, অনেকের নানা সুযোগে প্রকাশক জুটে যায আব সুকুমাব বায়েব প্রথম বই সম্বন্ধে, সত্যজিৎ বাবু জানাচ্ছেন, 'কোন বচনাই তাঁব জীবদ্দশায় পূর্ণাঙ্গ পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হয নি। আবোলতাবোল (আমি শব্দ দুটিকে একটি শব্দে পবিণত কবাব পক্ষপাতী) প্রথম প্রকাশেব তাবিখ ১৯ সেপ্টেম্বব ১৯২৩, অর্থাৎ সুকুমাবেব মৃত্যুব ঠিক নয দিন পরে'।

আবোলতাবোল এব মত গ্রন্থও যে কবিব জীবদ্দশায বেবোয় নি এটা আজকের দিনে মনে হবে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। এ থেকে অনেকগুলি বিষয় বিশ্লেষণ কবে জানা যায প্রথমেই মনে হয়, এ কবি কবিতা লিখতেন সম্পূর্ণ নিজেবই আনন্দে, 'সন্দেশ' পত্রিকায় বেরুতো, দুদশজন বসিক শ্রোতা সে কবিতা পডতেন, তাঁদেব ভালো লাগতো—সেই আনন্দই ছিল কবির পুরস্কাব। এখানকাব মত সর্বগ্রাসী সাহিত্য সাপ্তাহিক তৎকালে ছিল না, কোন কবি বা পাঠক তাব প্রযোজনও অনুভব করেন নি। সত্যকার শিল্প সবসময়েই গুটিকয় রুচিবান লোকের জন্য, জনসাধারণের জন্য নয়। জন-সাধাবণেব জন্য জনপ্রিয গল্প উপন্যাস, জনসাধাবণেব জন্য খবরেব কাগজী সাহিত্য। দুচাবজন রুচিবান লোক যথন কোন সাহিত্যকে স্বীকৃতি দেন,

জনগন তখন সঙ্গে সঙ্গে তাল ঠুকে বলে, এইতো সাহিত্য। জনগণের রুচি এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে তেমন পরিশীলিত নয়। তাই সেই বিদেশী লেখকের কথা মনে পড়ে যিনি একরকম বলেছিলেন, 'আমার ডাইনিং টেবিলে গুটি কয় রুচিবান লোক থাকবেন, নিরিবিলি পরিবেশে অনতি-উজ্জ্বল আলোকে আমরা আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে ডিনার শেষ করবো'। এই ডিনার সকলের জন্য নয়।

দ্বিতীয় কথা হল সাধারণভাবেই কবিদের এই প্রচার-বিমুখতা। অথচ আজকের দিনে প্রচারমুখীনতাই শিল্প সাহিত্যের পক্ষে বেশি জরুরি। শুধু নবীন বা তরুণ সাহিত্যিকই নন, অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের অনেকেই তাঁদের লেখার সময়ের চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেন সাহিত্যের public relations এর কাজে। অর্থাৎ বড় বড় দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক বা মালিক এবং নামজাদা প্রকাশকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনেই অনেকের বেশি সময় ব্যয় হয়। লেখার সময় তিনি বিশেষ পান না। সত্যি তো, লিখে কি হবে যদি না সেটা বড় বড় পত্রিকায় ছাপা যায়, বড় বড় প্রকাশকদের বাড়ি থেকে বইটি বের না হয়। সত্যি, আমাকেও তাই ভাবতে হচ্ছে, লিখে লাভ কি। আজকালকার বাইশ বছরের লেখকও এই তত্ত্বে আস্থাবান। নগদ বিদায় অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার। কবে কোন্ যুগে আমাদের কাব্য লোকে পড়বে সে কথা ভেবে তো আমার আজকের দিন কাটবে না। সুকুমার রায়ের মত আগেকার দিনের কবিরা নিছকই বোকা ছিলেন, 'নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী' ছিল তাদের কাব্যচর্চার আদর্শ। ধুর ধুর, অমন বোকামিও মানুষ করে। মাঝে মাঝে কাগজে দেখি, এমন কবিকে নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে, সম্বর্দ্ধনার ঘটা হচ্ছে যাঁর কবিতা, আমার মত সম্পাদকের অন্তত, আমাদের কাগজে ছাপতে অসুবিধে হয়, মনে হয়, আরো কিছুদিন লেখা উচিত একটি পরিচ্ছন্ন পত্রিকায় ছাপতে দেবার আগে। এখনকার বেশ কিছু কবিদের দেখি, কথায় বার্তায় চালে চলনে, আগের-দিনের-কবিরা-কিছুই-লেখেন-নি-এমন-একটি ভাব। অর্থাৎ তাঁরাই লিখছেন প্রকৃত কবিতা। রবীন্দ্রনাথ তো আউটডেটেড্। জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তী বিষ্ণু দে করুণার পাত্র, এই আর কী!

বিষ্ণু দ ও বাতিল হতেন, তবে কি না একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের বেশ কিছু সমঝদার তাঁর সঙ্গে সবসময়ে আছেন। তাঁর বরাত ভালো।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সুকুমার রায়দের কবিতা লেখার সাধনা বিস্ময়কর। কবিতাগুলির জন্য কী যত্ন ছিল কবির! প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার illustration কবির নিজ হাতে আঁকা। আবোলতাবোল কবিতাটির একটি সাইন বোর্ড সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে টাঙানো হচ্ছে, সেই আবোল-তাবোল কবিতাটিতেই কবি absurd তত্ত্বের বর্ণনা দিচ্ছেন

আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাবহীন।
আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল
মাত্‌বি মাতাল রঙ্গেতে—
আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে॥

কবি নিজেই মনে হয় absurd এর সংজ্ঞা দিচ্ছেন তাঁর কাব্যগ্রন্থের 'কৈফিয়ৎ' হিসেবে "যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।"

আবোলতাবোল এর অন্তর্গত কবিতাগুলির কোন্ কবিতাটির কথা বলব। সে বয়েসে (এই বয়েসেও) যে কবিতাটিই পড়তাম আমরা সব একান্নবর্তী সংসারের গুটি দশেক ভাই-বোন হেসে গড়াগড়ি যেতুম। সেই মজা এখনো উপভোগ করি, নিঃশব্দে। ভাবি, যে-রসিকের স্থান বাংলা সাহিত্যে পূরণ হবার নয়, যিনি বাংলা কবিতার দিগন্তকে পৃথিবীর দিগন্তে টেনে নিয়ে গিয়েছেন (এমনি আর একজন লেখক পরশুরাম, রাজশেখর বসু, যাঁর কজ্জলী, গড্ডলিকা, হনুমানের স্বপ্ন বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ— দুর্ভাগ্য, এই সাহিত্য বাংলায় লেখা হয়েছে—তাই তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান নি, আমি তো জানি না, অন্তত ইংরেজী বা আমেরিকান সাহিত্যে এই বই-এর জুড়ি আছে কিনা) তাকে সেকালের লোক কতটুকু সম্মান

দিয়েছেন। এখন তাঁর বই ব্যবসার সামগ্রী, কিন্তু ব্যবসার সামগ্রী হবার পঞ্চাশ বছর আগেই, তা বিশ্বসাহিত্যের মানদণ্ডে পাঠকের কাছে রসের সামগ্রী ছিল, তখন তা ব্যবসায় পর্যবসিত হয় নি।

'খিচুড়ি' কবিতাটির উল্লেখ করেছেন সত্যজিৎ বাবু তাঁর ভূমিকায় 'উদ্ভট সন্ধির নিয়মেই সৃষ্টি হল বকচ্ছপ, মোরগরু, গিরগিটিয়া, সিংহরিণ, হাতিমি'। অবশ্য কবিতাটির মধ্যে সন্ধি হয়েছে তিনটি, হাঁসজারু, বকচ্ছপ এবং হাতিমি। বাকি সন্ধিগুলি, যা সত্যজিৎ বাবু উল্লেখ করেছেন, কবিতার মধ্যে নেই, ছবিগুলি দেখলে সেটা আন্দাজ করে নেওয়া যায়। মোরগরু, গিরগিটিয়া এবং সিংহরিণ অঙ্কনগুলি দেখে বুঝে নিতে হয়, পাঠকের কোন কষ্ট হয় না। ছাগল এবং বিছা, জিরাফ এবং ফড়িং অনায়াসে তুলির টানে মিলে গেছে, কবি সুকুমার রায় আর শিল্পী সুকুমার রায় এক হয়ে গেছেন, একাত্ম হয়ে গেছেন। পৃথক করে তাঁদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

আমার কবি-বন্ধু শোভন সোম, যিনি ছবিও আঁকেন এবং ছবি বিষয়ে অধ্যাপনা করেন, একটি ছবির প্রদর্শনী [রাজ্য সংগীত নাটক একাদমী সম্পাদক স্নেহভাজন অসীম ঘোষ ও তাঁর সহকর্মীগণ কেন্দ্রীয় একাদমী ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে] দেখতে দেখতে আমার বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন ক'দিন আগে। আমরা ক'জন মিলে ছবি দেখছিলুম, সঙ্গে ছিলেন চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক হরেকৃষ্ণ বাগ ও মিউজিয়মের নির্মল দে, যিনি অবসর সময়ে ভালো এস্রাজ বাজান, রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে, আমি বলছিলুম, ছবি ও গান, কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে ধরা পড়ে অনেক সময়েই। আমি যদিও technically ছবি বুঝি নে, গান হয়তো কিছুটা বুঝি, তবু মনে হয় মহৎ শিল্প বোঝাবুঝির ব্যাপার ততটা নয়, যতটা intuitive, পরিশীলিত ও রসজ্ঞ দর্শক বা শ্রোতা নিজের আন্দাজে ছবি ও গান বুঝে নেন—কোন্ রাস্তায় রস বিছানো আছে তিনি ঠিকই বুঝতে পারেন। সেই সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই আমার মনে হয়েছে ছবি ও গান দুটিই কাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে যেমন হতে পারে আরও হাজার রকমের ব্যাপার স্যাপার—তাদের স্ব স্ব

পরিধির অনেকটাই কবিতার পরিধিতে overlapping হয়ে ধরা পড়ে। প্রকৃত কবি তাঁর সেই সহজাত intuitive জ্ঞান দ্বারা কতটুকু নিতে হবে, কতটুকু পরিত্যাগ করতে হবে বুঝে নেন। শোভনের বক্তব্য, ছবি তো বটেই, গানের জগৎও কবিতার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, বিষয়বস্তু আলাদা। আমার মনে হয় এখানে কলেজী শিক্ষা কোন কাজে আসে না, যেমন কাজে আসে না ছান্দসিকদের লেখা ছন্দের বই কোন সৎকবির কবিতা লেখবার সময়। কবির কাছে কবিতার ছন্দের কান তৈরী হয়ে যায় আপনা থেকেই। শিল্পীর কাছে রঙের সামান্যতম পার্থক্যও সেই নিয়মেই ধরা পড়ে।

সুকুমার রায়ের ছবিগুলি সত্যি সত্যি গরু আর মোরগের mechanical mixture নয়, একেবারে chemical compound—তাদের সহজে পৃথক করা যায় না, যেমন বকচ্ছপ—মনে হয় বকও নয়, বচ্ছপও নয়, একটি তৃতীয় প্রাণী যার নাম 'চলন্তিকা'য় নেই—রাজশেখর বসুর মত পণ্ডিত ব্যক্তিও যার নাম জানতেন না এবং অভিধানে সংযোজন করতে পারেন নি। সুকুমার রায়ের ব্যক্তিগত অভিধানে এমন অনেক শব্দ পাওয়া যাবে, জয়েস্ সাহেব যেমন তাঁর উপন্যাসে এমন অনেক নতুন নতুন শব্দ আমদানি করেছেন। আমাদের বন্ধু গৌরকিশোর ঘোষের এমন সহজাত প্রতিভা আছে শব্দ তৈরীর। মনে পড়ছে বনফুলের, একটি বিরাট উপন্যাসে, একটি চরিত্র বহু অসাধারণ শব্দ আবিষ্কার করেছিল—meaningless nonsense যার ব্যাপ্তি কিন্তু রসের জোয়ারে আমাদের মনের দুকূল ছাপিয়ে গিয়েছিল। তাই ছবিই হোক গানই হোক, বা অন্য যাই হোক, কোন্ third sense দিয়ে কবির কাছে কোন্ dimension এ ধরা পড়ে, কবিতার লাইনে ছবির line drawing মিশে যায়, চট্ করে সে-বিষয়ে রায় দেওয়া যায় না।

কেন না, এখানে শব্দের সূক্ষ্মতম ব্যঞ্জনার পার্থক্য শিল্পীর তুলিতে রঙ ব্যবহারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যের মতই। এমনি একদিন অনুভব করেছিলুম রঙের পার্থক্য আমার অফিস ঘরের টেবিলে বসে। সেটা বর্ষার ঠিক আগে। শ্রদ্ধেয় শিল্পী গোপাল ঘোষ আমার অফিস ঘরে প্রায়ই আসতেন। আমার ঘরটি থেকে গঙ্গা অবধি দেখা যেত পশ্চিমে, যেমন দেখতুম অস্ত

সূর্য—রক্ত রাঙা হয়ে ডুবছে, তেমনি দেখতুম ঝড় উঠেছে গঙ্গাবক্ষে—হুড়মুড় করে অফিস ঘরের কাঁচের জানলায় দাপাদাপি শুরু করেছে। ময়দানের দূরপ্রান্তে গাছগাছালির সার পুরনো কেল্লা অবধি দেখা যেত। একদিন অবিষ্কার করলুম হঠাৎ, এক সবুজের কত রঙ। যে গাছের দিকেই তাকাই মনে হ'ল রঙ তো সবুজ, কিন্তু এই সবুজ তো নয়। মনে পড়লো রঙের জাদুশিল্পী গোপাল ঘোষের কথা। আর অনেকদিন তিনি এলেন না। ফলে যা তাকে মুখে মুখে বলতে চেয়েছিলুম, লিখে ফেললুম কাগজ কলম নিয়ে

গাছের পাতায় এক সবুজের কত রঙ দেখতে পাও, সুরেশ,
এক সবুজের কত রঙ
তোমার তুলিতে আঁকতে পারো।
আঁকতে পারো টিয়া রঙ, আঁকতে পারো কলাপাতার
নিমের জামরুলের জামের পাতার
ধানের শীষের।
সুরেশ, সব কিছু রহস্যের চাবিকাঠি তোমার হাতের
তুলিতে, একথা যদি ভেবে থাকো
বড় ভয়ঙ্কর ভুল।
এত বিচিত্র সবুজের সমারোহ, সবুজের সবুজের
টিয়ার হরিতকীর,
শুধু তিনি জানেন। শুধু তিনি।
যিনি তোমার তুলিতে আছেন, এই মুহূর্তে চিরকালীন।

কবিতাটি নিয়ে গোপাল ঘোষ মশাইর উচ্ছ্বাস মনে পড়লে আজও লজ্জা পাই। ওঁর মেয়ের বিবাহে গিয়েছি নিউ আলিপুরে। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন, কাছে ছিলেন শিল্পরসিক শ্রীদ্বিজেন মৈত্র। তাঁকে বললেন 'ছাখো, যে কবিতা আমাদের লেখা উচিত ছিলো, অরুণ বাবু লিখেছেন। আপনি যে এমন রঙের জহুরি তা তো জানতুম না'। আমি লজ্জা পেলুম। বললুম, 'দীর্ঘ দীর্ঘ বছর আগে যাদুঘরের পুরনো একাদমী হলে আপনার ফুলের ছবির প্রদর্শনী দেখেছিলুম, সেই থেকে খানিকটা রঙ এর ধারণা

হয়েছে—তবে, কবিতাটি শুধু আন্দাজে লেখা'। গোপাল বাবু বললেন 'আরে মশাই, সব কিছুই তো ওই আন্দাজে হয়'। বলে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন খাবার টেবিলে।

কবিতাটি কবিতা হিসেবে কতখানি উৎরেছে জানি না, তবে শোভন যা বললেন আমার মনে হয়, এই কবিতাটি থেকে তিনি তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে আমার বক্তব্যের পার্থক্য বুঝতে পারবেন। এই কবিতাটি অক্ষরে লেখা হলেও বস্তুত শিল্পীর রঙ ব্যবহারের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রসঙ্গ। এখানে নিশ্চিতভাবে ছবির উপাদান শুধু নয়, ছবির জগৎও ধরা পড়েছে কবিতার আধারে। যাকৃগে।

সুকুমার রায়ের ব্যাপার আরও গভীরের। তার কবিতা মানেই ছবি, ছবি মানেই কবিতা—একটি আর একটির পরিপূরক—আবোলতাবোলের কোন্ কবিতাটি ফেলে কোন্ কবিতাটির কথা বলবো। সবগুলিই আমার কাছে আজো সমান আকর্ষণীয়। বড় বাবুর গোঁফ চুরি কবিতাটি এবং চেয়ার থেকে আচম্কা 'আঁৎকে উঠে হাত পা ছুড়ে চোখটি করে গোল' বড়বাবুর গোঁফ হারানোর সংবাদ ছবিতে ধরে রাখার মধ্যে যে পারস্পরিক ব্যঞ্জনা তা কবিতা ও ছবিকে এক করে রেখেছে। বুড়ির বাড়ী বা খুড়োর কল—ছবি দুটি দেখলে কবিতা পড়ার দরকার হয় না, অথবা আগেই বলেছি, রামগরুড়ের ছানা কবিতাটির পাশে রামগরুড়ের ব্যাজার মুখের ছবি কী আশ্চর্য সাজেসটিভ্। 'আহ্লাদী' কবিতাটি খুব জুৎসই নয়, কিন্তু তিনটি আহ্লাদীর ছবি কাব্যের দুর্বলতাটুকু ঢেকে দিয়েছে। 'আশ্চর্য আইন' এর ছবি যেন 'still life'—সত্যিই আশ্চর্য। কবিতাটিও অসাধারণ।

সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যে একজনই জন্মেছেন, ইংরেজী বা আমেরিকান সাহিত্য—যা আমার প্রত্যক্ষ কিছু জানা আছে—সেখানেও সম্ভবত তাঁর জুড়ি যখন তখন মিলবে না। সুকুমার রায় তাই আমাদের গর্ব। সত্যজিৎ বাবু শুধু পিতৃঋণ খানিকটা শোধ করেন নি, গ্রন্থের ছোট্ট অথচ অতি মূল্যবান ভূমিকা লিখে জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন।

হাইকু কবিতা

বা শো (১৬৪৪-৯৪)

১ ঠিক বুদ্ধের জন্মদিনে

ঠিক বুদ্ধের জন্মদিনে,
কচি হরিণের জন্ম ঃ
কি রোমাঞ্চকব ।

২. মন্দিরের প্রাচীর

মন্দিরের প্রাচীর ঃ
না খোঁজা, না দেখা—
বুদ্ধের ছবিটা ঢুকেছে নির্বাণে ।

৩ বুদ্ধের মৃত্যুদিবস

বুদ্ধের নির্বাণ দিবস ,
কুঞ্চিত ত্বক্—মোড়া আঙুল থেকে
জপমালার শব্দ ।

৪. এসো এসো

এসো এসো
আসল ফুলেব সমাবেশে
এই দুঃখভবা জীবনটা ।

৫. হাতে যদি ধরি

হাতে যদি ধবি,
গরম আঁখিজলে যাবে গলে,
শরৎ-তুষারের মত ।

৬. আসছে শরৎ

মন শুধু ধায় আমার
ছোট্ট ঘরের পানে ।

মূল জাপানী থেকে অনুবাদ : **সন্দীপ ঠাকুর**

ইংরেজী অনুবাদে বাংলা কবিতা

এ বুক অফ্ বেঙ্গলি ভার্স: টেনথ্ টু টোয়েনটিয়েথ সেনচুরি: কমপাইলড এ্যাণ্ড এডিটেড বাই নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ইণ্ডিয়ান্ পাবলিকেশনস্। কলকাতা। বেঙ্গলী পোয়েমস্ অন ক্যালকাটা: শুভরঞ্জন দাসগুপ্ত এ্যাণ্ড সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, রাইটার্স ওয়ার্কশপ। কলকাতা।

অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দীতে এ দেশ যখন হিন্দু প্রাধান্যের শিখরে, তখন রাজত্ব পালবংশের। সভ্যতা আর সংস্কৃতি, ঐশ্বর্য্য আর বৈভব তাদের এনে দেয় সাংস্কৃতিক সম্ভ্রম। এই পাল-শাসিত সাম্রাজ্যের অন্যতম অবদান হ'ল প্রথম এবং নিশ্চিতভাবে বাঙ্লা ভাষার প্রতিষ্ঠা। ধর্মপালের রাজত্বকালে বাঙ্লাভাষা (Proto Bengali) জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়। সিদ্ধাচার্য বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় এই ভাষাকে বাহন করে রচনা করেন চর্যাপদ যার সঙ্কলিত রূপটির নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। ভাষাবিদেরা বলেন চর্যাগীতির ভাষাই প্রাচীনতম বাংলা ভাষা, তবে উত্তর ভারতে প্রচলিত শৌরসেনী ও মাগধী অপভ্রংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেই থেকেই বাংলা শুরু। আজ বাঙ্লা কবিতার বয়স এখন হাজার বছর।

আলোচ্য গ্রন্থটি এই হাজার বছরের বাংলা কবিতার অনূদিত সঙ্কলন। সম্পাদক এবং সঙ্কলক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত-র আত্যন্তিক অভিনিবেশ সঙ্কলনটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে স্থাপনা করতে পেরেছে। কাহ্নপাদ থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য, এই বিস্তীর্ণ কাব্যক্ষেত্রকে একটি সূত্রে বেঁধে তার ভাষান্তরিত রূপকে আন্তর্জাতিক পাঠক গোষ্ঠীর সামনে নিবেদন করার প্রয়াস বোধকরি সর্বপ্রথম।

রাজনীতি আর সামাজিক বিবর্তনের পাশাপাশি সাহিত্যও রূপ বদল

করে, ধরা পড়ে সময়ের তাৎক্ষণিক প্রভাব। প্রাক্ তুর্কী যুগে প্রথম বাংলা কবিতা লেখা শুরু হয়। পালশাসিত যুগে রাজনীতি ছিল স্থিতধী, শান্ত, সমাজ-আত্মস্থ। বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত শাসক, তাই লেখা হ'ল আধ্যাত্মিকতা-পুষ্ট প্রতীকী চযাগীতি। পরবর্তী যুগে জয়দেব বা উমাপতি ধরের কাব্যে সেই ছবি স্পষ্ট। পরে প্রায় দেড়শ বছর ধরে নানা সামাজিক বিপর্যয়. আর্য অনার্য সাংস্কৃতিক সংঘাত, হিন্দু-বৌদ্ধ বিদ্বেষ, তুর্কী ধর্মোন্মাদনা, মুসলমান সাম্রাজ্যের নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা এবং স্বাভাবিক স্থিতি। শুরু হ'ল ভাবের আদান-প্রদান, আর্য-অনার্য মিলন, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে এযাবৎ প্রকটিত শ্রেণী-বৈষম্যও প্রায় লুপ্ত। বাঙালী হিন্দু সমাজে এক ঐতিহাসিক নবচেতনার সঞ্চার হ'ল। সমস্ত দেশ আলোড়িত করে সাংস্কৃতিক পুনরভ্যুত্থান বা কালচারাল রেনেশাঁস্ শুরু হ'ল। এই উজ্জীবিত সংস্কৃতির বিগ্রহ হলেন শ্রীচৈতন্য দেব, সবকিছু তাঁকে ঘিরে আবর্তিত। প্রাক্-চৈতন্য, চৈতন্য আর চৈতন্যোত্তর যুগে লেখা হ'ল লৌকিক দেব দেবীর মাহাত্ম্যসূচক মঙ্গলকাব্য পৌরাণিক সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ পদাবলী, জীবনীকাব্য। আর্কাইক বা প্রাচীন ভাবধারার সংগে নব্য পাশ্চাত্ত্য চিন্তার এক অবশ্যম্ভাবী সংঘাত বিক্ষিপ্ত করল সমাজ মানস, কবিতার মনন এবার নানা উপলখণ্ডে বাধা পেয়ে পাল্টে গেল। এই শতাব্দীতে দুটি উপর্যুপরি বিশ্বযুদ্ধ এল বড় ভয়ঙ্কর রূপে। এল আধুনিক যুগ যা আজও বহু খণ্ড অখণ্ড পাথর পেরিয়ে নিজস্ব উপত্যকা খুঁজে নিতে ব্যস্ত।

এই বিচিত্র হাজার বছরে কবিতার চরিত্রও বিভিন্ন। খুব স্বাভাবিক এই চরিত্র পরিবর্তন, সে কথা বলেছি। সহজিয়া গুহ্য তত্ত্বের ভাষা তার অধ্যাত্মিকতা থেকে সরাসরি বদল করে লৌকিক কাব্যের বর্ণনায়। বিষয় সাঙ্কেতিক আধ্যাত্মিকতা থেকে সরাসরি নেমে এলো সরল দেবমাহাত্ম্য-কাহিনীতে। তারপর মননধর্মী জীবনীকাব্যে, সেখানে ভাষা নিরলংকার, প্রাক্ চৈতন্য আদিরস পরিণত হ'ল শরীর সংস্রবহীন নিষ্কাম প্রেমে বৈষ্ণব-গীতি কবিতায়। সেখানে অন্বিষ্ট অধ্যাত্মমহান্ প্রেম। বিদ্যাপতি চণ্ডী-দাসের পদ বাংলা ভাষাকে এক মোহন কাব্য রূপ দিল (বিদ্যাপতি মৈথিল পদকার ছিলেন—কিন্তু সমকালীন বাংলা ও মৈথিলী ভাষার অপূর্ব সাদৃশ্য

থাকায় তাঁর রচনা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেয়েছে)। এইভাবে বয়সের ক্রমিক উত্তরণে কবিতার ভাষা, শব্দ, তার মনন চেহারা বদল করে ক্রমশ শক্তিশালী হয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে নিয়ে এলেন শিক্ষিত মনন। প্রতিটি যুগই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে নেয়, বিষয়বস্তুর ওলট্ পালট্ হয়।

আলোচ্য সঙ্কলনে উপরোক্ত আলোচনার প্রায় সবটাই ধরা পড়ে। তাই সঙ্কলক ধন্যবাদার্হ। শ্রীসেনগুপ্ত সূচীপত্রে কবিদের পাশাপাশি সময়-পরম্পরায় নিখুঁতভাবে সংক্ষেপে একটি কালনির্ঘণ্ট তৈরী করে পাঠকদের উপকৃত করেছেন। এছাড়া সমস্ত যুগের প্রতিনিধি-স্থানীয় কবিদের নিপুণ নির্বাচন চমৎকৃত করে। তবে রামমোহন রায়ের অন্তর্ভুক্তি কেন বুঝি না। তিনি কখনোই প্রথম শ্রেণীর কাব্য-রচয়িতা ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথকে এই সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত না করার পেছনে যে যুক্তি মুখবন্ধে পড়ি তা অকাট্য মনে হয় না। যেখানে রবীন্দ্র-পর্বকে তিনভাগে ভাগ করে তাঁর সমকালীন, পরবর্তীকালীন এবং উত্তরকালীন কবিদের স্থান রয়েছে সেখানে আসল মানুষটি উহ্য কেন? রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের নির্বাচনেও সে অর্থে তেমন ব্যাপক নয়। সাম্প্রতিক কালে এমন কিছু কবি আছেন যাঁরা বাংলা কবিতার এই গ্রন্থে নিজের স্থান করে নেওয়ার দাবী রাখেন।

কাব্যের তাৎপর্য যেহেতু পুরোপুরি শব্দনির্ভর এবং শব্দের উপর লক্ষ্য না রাখলে অর্থোপলব্ধি অসম্ভব, ভাবগত এবং ভাষাগত অনুবাদ সে কারণে অসাধ্য। যে কোন কবিতারই ভাব বিশ্লেষণ অসম্ভব অথচ ভাষান্তরিত করার প্রচেষ্টায় বিশ্লেষণ অনিবার্য। তাছাড়া ভাষার নিজস্ব প্রকৃতিকে ভাষান্তরে ফুটিয়ে তোলা দুরূহ। যেখানে শব্দবিশেষের আভিধানিক অর্থের চেয়ে তার ধ্বনি-মাধুর্য, ভাবানুষঙ্গ এবং ব্যঞ্জনা অর্থাৎ অর্থের দ্যোতনা এবং প্রতীকতাই মুখ্য, সেখানে অনুবাদক অসহায়। এক্ষেত্রে এ গ্রন্থে শ্রীসেনগুপ্ত অনেকাংশে সার্থক। বেশ কিছু কবিতায় (অনেক কবিতাই শ্রীসেনগুপ্ত-র করা অনুবাদ নয়) মূল ভাবটি সহজেই উপলব্ধ। বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য এবং প্রাক্-রবীন্দ্রযুগের কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে মনোগ্রাহী। শ্রীসেনগুপ্ত-র নিজস্বকৃত আধুনিক কবিদের কবিতার অনুবাদগুলিও

সহজেই আমাদের কবিতার কাছাকাছি নিয়ে যায়। মূলের ছন্দ এবং ভাষাগত বিন্যাস সর্বত্র তেমন শৈলীতে স্থাপিত না হলেও, কবিতাটি কি বলতে চায় তা বোধগম্য। এই সঙ্কলনের পরিকল্পনা এবং সঙ্কলক ও সম্পাদক শ্রীসেনগুপ্ত-র বিশাল ব্যাপক ক্ষেত্রকে জুড়ে বাংলা কবিতাকে একত্র করার প্রয়াস প্রশংসার্হ। পাণ্ডিত্যে এবং কবিমনের মননে সমৃদ্ধ একটি সুচিন্তিত মুখবন্ধ যে কোন বাংলাকবিতা অজ্ঞ পাঠককেও শেষ পৃষ্ঠাটি অবধি পড়তে উদ্বুদ্ধ করবে। অনুবাদ দুরূহ কাজ, কবিতার অনুবাদ দুরূহতর। সেক্ষেত্রে কবিদের স্ব স্ব ভাবনার কথাগুলি যে শ্রীসেনগুপ্ত ইংরেজী পাঠকদের পরিবেশন করেছেন এজন্য বাঙ্গালীমাত্রই কৃতজ্ঞ।

রূপচাঁদ পক্ষী একদা লিখেছিলেন, কলকাতা স্বর্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সৌন্দর্য্যে বৈকুণ্ঠও তার কাছে ম্লান। তারপর ঈশ্বর গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ থেকে আজকের কবি সুব্রত চক্রবর্তী পর্য্যন্ত ক'লকাতাকে দেখলেন নানা আঙ্গিকে। কেউ অভিভূত, কেউ দুঃখিত তাদের প্রিয় শহরকে নিয়ে। যুগে যুগে শহরের রূপ পাল্টেছে, দেহসৌষ্ঠব বদলেছে, ক্রমশঃ সুন্দরী হয়েছে সে। আবার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক চেহারার পরিবর্তনের সংগে শহরের মানস হয়েছে জটিল থেকে জটিলতর, সেখানে কবি মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যায় আগ্রহী। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি ক'লকাতা বিষয়ক এই সব কবিতার একটি অনূদিত সংকলন।

যে ধরণের ত্যাগ, পরিশ্রম ও পরবশ্যতা অনুবাদকের পক্ষে আবশ্যিক তা এই সংকলনে অনুপস্থিত। যা বৈদেশিক, যা সহজাত নয় তা নিয়ে কোন উদ্যমে এক বিদগ্ধ নিষ্ঠার প্রয়োজন। ইংরেজী ভাষা আমরা যতই ভাল জানি না কেন তার কাব্যিক ধ্বনিস্পন্দনের রহস্য আমাদের পক্ষে স্বভাবতই অনধিগম্য, অন্ততঃ দুষ্প্রবেশ্য। এডোয়ার্ড টম্‌সন্‌-কে লেখা ১৯২১-এর দু'টি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের মত কবিরও সরল স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়—'আমার অনুবাদে আমি ভীরুর মত সব সমস্যা এড়িয়ে গিয়েছিলুম, ফলতঃ সেগুলো শীর্ণ হ'য়ে গেছে .... আমি আমার নিজের টাকা নিয়ে জালিয়াতি শুরু করেছিলুম, তখন সেটা ছিল খেলার মতন, কিন্তু এখন তার বিপুল পরিমাণ দেখে আমি শঙ্কিত হ'য়ে পড়ছি।' ইয়েট্‌স্‌ বলেছিলেন,

'কোন ভারতীয়ই ইংরেজী জানে না। যে ভাষা শৈশবে শেখা হয় নি, আর যা আবাল্য চিন্তার ভাষা নয়, তাতে রীতিসমন্বিত ধ্বনি মধুরভাবে রচনা করা অসম্ভব।' (দি লেটার্স অফ ডব্লিউ বি ইয়েট্‌স্‌, পৃঃ ৮৩৪)। কথাটি পুরোপুরি স্বীকার্য না হলেও আংশিক তো বটেই। কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ সঠিক হওয়ার প্রয়োজন তা বলছি না, কিন্তু সংকলকদের দাবী অনুযায়ী এই গ্রন্থে মূল কবিতার অনুসৃষ্টিও দেখি না। সুবিধা অনুযায়ী যখন তখন আক্ষরিক অনুবাদ আছে, যার প্রত্যাশিত ফলাফল কবিতাটির শরীরপাত, আবার কোথাও, হয়তো আক্ষরিকে অসমর্থ বলেই ভাবানুবাদ বা অনুসৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ (মূলকে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছিন্ন করেও এই পৈশাচিক কাণ্ড ঘটেছে)। গীতাঞ্জলি' সর্ব্বজন-স্বীকৃত হয়েছিল মূলানুগ অনুবাদের জন্য নয়, বুদ্ধিদীপ্ত অনুসৃষ্টির জন্য। সেখানে কবিতার নবজন্ম হয়, ফুলগুলি ভিন্‌দেশের জমিতে নতুন হ'য়ে ফোটে।

সংকলনের অনেক কবিতাই পুরোপুরি কলকাতা-বিষয়ক নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দর্শনে কিছু কবিতা লিখিত, কলকাতা সেখানে অনুষঙ্গ বা প্রসঙ্গ হিসেবে এসে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতাটিই ধরা যাক্‌। শিক্ষিত পাঠকমাত্রেই জানেন 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত এই কবিতাটির মনন অন্যতর এক অর্থে বিধৃত। আনুষঙ্গিক 'শিয়ালদা ইষ্টিশন' এবং যে কোন ষ্টেশনের মতই 'এঞ্জিনের ধস্‌ ধস্‌, বাঁশির আওয়াজ, যাত্রীর ব্যস্ততা, কুলি হাঁকাহাঁকি' স্বভাবতঃই এসে পড়ে। এই সংকলনে 'হঠাৎ দেখা' কবিতাটির অন্তর্ভুক্তি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে সন্দিহান করে। মুখবন্ধে উল্লেখ সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হচ্ছি রবীন্দ্রনাথের 'একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু' কবিতাটির মূলের বিকৃতি না ঘটিয়েই অনুসৃষ্টি করা যেত। কবিতাটিতে ক'লকাতার একটি পূর্ণ ছবি ধরা পড়ে। ক'লকাতাকে কেন্দ্র ক'রে নয়, নেহাৎই অনুষঙ্গ ক'রে এমন অনেক কবিতার দৃষ্টান্ত আছে যার উল্লেখ এই সমালোচনাকে দীর্ঘতর করে।

বিচিত্র মুদ্রণ প্রমাদ মূল কবিতার শব্দ ও ধ্বনির প্রতি উদাসীনতা, শব্দচয়নে ছেলেমানুষী ব্যর্থতা সমস্তক্ষণ মনকে বিরিক্ত রাখে। সুধীন্দ্রনাথ, অরুণ ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর সেন, মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শ্রেষ্ঠ এবং বয়স্ক

কবিদের কবিতার অনুবাদে এবং মুদ্রণে পূর্ণমনস্কতার প্রয়োজন ছিল। অবাক্ হয়ে দেখি অরুণ ভট্টাচার্যের 'কলকাতা, ১৯৭১' কবিতাটি নির্ভুল ভাবে 'ক'লকাতা, ১৮৭১' মুদ্রিত হয়েছে। কবিতাটি প'ড়ে বিদেশীরা ওই একশো বছর আগের ক'লকাতাকে খুঁজবেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে ভুল যেমন সংশোধিত হয়েছে এক্ষেত্রেও হওয়া উচিৎ ছিল। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'তোমাকে, ক'লকাতা' কবিতাটির অনুবাদ হাস্যকর। অনুবাদ নয়, অনুসৃষ্টিই যাঁদের প্রচেষ্টা এবং যার প্রতীকী জাফরানী পাখি প্রথম পাতাতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটি সেই প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম নয় কি ?

মূল : বুকের মধ্যে খাঁ খাঁ করছে প্রচণ্ড পিপাসা
অথচ কলঘরে
জল পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায় ফোঁটায়।

অনুবাদ A terrible thirst burns in the breast,
Yet in the bathroom
Water is falling drop by drop by drop

এটা কি নেহাৎ ছেলেমানুষের মত আক্ষরিক অনুবাদ নয় ?

অন্যত্র,

Going is for coming, coming is for coming প্রায় অসহ্য।

আমার তো মনে হয়, দশম শ্রেণীর ছাত্ররাও এমন অনুবাদে লজ্জা পাবেন। অনুসৃষ্টি শব্দটিতো বিস্মৃত হয়েছি। উপরি-উক্ত অনুবাদটি কি আক্ষরিকও হয়েছে ? 'বিষন্ন কলঘর' 'sad bathroom' কেন বুঝলাম না। ভয় করছে বলতে, 'dismal' বা 'gloomy' শব্দটি অনেক বেশী অর্থবহ হ'ত। সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের 'ইহুদী মেনুহিনকে অনুরোধ' কবিতাটির দু'তিনটি শব্দ উদাসীনভাবে অনূদিত কবিতায় উধাও।

মূল ওর ভ্রান্ত আঙুলগুলি ধ'রে কে থামাবে। ইহুদী
মেনুহিন আপনি কি একবার পার্ক স্ট্রীটে'র এই পানশালায়
এসে ব'লে যাবেন যে বাখ্-এর 'ডাবল্ কনসার্টো'
কখনই 'ই মেজরে' বাজানো উচিৎ নয়।

অনুবাদ : Who will restrain and chain
his misled fingers ! Yehudi Menuhin,
will you come just once and advise
that Bach's Double Concerto should
never be played in E Major

এখানে রহস্যজনকভাবে 'পার্কষ্ট্রীটের এই পানশালায়' শব্দকটি নেই। এই কবিতাটিরই অন্য একটি স্তবকের অনুবাদ সমালোচকের দুর্বল মনে হয়, অর্থ যেখানে পুরোপুরি মূল-গ্রাহ্য হয় নি। 'মিশুক রক্তের সংগে নেশা' এই লাইনটির অনুবাদ কিছুতেই 'Intoxication comes with congenial blood' হ'তে পারে না। 'মিশুক' এই শব্দ এবং ধ্বনিতে যে অর্থ লুকিয়ে আছে, অনুবাদে তার সম্পূর্ণ না হোক্ আংশিক প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার।

কালিদাসকে ছন্দ থেকে বিশ্লিষ্ট অবস্থায় কল্পনা করা যেমন সহজ নয় তেমনি অনূদিত ধ্বনিহীন, ছন্দহীন, ইমেজারিহীন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে-কে সহ্য করা যায় না। পদ্য ছন্দের বিস্তীর্ণ ভূমিতে তাঁদের কি দুর্জয় ঈশিত্ব। তাঁদের পূর্ণমনস্ক কবিতায় অমোঘ শব্দসমাবেশ ঘটে তার অবির্ভাব আমাদের স্নায়ুতে এনে দেয় সাত সাগরের দোলানি, আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের শব্দবোধের ভেতর প্রবেশ করে। কেবলই একটা রূপকল্প বা উচ্চমার্গীয় কল্পনা নয়, এনে দেয় ধ্বনি-সঞ্জাত সম্মোহন। এই সংকলনে বিষ্ণু-দে-র 'চৌরঙ্গি' কবিতাটি পড়তে পড়তে ওই কথাগুলো মনে হয়। মূল কবিতায় যখন ঝন্ ঝন্ করে বাজে :

এ ঘন প্রহরে
ইশারা বিছায় পথে কোন্ ধ্রুবতারা।
উদ্ভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে যারা
নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে।

তখন দুর্বলরেখ, ক্ষীণ, স্বাস্থ্যহীন অনুবাদ বলে :

In this dense hour
What pole star spreads hints on the roads !

Distraught and alien minds are lost with wandering
Through the city, huge and indifferent, without a flutter.

কিম্বা 'স্নায়ুতে অরণ্যভীত আদিম ক্রন্দন'এর মত রহস্যময় দুরন্ত শব্দ সমাবেশের পাশাপাশি যখন দেখি : 'In the nerves forest-fearing primeval cries ell up' তখন অনুবাদকের ব্যর্থতা প্রকট হয়। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, 'ধ্বনি যেহেতু কখনই অর্থের প্রতিধ্বনি হ'তে পারে না, এবং ভিন্ন ভাষাতেও যে কোন রূপকল্পের অনুকরণ সম্ভব, তাই কোন অনুবাদ কবিতায় মূলের ছন্দ ও ধ্বনিসম্পদের আভাস পর্যন্ত না থাকলে তা অনুবাদ হিসেবে গ্রাহ্য হ'লেও অসম্পূর্ণ'। কবিতার আঙ্গিকের অনটন উপেক্ষা করলেও, ধ্বনিপ্রসূত উত্তেজনার অভাব যখন মূল শব্দকে জখম করে তখন দুঃখ হয়।

সাধারণভাবে বলা যায় যে এই সংকলনের অনেক রচনাই মূলের অনুকৃতি নয়, বিকৃতি কিম্বা এমনভাবে তরলিত যার অসারতা বুঝতে বাঙলা পর্যন্ত জানার দরকার হয় না। কিছু কবিতা অবশ্য কবিদের স্ব-কৃত অনুবাদ, সেগুলি মন্তব্যের ঊর্দ্ধে। ডেস্‌মণ্ড ডয়েগ্‌ আর পরিতোষ সেনের অসাধারণ স্কেচ মনকে খুশি করে। কবিতার বিষয়বস্তুকে অনুষঙ্গ ক'রে এইসব স্কেচ্‌ নিঃসন্দেহে বিদেশী পাঠকের প্রশংসা কুড়োবে। বইটির প্রচ্ছদ এবং বাঁধাইতে চমক আছে। কিন্তু মুসলমানী বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকৃতি এড়িয়েও বাঙালীয়ানা দিয়ে সাজানো যেত।

সর্বশেষে বলি, অনুবাদকরা দাবী করেছেন 'transcreation' এর। যাঁদের নিজস্ব কবি-পরিচিতি এখনো স্বীকৃতির অপেক্ষায়, তাঁদের কাছে অন্তত অমিয় চক্রবর্ত্তী বা বিষ্ণু দের, জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথের কবিতার transcreation-এর দাবী যথেষ্ট হাস্যকর নয় কি? অন্তত বুদ্ধিমান বাঙ্গালী কাব্যরসিকের কাছে।

অনুপ মতিলাল

ঐতিহাসিক বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ সংগীত

বিষ্ণুপুর সংগীতের ক্ষেত্রে বাংলা তথা ভারতবর্ষে একটি নবযুগের প্রবর্তন করে একদা স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মল্লরাজ পৃথ্বিমল্লের রাজত্ব-কালকে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরের সংগীতের উষাকাল হিসাবে ধরা যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৪শ শতাব্দী থেকে ১৬শ শতাব্দীর ইতিহাসে তখনকার সংগীতের কোন রূপ ইতিহাস বা গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। তবে ১৬শ শতাব্দীর তৎকালীন মহারাজা বীর হাম্বীরের কয়েকটি পদ পাওয়া যায় এবং ঐ পদগুলি কীর্তনের পদ। অতএব অনুমান করা যেতে পারে যে ঐ সময়ে বিষ্ণুপুরে কীর্তন গান প্রচলিত ছিল। বীর হাম্বীরের পদ ভাব ও ভাষার দিক দিয়ে সুললিত—অবশ্য তাঁর পদগুলিতে রাগ বা তালের কোনও উল্লেখ নাই। মহারাজা হাম্বীরের একটি পদ উদ্ধার করা গেল

"প্রভু মোর শ্রীনিবাস পুরাইলে মোর আশ
তুয়া পদে কি বলিব মোর।
আছিনু বিষয় কীট বড়ই লাগিত মিঠ
ঘুচাইলে রাজ অহঙ্কার॥
এ বীর হাম্বীর হিয়া ব্রজপুর সদ ধেয়া
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে॥" ইত্যাদি

মহারাজ হাম্বীর বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংগীতকে বেশ কিছু পদাবলী রচনা করে সমৃদ্ধশালী করেছেন। তিনি বিষ্ণুপুরকে দ্বিতীয় বৃন্দাবনে পরিণত করার মানসে পুষ্করিণীর নাম দিয়েছিলেন শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কালিন্দী, যমুনা এবং গ্রামের নাম দিয়েছিলেন মথুরা, দ্বারকা, অযোধ্যা প্রভৃতি। তাঁর সময়েই পদাবলী রস সাহিত্য, কীর্তন গান ও বৈষ্ণব প্রেমের বন্যায় সারা বাংলাদেশ ভেসে গিয়েছিল।

দরবারী সংগীতের ক্ষেত্রে রাগ সংগীতের অনুশীলনের যে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে সেটি হচ্ছে মহারাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহদেবের রাজত্বকালে। সবচেয়ে মুস্কিল হচ্ছে বিষ্ণুপুরের রাজাদের রাজত্বকালের নির্দ্দিষ্ট সময় বা কাল নিরূপণ করা। রাজত্ব স্বার কারণে অনেক সময় তাঁরা রাজত্বকালের সময়কে ইচ্ছানুরূপ সাজিয়ে নিয়েছেন—ফলে ইতিহাস তার কালগত সত্যকে কিঞ্চিৎ বিকৃত করলেও বস্তুগত সত্যটুকুকে আজও তার বুকে বহন করে চলেছে।

তবে ১৭শ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দিল্লী থেকে তানসেনের পুত্রবংশীয় (বিলাস খাঁ-এর) ওস্তাদ ধ্রুপদী বাহাদুর খাঁ সাহেব ও তৎকালীন বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক পীরবক্সকে বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসে মহারাজা রঘুনাথ বিষ্ণুপুরকে দ্বিতীয় দিল্লীতে পরিণত করেছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এ সম্বন্ধে কুচিয়াকোলের রাজাবাহাদুরের সংগীত-গুরু ও সভা-গায়ক সংগীত-নায়ক রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রামাণিক দলিল "সঙ্গীত মঞ্জরী" থেকে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ-রচিত সাহানা রাগে চৌতালে নিবদ্ধ মহারাজা রঘুনাথের গুণবর্ণনার বিখ্যাত ধ্রুপদটি পাঠকদের অবগতির জন্য তুলে ধরছি

"সব গুণ নিধান মহারাজ রঘুনাথ
তু-অ দরবার শাযত শোহাবে॥
অনেক গুণীজন চহুঁ চকসে আয়ে
ঔর সব অযাচক পদ পাবে॥

এই গানটি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরের খ্যাতিমান পণ্ডিত শিল্পী ওস্তাদ রামপ্রসন্ন বলেছেন, তাঁর পিতা মহারাজা রামকৃষ্ণদেবের সভাগায়ক সংগীত-কেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত পুস্তক থেকে উদ্ধৃত।

বাহাদুর খাঁ সাহেব বিষ্ণুপুরে না এলে রাগ সংগীতের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুর কোনও দিনই বাংলাদেশের মধ্যে ধ্রুপদ সংগীতের পীঠস্থান হিসাবে তার স্বাক্ষর রাখতে পারতো না। কারণ যদিও ১৬শ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরে সংগীতের চর্চ্চা ছিল কিন্তু সে সংগীত উচ্চাঙ্গ সংগীতের নয়—সে সংগীত

কেবলমাত্র অন্ত্যজ শ্রেণীর নিম্নমানের সংগীত ছিল, ঝুমুর, খেউড় জাতীয় —পরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের আগমনে বীর হাম্বীরের সময়ে কীর্তন গান একটু উচ্চ শ্রেণীতে পড়ে কিন্তু রাগ সংগীতের চর্চ্চার কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ দেবের রাজত্বকালকেই আমরা বিষ্ণুপুর রাজ্যের দরবারী সংগীতের ক্ষেত্রে আদি ও প্রথম হিসাবে ধরতে পারি এবং নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ-ই বিষ্ণুপুরী সংগীতের আদি গুরু।

ঐ সময়েই আচার্য্য বাহাদুর খাঁ সাহেবের নিকট গান শিখলেন গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সাধকগণ এবং রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য গুরুর যোগ্য উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হলেন এবং তাঁকেই বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রথম সংগীতগুরু হিসাবে ধরা হচ্ছে। তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে যদু ভট্ট, অনন্তলাল ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের রচিত বহু ধ্রুপদ গান পাওয়া গেছে এবং ঐ সমস্ত বিখ্যাত ধ্রুপদগুলির অধিকাংশই বাংলা ভাষাতে লেখা।

তাঁর পরে সংগীত-কেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরের গুরুর আসন অলংকৃত করেন। তিনি মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহদেব প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুর ঘরানার আবাসিক বিদ্যালয়টির প্রথম আচার্য্যের আসন অলংকৃত করেন এবং ঐ বিদ্যালয়টি বাংলার মধ্যে প্রথম ও ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয়। অনন্তলালের শিষ্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও তাঁর চার কৃতী পুত্র রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর, সুরেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ অল্পবয়সে ধরাধাম ত্যাগ করে যান যদিও ঐ বয়সেই তিনি সংগীতে বেশ কৃতবিদ্য হয়ে উঠেছিলেন।

বিষ্ণুপুর ঘরানাকে যিনি প্রথম যশের স্বর্ণমুকুট পরালেন সেই মহা মনীষীটি হচ্ছেন যদু ভট্ট। সারা ভারতবর্ষ তিনি ঘুরেছিলেন এবং তাঁর অপূর্ব্ব সুরজাল তৎকালীন সমস্ত ওস্তাদগণকে মুগ্ধ করেছিল।

জব চার্ণকের কলকাতা মহানগরীতেও যদু ভট্টের গানই তখনকার সঙ্গীত সমাজে ও প্রতিটি সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তির ঘরে ঘরে মুখরিত হোত। তার জলন্ত স্বাক্ষর যদু ভট্টের মন্ত্রশিষ্য ও উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তিনি যদু ভট্টের গানে এতখানি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে তাঁর রচিত ধ্রুপদের

অনুসরণ করে সুর ও তালের ব্যবহার করে বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ সংগীতকে রাজাসন দান করেন। যদু ভট্টের প্রতিভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বালককালে যদু ভট্টকে জানতাম। তিনি ওস্তাদ জাতের চেয়েও ছিলেন অনেক বড়ো। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা। ওস্তাদ ছাঁচে ঢেলে তৈরী হতে পারে, যদু ভট্ট বিধাতার স্বহস্ত-রচিত।"

তারপর গুরুদেব গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধিকা গোস্বামী বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ সংগীতকে দিক হতে দিগন্তরে প্রসারিত করে যশের স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। রাধিকা গোস্বামী সম্বন্ধে কবিগুরু বলেছেন—"রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগরাগিণীর রূপ জ্ঞান ছিল তা নয়—তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রস সঞ্চার করতে পারতেন, সেটা ছিল ওস্তাদের চেয়ে কিছু বেশী।"

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র ওস্তাদশিল্পী হিসাবে নয়, হিন্দুস্থানী সংগীতের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ক'রে ভারতীয় সংগীতের প্রচার ও প্রসার করে যে দান রেখে গেছেন আজ তার বিচারের সময় এসে গেছে। তাঁর মত পণ্ডিত-শিল্পী ভারতবর্ষে খুব কমই জন্মেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষত বাংলা দেশের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে তাঁর গ্রন্থ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বিষ্ণুপুরের সংগীত বিদ্যালয়টিকে মহাবিদ্যালয়ে পরিণত করাও তাঁর একটি বিখ্যাত কীর্তি। কণ্ঠ সংগীত ছাড়াও সকল রকমের যন্ত্রসংগীতেও তাঁর দখল ছিল, সেইজন্য তিনিও তাঁর অগ্রজের মতো সংগীত-নায়ক উপাধি পেয়েছিলেন। সেতার ও সুরবাহারেও তাঁর হাত ছিল অনবদ্য। তাঁর সেতারের রেকর্ড আজও কানের ভিতর দিয়ে মরমে গিয়ে পশে। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকেও তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর দেশবাসী দীর্ঘদিন শুনেছে। বর্দ্ধমান রাজদরবারে তিনি বহুকাল সভাগায়ক ছিলেন। কলকাতার মোহ ত্যাগ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই মনীষী দেশবাসীর শিক্ষাকল্পে নিজ জন্মভূমিতে ফিরে আসেন এবং রামশরণ সংগীত মহা-বিদ্যালয়ে প্রথম অধ্যক্ষের আসন অলংকৃত করে আমরণ শিক্ষা দান করে যে মহা উপকার সাধন করেছেন দেশবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে আজও তা স্মরণ করে।

বিভিন্ন রাজদরবার থেকে তাঁকে নানা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কবিগুরুর সুরে সুর মিলিয়ে তাঁর সম্বন্ধে একটি কথাই আমি শুধু বলবো, তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।

"হিন্দুস্থানী গান শিক্ষা দিবার প্রয়োজন বোধ করি।
.. . অবিষ্কার করা গেল বাংলাদেশে একমাত্র হিন্দুস্থানী গানের ওস্তাদ আছেন শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর আর যাঁরা আছেন তারা কেউ তাঁর সমকক্ষ নন এবং অনেকে তাঁরই আত্মীয়।"

বর্ত্তমান বৎসরেই হচ্ছে গুরুদেব গোপেশ্বরের জন্মশতবার্ষিকী—দেশবাসীর কাছে আমার আবেদন, বাংলাদেশে তাঁর এই শুভ জন্মশত-বার্ষিকীর পরমলগ্নে বিষ্ণুপুরে তাঁর পবিত্র নামে যাতে একটি সংগীতের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয় সে সম্বন্ধে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হোক। রবীন্দ্রভারতীর অনুরূপে নায়ক গোপেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হোক গোপেশ্বরের জন্মভূমিতে—মজে-যাওয়া একটি সুপ্রাচীন ধ্রুপদী সংগীতের পাদ-প্রদীপের নীচে।

সংগীতনায়ক রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিষ্ণুপুরী সংগীতের একজন কীর্তিমান দিকপাল। কুচিয়াকোল ও নাড়াজোল রাজবাটীতে তিনি বহুদিন সভাগায়কের পদ অলংকৃত করেন এবং বহু শিষ্য তৈরী করে বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতকে গৌরবান্বিত করেন। কুচিয়াকোল রাজবাটীতে তিনি প্রায় বার বছরেরও বেশী অবস্থান করেন এবং ঐ সময়ে তিনি সেখানে তাঁর বিখ্যাত 'মৃদঙ্গ দর্পণ' গ্রন্থটি রচনা করেন। 'সঙ্গীত মঞ্জরী' গ্রন্থটিও তিনি রচনা করেন এবং এই গ্রন্থ দুটি বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রামাণিক দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য। কুচিয়াকোল-রাজ বসন্তকুমার গুরুকে বনগেলিয়া মৌজা প্রায় একশত বিঘা জমি সহ শ্রদ্ধা সহকারে দান করেন এবং কুচিয়াকোল রাজদরবার থেকে তাঁকে "সংগীতনায়ক" উপাধিতে ভূষিত করেন। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও "সুররাজ" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ন্যাসতরঙ্গ যন্ত্রটি রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার। তিনি এই যন্ত্রটি তাঁর দুই অনুজ, গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথকে শিক্ষা দিয়ে যান। গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথ রামপ্রসন্নের নিকট দীর্ঘদিন

ধ্রুপদ সংগীতের তালিম নেন। সংগীত-রত্নাকর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে সমান পারদর্শী ছিলেন। কবিগুরুর বহু গানের স্বরলিপি করাও এঁর এক বিরাট কীর্ত্তি। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের কিছু গ্রন্থ রচনা করে বিষ্ণুপুরী সংগীতের মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইনিও যশ খ্যাতি ও অর্থের প্রলোভন ত্যাগ করে দেশবাসীর শিক্ষাকল্পে নিজ অগ্রজের পাশে পাশে থেকে বিষ্ণুপুরে সংগীতশিক্ষা দান করেন।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পর এই পরমসংগীতগুণী রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের আসন অলংকৃত করেন। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান সংগীতরত্নাকর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরী সংগীতকে দেশে ও বিদেশে, সারা ইউরোপে প্রচার করে চরমতম সম্মানে ভূষিত করেন। খেয়াল গানে শ্রদ্ধেয় অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান আজও দেশবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। সুকণ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী খেয়াল ও বাংলা রাগপ্রধান গানে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী হিসাবে বিরাজমান। বিষ্ণুপুর ঘরানাকে যাঁরা সমৃদ্ধশালী করেছেন এবং করে চলেছেন তাঁদের কিছু নামের তালিকা দেওয়া হোল

সংগীতাচার্য্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র বন্দ্যোঃ ৺ভূপেশচন্দ্র বন্দ্যোঃ, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোঃ (বটুবাবু), অশেষচন্দ্র বন্দ্যোঃ, নরেশচন্দ্র বন্দ্যোঃ, গণেশচন্দ্র বন্দ্যোঃ, ৺নিত্যানন্দ গোস্বামী, ৺সুবোধ নন্দী, গৌরহরি কবিরাজ, সংগীত শিক্ষক দুর্গাপ্রসাদ গোস্বামী, অমিয়কুমার বন্দ্যোঃ, গোকুলচন্দ্র নাগ, গৌরী দেবী, পরেশ চক্রবর্ত্তী, হংসেশ্বর চট্টোঃ, নীলমণি সিংহ, চন্দ্রমোহন সিংহ, অনাদি দত্ত, মণিলাল নাগ ও অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য।

দেবব্রত সিংহঠাকুর

সাম্প্রতিক প্রকাশন

[উত্তরসূরি-দপ্তরে বেশ কিছু বই জমেছে, সমালোচনার জন্য। ক্রমশ সেই বইগুলির আলোচনা প্রকাশিত হবে। ইতিমধ্যে কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হ'ল। স উত্তরসূরি]

প্রবন্ধ

সুধীন্দ্রনাথ নিরঞ্জন হালদার (সম্পাদনা) ॥ রামায়ণী প্রকাশ ভবন, কলিকাতা ৯ ॥ সুধীন্দ্রনাথের কাব্য, সাহিত্যচিন্তা, জীবনদর্শন বিষয়ে প্রবন্ধ সংকলন। লেখকদের মধ্যে আছেন বুদ্ধদেব বসু, ফাদার ফাঁলো, এলেন রায়, অরুণকুমার সরকার, শামসুর রাহমান, অরুণ ভট্টাচার্য, জগন্নাথ চক্রবর্তী, আলোক সরকার, অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, নবনীতা দেব সেন।

সাহিত্যবিবেক বিমল মুখোপাধ্যায় ॥ গ্রন্থমেলা, কলিকাতা ৭ ॥ সহিত্যচর্চা ও সাহিত্য অন্বেষণের মূল সূত্রগুলি, যা পাঠককে আনন্দের দরজায় পৌঁছে দেবে, বিবৃত হয়েছে এই গবেষণা-ধর্মী গ্রন্থে।

কবিতা

জীবনানন্দ দাশ সুদর্শনা ॥ সাহিত্য সদন, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২ ॥ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় এযাবৎ কিছু অপ্রকাশিত কবিতার সংকলন করেছেন শরৎচন্দ্র-গবেষক গোপালচন্দ্র রায়।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শীত-বসন্তের গল্প ॥ যুবকণ্ঠ প্রকাশনী, কলিকাতা ৯ ॥ কবিতাগুলির বেশির ভাগই বিশিষ্ট বাঙালীদের উৎসর্গীকৃত, মানুষের মনুষ্যত্বের কবিতা। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শেষতম কাব্যগ্রন্থ।

অসীম রায় · আমি হাঁটছি ॥ অধুনা, কলিকাতা ১২। ১৯৫০-৭১ পর্যন্ত রচিত কবিতার কবি কর্তৃক সম্পাদিত সংকলন।

আনন্দ বাগচী · উজ্জ্বল ছুরির নীচে ॥ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা ৯ ॥ কবির সর্বাধুনিক কাব্যসংকলন।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ কেবল দেখেছে শিয়রলতা ॥ ভারবি, কলিকাতা ১২ ॥

উত্তরসূরি রজত জয়ন্তী বর্ষ
একটি ঘোষণা

কফি হাউস কলেজ ষ্ট্রীটে তরুণ সাহিত্যিকরা নিয়মিত যান। আমরাও তরুণ বয়সে যেতাম। সাহিত্যের, রাজনীতির গল্প হ'ত। নতুন কবিতাটি লেখা হলেই বন্ধুবান্ধবকে পড়ে শোনান হত।

উত্তরসূরির জন্য কফি হাউসের কাছাকাছি আমরা এমন একটি আড্ডার জায়গা ভাবছিলাম অনেকদিন থেকে। সম্প্রতি দি বুক হাউস এবং সচ্চিদানন্দ প্রকাশনী আমাদের সে ইচ্ছা পূরণ করেছেন। কফি হাউসে ঢুকতেই ডান দিকে দি বুক হাউস। কবি শিল্পী সবাই কফি হাউসে ঢোকবার আগে একবার চলে আসুন উত্তরসূরির আড্ডায়। প্রতি বুধ বার।

উত্তরসূরির দ্বিতীয় সম্পাদকীয় দপ্তরের ঠিকানা :

প্রযত্নে দি বুক হাউস, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, একতলা,
কলকাতা ৭০০ ০১২

FORM IV

1 Place of Publication — 9B/8 K C Ghosh Road
Calcutta 700050

2. Periodicity of its Publication — Quarterly

3. Printer's Name — Arun Bhattacharya
Nationality — Indian
Address — 9B/8 K C. Ghosh Road
Calcutta 700050

4 Publisher's Name — Arun Bhattacharya
Nationality — Indian
Address — 9B/8 K C Ghosh Road

5 Editor's Name — Arun Bhattacharya
Nationality — Indian
Address — 9B/8 K C Ghosh Road

6. Name and address of individual who own the newspaper — Arun Bhattacharya
— 9B/8 K C Ghosh Road

I, Arun Bhattacharya, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and beleif

Sd/- **Arun Bhattacharya**
PUBLISHER

Dated......February 1977

Published by Arun Bhattacharya from Uttarsuri, 9B/8 K. C Ghosh Road, Calcutta-50 and printed by him at SUROOPA TRADING 9/8 K.C. Ghosh Road, Cal 50.

উত্তরসূরি বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৪ ২৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

প্রবন্ধ

কবিতাবলী

সাহিত্য

নতুন কবিতা

সংগীত

সাম্প্রতিক

●

সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য ৯বি-৮, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা ৫০

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আলপনা

অধ্যাপক ডেভিড অ্যাপলবামের সৌজন্যে

উপনিষদ আলোচনায় ইতিহাস

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

উপনিষদ পড়ার পর শোপেনহায়াব যখন বলে উঠেছিলেন, সমগ্র পৃথিবীতে উপনিষদ পাঠেব মত এমন হিতকব ও উদ্বোধনাত্ম বিষয় নেই তখন এই সংবাদ জেনে নিশ্চযই আমবা খুশি হোয়ে উঠেছিলুম। ঠিক এমনি মন্তব্য ঋগ্বেদের পাঠ নেবার পর ম্যাক্সমূলারও করেছিলেন। দু'জনেরই উত্তুঙ্গ মানসিকতার প্রকাশ প্রায় একই ধরনের। প্রসঙ্গটি এই কাবণেব জন্যেই উল্লেখ করা হলো, ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের কাছে এগুলো হলো প্রকল্প। আবও কারণ হচ্ছে, জ্ঞান এমন একটি বিষয় যা কখনো ব্যক্তিবিশেষের সম্পদ না হয়ে সামগ্রিক বিষয়ের তথ্য জানায এবং সেই তথ্য জানাব পর একটি ধারাবাহিকতার সোপান তৈরীর ব্যবস্থা এনে দিতে পারে। এবং ইতিহাস সেই ধারাবাহিকতার সোপান নিয়ে তার বাস্তু নির্মাণ কবতে পারে। পৃথিবীর সভ্যতার ক্ষেত্রে বৈদিক সাহিত্য সবচেযে প্রাচীন একথা সবাই স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেই প্রাচীনতার সীমা কদ্দুর অবধি টেনে নেওযা যায? বৈদিক যুগের জন্মপত্রিকা নিয়ে একটি সন তাবিখ নির্দিষ্ট কবার চেষ্টা হয়েছে, যেমন ম্যাক্সমূলার বলেছিলেন—ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোর রচনা খৃঃ পূঃ ১২০০—১০০০ অব্দে। কিন্তু এই তারিখ নিয়েও পণ্ডিতরা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন। অনেকেরই মত, এটা অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত। যাঁরা ম্যাক্সমূলারের সাথে একমত তাঁরা স্থান-কাল-পাত্র নিয়ে একটি সম্পর্ক স্থির করতে চেয়েছেন, আর একদল এই অনুমানমূলক সিদ্ধান্তের সাথে একমত হতে না-পেরে ভিন্নরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই দুই শ্রেণীর ভিতর যেমন ওদেশীয় পণ্ডিতজন আছেন, তেমনি আছেন আমাদের এদেশীয় পণ্ডিতজনও। আমি বিরুদ্ধ মতবাদীদের সাথে এইজন্যেই সহগামী, তাঁরা একটি স্থির তথ্যের ওপর ভিত্তি

করে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছেন। বিরুদ্ধ মতপোষকদের ক্ষেত্রে যেমন য়ুরোপীয় পণ্ডিত জ্যাকোবি বিণ্টারনিজ্ প্রভৃতি আছেন, তেমনি ভারতীয় ক্ষেত্রে—তিলক, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী শংকরানন্দ প্রভৃতি। বিণ্টারনিজ্ তো আক্ষেপ নিয়েই বলেছেন 'অতি আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে-মতবাদের কোন যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই, তাহাই সকলে বিশ্বাস কবিতেছে।' [১]

এই প্রসঙ্গটি এই কারণের জন্যেই উল্লেখ করা হলো, এই জন্মপরিচয় প্রাচীনতার মহলে প্রবেশ করবার জন্যে একটি বিশেষ উপকরণ। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বোধ হয় বলা অন্যায় হবে না, য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের চিন্তা ধরে এ দেশীয় ইতিহাসের ভিৎ ধরতে অনেকেরই বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়। যেমন 'ইতিহাস' অর্থে ও'দেশে যেরকমভাবে সন-তারিখ নিয়ে আগে যেরূপ ধারণা করা হ'তো সেই ভিৎ ভলতেয়ারের শ্লেষযুক্ত বক্তব্যের পর বদলে গেছে, যে-জন্যে ইংলণ্ডের আধুনিক ঐতিহাসিক কার্-ও ইতিহাসের অনুষঙ্গ রাখতে গিয়ে ভলতেয়ারকে এইভাবে স্মরণ করেছেন : 'At this point I should like to say a few words on the question why nineteenth-century historians were generally indifferent to the philosophy of history. The term was invented by Voltaire, and has since been used in different senses ' [২] এখানে 'ইতিহাসের দর্শন' শব্দদ্বয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমাদের দেশেও চিরকাল ইতিহাস এই অর্থেই ব্যবহৃত হতো, এবং পদ্ধতিও ছিলো ভিন্ন। কারণ? ইতিহাস অর্থে আমাদের দেশে রামায়ণ ও মহাভারতকে ধরা হতো, যার ভিতর একটি সম্পূর্ণ কালকে তার সত্তা ও অস্তিত্ব নিয়ে ধরে রাখা হোয়েছে। কিন্তু তা এখন 'মহাকাব্য'-র বিশেষণ নিয়ে সেই স্থান থেকে চ্যুত। রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য স্মরণ করি 'রামায়ণ-মহাভারতকে কেবল মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে, ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে—রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তন হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস

এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের ভিতর চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান'।[৩] রবীন্দ্রনাথ শেষ লাইনে ভারতের ইতিহাস কোথায় যুক্ত তার স্পষ্ট উক্তি রেখেছেন। মহাভারত আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য একটু উগ্র হলেও স্মর্তব্য 'বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভ ক্ষণ।··· প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি অতি যত্নশীল।'[৪] এখানেও শেষ লাইনটি লক্ষণীয় এইজন্যে, শব্দ ও ভাষা সম্বন্ধে সচেতন না-হলে যে-কোন যুগের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ধরা দুরূহ হোয়ে পড়তে পারে। বেবরের পাণ্ডিত্য ভারতীয় সভ্যতার গঠন যে খুব প্রাচীন নয় তা প্রমাণে যত্নশীলতার জন্যেই বংকিমচন্দ্রের এই শ্লেষ ছিলো, কিন্তু পাণ্ডিত্যও ভুল করতে পারে যদি তা শব্দ ও ভাষা নিয়ে ভ্রান্তিযুক্ত প্রকৃত অর্থের সম্মুখীন না হয়। বৈদিক যুগ হলো তেমনি একটি সময়, যে সময়ের নির্দিষ্ট পঞ্জী সেই সাহিত্যে নেই—এ কথা বললেও ভুল বলা হবে, আবার যদি কেউ বলেন আছে—তবে জিজ্ঞাসা আসবে, সেই জানার পদ্ধতি কি? উপনিষদে বাক্-কে ব্রহ্ম হিসেবেই ধারণা করা হোয়েছে, সেজন্যে শব্দের মূল্য এখানে অসীম। প্রকৃত শব্দকে রক্ষা করা কিম্বা নিশ্চিত জানা বৈদিক সাহিত্যের একটি বিশেষ ধর্ম। 'যজ্ঞ' হলো সেইরকম একটি শব্দ যাকে কেন্দ্র করে সমস্ত বৈদিক যুগ ও সেই যুগের কর্ম তৈরী হোয়েছে। 'পুরাণ' হলো আর একটি শব্দ যা ইতিহাসের সাথে যুক্ত হোয়ে আর একটি ধারা রক্ষা করে বিভিন্ন সাহিত্যের পারম্পর্য রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়. 'বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা পৌরাণিক ধর্ম অঙ্কুরের অপেক্ষা বৃক্ষের ন্যায় শ্রেষ্ঠ।' এই দুই ধারা পুরাণ ও ইতিহাস, ভারতীয় সাহিত্যে রক্ষিত হোয়ে, দুই সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে। উপনিষদ-ও বৈদিক সাহিত্যে আর একটি বিশেষ শব্দ, যা বৈদিক ঋকের পাশাপাশি থেকে কোনসময়ে তা 'আদেশ' অর্থে ব্যবহৃত, কোন সময়ে 'ইতিহাস' এবং দর্শনের সাথে যখন যুক্ত তখন তার নাম—গুহ্যবিদ্যা। এগুলো এজন্যেই স্মর্তব্য, বিবর্তনের ইতিহাস কিভাবে গতি রক্ষা করেছে তার সতর্কতা রক্ষা না-করলে, এ ধরনের মন্তব্যের সম্মুখীন হ'তে হবে—যেহেতু উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব অনেক উন্নত, সেই হেতু তা অর্বাচীন। উদাহরণের জন্যে 'যজ্ঞ'

শব্দ নিয়ে একটি দৃষ্টান্তের সম্মুখীন হওয়া যাক। আমরা জানি শ্রুতি হিসেবে বৈদিক ঋক্ রক্ষা হ'বার জন্যে বহু ঋকের কাহিনী প্রকৃতভাবে রক্ষা করা হয়নি, কিম্বা শ্রুতি হিসেবে রক্ষিত হ'বার জন্যে কালক্রমে তা লুপ্ত হোয়েছে। ঋগ্বেদের প্রথম অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তটি আমরা সেইভাবে স্মরণ নিতে পারি। 'অগ্নি পূর্ব ঋষিদিগের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন এবং নূতনের দ্বারাও। তিনি দেবতাদিগকে এখানে বহন করুন।' (বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত অনুবাদ)। এই ঋকের ভিতর কী আমরা সেইরকম কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাই? বোধ হয় পাই। দু'টো সংবাদ এখানে বিশেষ ক'রে স্মর্তব্য। একটি হলো 'পূর্বঋষিদিগের দ্বারা' আর একটি হলো 'নূতনের দ্বারা', আরও মনে রাখা দরকার এটি হলো ঋগ্বেদের প্রথম অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্ত, এবং এই সূক্তের পাঠ নিয়ে নিশ্চয় করে ধারণা করতে পারি—পূর্বেই এইরকমভাবে যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হতো কিন্তু তার ইতিহাস আমাদের কাছে অজ্ঞাত। য়ুরোপীয় পণ্ডিতরাও একথা স্বীকার করেছেন: **'Indo-European etymological equations have established the fact that sacrifices or rather the system of making offerings to the Gods for various purposes existed from the primeval period.'** [৫] এইসব অনুষঙ্গগুলো ধরবার জন্যে সে কারণে সতর্ক পদক্ষেপ না-ঘটলে বিভ্রান্তি তৈরী হ'তে পারে, যে বিভ্রান্তি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বেবর সাহেবের ঘটনা নিয়ে ইচ্ছাকৃত—আবার অনিচ্ছাকৃতভাবেও ঘটতে পারে। কিন্তু এই ধরনের বিভ্রান্তি যাতে না ঘটতে পারে সেজন্যে বৈদিক সাহিত্যে আর একটি জিনিষ বিশেষ করে ব্যবহৃত হোয়েছে, সেই শব্দদ্বয় হলো 'পূর্বপরম্পরা'। এই শব্দ-দ্বয়ের অনুষঙ্গ নিয়ে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের একটি মন্তব্য স্মরণ করি: 'উপনিষদ ও আরণ্যকের অপেক্ষাও প্রাচীনতর শতপথ ব্রাহ্মণের একাদশ ও চতুর্দশ কাণ্ডে চারি বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, নারাশংস এবং গাথার উল্লেখ আছে এবং তাহাদিগের স্বাধ্যায় (**subject of study**) করিবার কথা আছে। ঐ ব্রাহ্মণেরই ১২শ কাণ্ডে আখ্যান, অন্বাখ্যান ও উপাখ্যানের প্রসঙ্গ আছে এবং ১৩শ কাণ্ডে অনেকগুলো গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সকল গাথার অনেক স্থলে সুপ্রাচীন বৈদিক আকার রক্ষিত দেখা যায়।'[৬]

এইরকম পদ্ধতিই বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতা জানবার বিশেষ উপকরণ। এই বিশেষ উপকরণ ধরেই সেই যুগকে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন পূর্বোল্লিখিত বৈদিক অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তে আর একটি বিশেষ শব্দ হচ্ছে 'অগ্নি' এবং যে শব্দের ভিতর বৈদিক দার্শনিক সূত্রের প্রথম একবাদ বীজরূপে নিহিত। এবং এই 'অগ্নি' হচ্ছে বৈদিক কর্মকাণ্ডের একটি বিশেষ রূপ, নৈসর্গিক ও জাগতিক নিয়মকে ধরার মানদণ্ড হিসেবে যাকে 'পুরোহিত' বিশেষণের দ্বারা ভূষিত করা হোয়েছে। এর ভিতর যেমন সূর্যের অঙ্গীকারও নিহিত, তেমনি নিহিত জগৎনিয়মের আন্তর কারণ। ঋগ্বেদে যখন একে বলা হয় 'অগ্নি শ্রেষ্ঠ পুষ্টিব হেতু' কিম্বা 'লোক সকলের রক্ষক' কিম্বা 'দ্যুলোক ও পৃথিবীব উৎপাদক'—(৯৬ সূঃ ৪ ঋক), এইসব বর্ণনা বর্তমান যুগেও অবাস্তর বলে মনে হয না। এবং কঠোপনিষদে নচিকেতার কাছে যম কর্তৃক 'অগ্নি'-র ব্যাখ্যায় এইসব তাৎপর্যই বিশেষ করে বর্ণিত হয়েছিলো। সূর্যের প্রাথমিক প্রকাশ যখন 'অগ্নি-'র ভিতরেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত তখন তা উপনিষদের 'নাম' রূপ, দার্শনিক ব্যাখ্যায 'নাম'-এর অস্তিত্ব ততক্ষণ যতক্ষণ তা দৃশ্য। নদীর নাম ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তা সমুদ্রে লীন না হচ্ছে। অক্ষরব্রহ্ম ধরতে গেলে এইসব ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যখন বলা হয আত্মা জ্যোতির্ময় তখন 'অগ্নি'-র স্বরূপ জানা প্রয়োজন। যখন উপনিষদে বলা হয় 'তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্' (মণ্ডুক—২।২।১০) তখন জ্যোতিব সত্তা কোথায় ধরার জন্যে 'অগ্নি' একটি বিশেষ ঘটনা।

সেজন্যে বৈদিক দার্শনিক তত্ত্বে এগুলো হচ্ছে এক একটি বিশেষ শব্দ, সেই শব্দের ওপরই এই বৈদিক সাহিত্য দাঁড়িযে রয়েছে। এবং এগুলো যদি বাহন বলেও ধরে নেওয়া হয়, তাহলে তা বুঝতে সুবিধা হয়। যখন বৈদিক সাহিত্যে 'দ্যাবা পৃথিবী' উচ্চারিত হয় তখন তা আকাশ ও পৃথিবীকে যুক্ত করেই একটি অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়। যখন সাবিত্রী মন্ত্রে বৃহস্পতির অভাবনীয় তেজের কথা স্মরণ করে স্তুতি করা হয়, তখন একমাত্র মনে রাখা উচিত—'অদিতি' অর্থে অসীমতার ধারণা, যে অসীমতার ভিতর এই নৈসর্গিক জগতের অবস্থান। যে-জন্যে য়ুরোপীয় পণ্ডিত আচার্য রোথ্ সাহেবকেও বলতে হোয়েছিলো : 'This

eternal and inviolable principle in which the Aditya lives and which constitutes their essence is the Celestial Light.' *

শেষ শব্দটুটি কি বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বস্তু? উপনিষদগুলো যখন বারবার আত্মা জ্যোতির্ময়ের কথা উল্লেখ করেছে তখন এইরকম শব্দের তাৎপর্য অনুধাবন না-করলে তা ধরা যাবে না। কিন্তু এসব একজন য়ুরোপীয় আলোচকের চোখে ধরা পড়েছিলো। এবং ভারতীয় দর্শনের তাৎপর্য ধরবার পক্ষে এইরকম সব শব্দই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম ও ভিত্তি। রিভিলেসন কিম্বা আপ্তবাক্য য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়, এবং তা যদি কোন ঘটনার সাথে যুক্ত হয়, যেমন সক্রেটিসের ক্ষেত্রে ঘটেছিলো, তখনো তা ঘটনা ছাড়া বিশেষ নিরীক্ষার বস্তু হোয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু ভারতীয় শ্রুতি কিম্বা দার্শনিক তাৎপর্যে যে-কোন বাক্-ই বিবর্তনের ধর্ম নিয়ে নিরীক্ষার বিষয়। সে-জন্যে উপনিষদের ব্যাখ্যা মূর্ত ও অমূর্তের বিষয়গুলো ধরে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে চেয়েছে। যে জ্যোতির্ময় আত্মার কথা শ্রুতি সাহিত্যে বলা হোয়েছে, তার বোধগম্য স্বরূপ কী বাস্তব ভিত্তিতে সম্ভব? ঐ গূঢ় চিন্তায় যাবার আগে এটাই বলা দরকার, শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হোয়েছে তার সম্বন্ধে সঠিক মনোনিবেশের প্রয়োজন। এবং সামাজিক ও ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে সেই শব্দগুলোর ধারণা কি ধরণের মানসিকতার দ্বারা প্রবুদ্ধ হোয়েছিলো তার-ও নির্ণয় প্রযাস-সাপেক্ষ। উদাহরণের জন্যে কয়েকটি সংবাদের কথা বলা যায়।

২

বর্তমান যুগে যে মাসদ্বয়কে বাসন্তিক কাল বলে ধরি, বৈদিকযুগে সেই মাসদ্বয়কে বসন্তকালীন ঋতু বলে ধরা হতো না। যেমন তৈত্তিরীয় সংহিতার বর্ণনা—মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতু—চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস সেই সময়ে বসন্তকাল বলে ধারণা করা হতো। এই ঋতুবর্ণনের কাল ধরে যদি কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা কী অনৈতিহাসিক? যেমন তিলকের 'ওরায়ন' বই-এর তথ্য ধরে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মন্তব্য করেছেন: 'ঋগ্বেদের কয়েকটি ঋকে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়, ঐ সকল ঋকের রচনাকালে পুনর্বসু নক্ষত্রে বাসন্তিক

ক্রান্তিপাত সংঘটিত হইত। এখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হয় উত্তরভাদ্রপাদ নক্ষত্রে। উত্তরভাদ্রপাদ হইতে পুনর্ব্বসুর দূরত্ব ৮ নক্ষত্রেরও অধিক।... বৎসরে বিষুবন যখন ৫০ বিকলা মাত্র অতিক্রম করে, তখন এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে ৭৬০০ বৎসরের প্রয়োজন।'[৮] এইসঙ্গে আমরা একজন য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মত স্মরণ করি 'At this time the ancient Hindus must have possessed an astronomical science, probably elementary yet based on scientific principles on actual observations.' (Indian Antiquary, 1894), বুলারের এই অভিমত যদিও কিছুটা সন্দেহের দ্বারা আচ্ছন্ন তবু সেই সময়কার জ্যোতিজ্ঞান যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রোথিত তা তিনি স্বীকার করেছেন। আর এইসব লক্ষণীয় তথ্যের ওপব যেমন তিলকও আলোচনা করেছেন, তেমনি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-ও মন্তব্য করেছেন 'ঐ সময়ে উত্তরায়ণে বর্ষপ্রবেশ ধরা হইত শতপথ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের বচনে যে কালের উল্লেখ পাইলাম, ঐ সময়ে ফাল্গুন মাসে উত্তরায়ণ হইত। এতা বৈ (কৃত্তিকাঃ) প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে। সর্ব্বানি বা অন্যানি নক্ষত্রানি প্রাচ্যৈ দিশশ্চবন্তে: শতপথ ২।১।২-৩। অর্থাৎ কৃত্তিকা (যে নক্ষত্রপুঞ্জ দৃষ্ট হইতেছে তাহা) পূর্ব্বদিক হইতে স্খলিত হয় না। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শতপথ ব্রাহ্মণের সংকলন সময়ে কৃত্তিকা তারাপুঞ্জ বিষুবৎ বৃত্তে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ কৃত্তিকাপুঞ্জ বিষুবন্ থাকিত। সে কতদিনকার কথা? এ গণনা কঠিন নহে।' এবং এই পদ্ধতি গ্রহণ করে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত দেখিয়েছেন যে, শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকাল প্রায় খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর।[৯] যদিও আমরা আধুনিক ঐতিহাসিকের এই উক্তির সাথে পরিচিত: ' these so called basic facts, which are the same for all historians, commonly belong to the category of raw materials of history.'[১০], তথাপি উপরোক্ত বক্তব্যের ভিতর লক্ষ্য করলে ধরা যায়, তিনি এইসব তথ্যকে পুরোপুরি অস্বীকার না করে বলেছেন, অপরিণত তথ্য। অপরিণত হতে পারে, যদি আমরা আরও কিছু ঘটনা এড়িয়ে যাই, যেমন রচনা ও সংকলন কাল। যাজ্ঞবল্ক্য শতপথ ব্রাহ্মণের রচনার কর্তা ছিলেন না, সংকলন করেছিলেন। যেমন ম্যাক্সমূলারের অভিমত: 'It would be a mistake to call Yagnavalkya the

author, in our sense of the word, of the Vajaseniya Samhita and Satapath Brahmana. But we have no reason to doubt that it was Yagnavalkya who brought the ancient Mantras and Brahmanas into their present form.'[১১] এবং তাই যদি হয় তাহ'লে যাজ্ঞবল্ক্যের সময় ?

৩

'পূর্ব পরম্পরা' শব্দ এই প্রবন্ধের ভিতর পূর্বে উল্লেখ করেছি, গবেষকদের কাছে এই প্রকল্প ধরেই তারও নির্ণয় সহজসাধ্য বোধ হয়। 'বোধ হয়' শব্দদ্বয় এইজন্যেই ব্যবহৃত হয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদের তিনটি অধ্যায়ের শেষে (দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে), যদিও দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের নামের তালিকা এক, কিন্তু ষষ্ঠ অধ্যায়ের নামের তালিকা ভিন্ন এবং এই তালিকাতেই যাজ্ঞবল্ক্যের নাম দেখা যায়। এই নাম তালিকার দ্বারা কোন সূত্রের সন্ধান ? যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্বে আরও দশপুরুষ ছিলো, এবং সেই সময়ের ব্যবধান ? প্রসঙ্গটি এইজন্যেই উল্লেখ করা হলো, এইগুলো সূত্র এবং তা নিরাকরণের জন্যে প্রযত্নও প্রয়োজন। এও সবজন-স্বীকৃত, বৃহদারণ্যক উপনিষদ সবচেয়ে প্রাচীন, কিন্তু সেই প্রাচীনতার সীমা কত দূর ? শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকাল যদি হয় খৃ. পূঃ ২৫০০ অব্দ, এ-ও কেউ অস্বীকার করেন না, ব্রাহ্মণভাগের সঙ্গে সঙ্গেই আরণ্যকভাগের জন্ম হোয়েছিলো। বর্তমানে এই নির্বাচন শব্দের ব্যবহার ধরে আরও নিরংকুশ হ'তে চাচ্ছে। যেমন আধুনিক ভাষ্যকার প্রফুল্লকুমার বসুর কৌষীতকি উপনিষদ নিয়ে মন্তব্য . 'বেদে কালকে 'ঋতু' বলা হত। কৌষীতকি উপনিষদেও কালকে 'ঋতু' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য এই দুটি উপনিষদের কোনটিতেই 'ঋতু' শব্দের উল্লেখ নেই , তার পরিবর্তে 'কাল' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।'[১২] এজন্যে তিনি এই উপনিষদকে আরও প্রাচীনতর বলে নির্দেশ করতে চেয়েছেন।

এবং এইরকম উপকরণ নিয়েই প্রাচীন যুগের বিচারের একমাত্র সম্ভাবনা। যেমন পণ্ডিত ডুাসেনও উপনিষদ আলোচনায় এইরকম মানসিকতার পরিচয়

দিয়েছেন. 'certain mysterious words, expressions, and formulas which are only intelligible to the initiated, are described as Upanishads.'[১৩] ফরমূলার বাংলা প্রতিশব্দে, সূত্র—যাঁরা উপনিষদকে আলোচনার বিষয়বস্তু করেছেন তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন, আচার্যগণ শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল করবার জন্যে প্রাচীন সূত্র উদ্ধার করেছেন। যেমন যাজ্ঞবল্ক্য 'নিবিদ্' উদ্ধৃতি দিয়ে দেবতত্ত্ব মীমাংসার জন্যে সদুত্তর দিতে চেয়েছেন। (বৃহঃ ৩।৯।১) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্য · 'পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, বেদসংহিতায় সংকলিত মন্ত্র অপেক্ষাও 'নিবিদ্, প্রাচীনতর। উপনিষদে অধ্যাত্মতত্ত্ব সমর্থনের জন্য যখন এরূপ 'নিবিদ' উদ্ধৃত দেখা যাইতেছে, তখন এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে, সেই অতি প্রাচীন যুগে ঋষি সমাজে আধ্যাত্মিকভাবের অভাব ছিল না।' [১৪]

এসব বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাঁরা চিন্তা করেন উপনিষদের আবস্ত বৈদিক যুগের একেবারে অন্তে তাঁদের নতুন করে চিন্তা করবার সময় হোয়েছে। উপনিষদের ভিতরেই দেখা যায়, 'উপনিষদ' বিষয়টিকেই একটি অধীত জ্ঞান বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভিতর (২।৪।১০) অধীত বিদ্যার তালিকার মধ্যে 'উপনিষদ' শব্দ যুক্ত। এ দেখে স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, এই উপনিষদের পূর্বেও 'উপনিষদ' নামে একটি অধীতব্য বিষয় ছিলো, এবং এসব তথ্য তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিভিন্ন উপনিষদে এরকম উদাহরণ অজস্র পাওয়া যায়। যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটি বল্লী এই বলে শেষ হলো, 'ইহাই উপনিষদ' (৩।১০।৬) কিম্বা যখন প্রাচীন সূত্র এইভাবে রক্ষা করা হয়ঃ 'তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যম্' (বৃহ ২।১।২০) 'তথাত আদেশ নেতি নেতি' (বৃহ : ২।৩।৬), ছান্দোগ্যের—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্' (৩।১৪।১—তজ্জলান্ অতি প্রাচীন শব্দ)—এই রকম সূত্র উল্লেখের দ্বারা এই-ই প্রমাণ হয় প্রাচীনকালে গুহ্যবিদ্যা গ্রহণের জন্যে কি ধরণের চিন্তার সাথে তাঁদের যুক্ত করা হতো। এও আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ, এই ধরণের চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই উপনিষদের সৃষ্টি হোয়েছিলো, যার সাধারণ অর্থ আচার্যের কাছে বিনীতভাবে উপস্থিত হোয়ে শিক্ষা নেওয়া। য়ুরোপীয় পণ্ডিত হুরনিজ্ যার ভাষা দিয়েছেন—'disciples sitting near their teacher

engaged in religious converse' (Indian Literature—P 41)। এবং উপনিষদ শব্দও আবার গভীরতার ভিতর প্রবেশ করার পর কিছু ভিন্নভিন্ন অর্থ জ্ঞাপন করেছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ যখন ব্যাখ্যা আরম্ভ করে: 'সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাসামঃ' (১।৩।১) তখন এর অর্থ হয় বিশেষ দর্শন, কিম্বা কৌষিতকী যখন বলছে: 'য এবং তস্যোপনিষম্ন যাচেদিতি' (২।১) তখন এর অর্থ রহস্যবিদ্যা বলেই ধারণা করা হচ্ছে। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ যদিও প্রাচীন উপনিষদগুলোর সবচেয়ে অর্বাচীন তার ভিতর উপনিষদের প্রাচীনতাব কথা এইভাবে উক্ত হোয়েছে. 'বেদান্তে পবমং গুহ্যং পুরাকালে প্রচোদিতম্' (৬।২২)।

সেজন্যে প্রশ্ন বাখা যায়, উপনিষদ বিষয় প্রাচীনকালে যেভাবে ধারণা কবা হতো তাব থেকে অন্যরূপ ধাবণা করার সুযোগ আছে কিনা? বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ পদ্ধতি সঠিকভাবে রক্ষা করবার জন্যে সেই যুগে 'স্বাধ্যায়' শব্দটির একটি বিশেষ মূল্য ছিলো, উচ্চারণে জ্ঞানগত ধারণার বিপত্তি লাঘবের জন্যেই এই 'স্বাধ্যায়'-এব ব্যবস্থা আচার্য ও শিষ্যের ভিতর প্রচলিত ছিলো। কাবণ প্রতি শব্দের মূল্য না-বুঝলে (এবং সেই শব্দও আবার অক্ষরের সাথে যুক্ত, সেই অক্ষরও একটি বিশেষ শক্তিব দ্বারা চিহ্নিত ছিলো)—সেই শক্তির রূপ ও স্বরূপ না ধরতে পারলে ব্রহ্মতত্ত্বের মূল্য ধরা দুরূহ হতে পারে। 'ওম্' সেই অক্ষরের আদি শক্তি, পণ্ডিতেরা এখনও পর্যন্ত অন্ধকারে, এই অক্ষরের প্রকৃত অর্থ কী? কিন্তু এই অক্ষরের অন্তর্নিহিত কারণের জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদ তিন বেদকে আশ্রয় করে এব ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত এনেছে: 'ওংকারেণ সর্ব্বাবাক্ সংতৃণ্ণোঙ্কার এবেদং সর্ব্বমোঙ্কারঃ', এই ওংকারই সমুদয় বাক্য এবং এই ওংকার দ্বারাই সমুদয় ব্যাপ্ত (২।২৩।৩) এবং এই ওংকারের উপাসনার জন্যে সমস্ত উপনিষদ অত্যন্ত সচেতন। এবং উপাসনা হলো আর একটি শব্দ, যে শব্দ ছাড়া বৈদিক যুগের ব্রহ্ম যে বিজ্ঞানযুক্ত, তা ধরা দুষ্কর হতে পারে। এই উপনিষদেই আমরা পাই, কৌষিতকী ঋষি তাঁর পুত্রকে বলছেন, প্রাণের উপাসনার দ্বারা তিনি তাঁকে পেয়েছিলেন, সেইজন্য পুত্রকেও বলছেন প্রাণের উপাসনা করো, যাহা উদ্গীথ তাহাই প্রণব যাহা প্রণব তাহাই উদ্গীথ। (১।৫।৪-৫) উদ্গীথ

হচ্ছে স্বর রহস্য, ঋগ্বেদ প্রতিশাখ্যে অস্তমিত সূর্যকে স্বর বলা হতো এবং প্রাতঃকালে সূর্য যখন প্রত্যাগমন করতো তখন বলা হতো—প্রতিস্বর।৮ আমাদের জাগতিক গঠনে সূর্য যেমন বর্তমানে আমাদের সম্পদ, তেমনি বৈদিক সাহিত্যেও সূর্যের প্রত্যেকটি বিভা নিয়ে এক এক ঋক তৈরী হয়েছে।৮ ছান্দোগ্যের তৃতীয় অধ্যায়ে সূর্যকে নিয়ে 'মধুবিদ্যা কল্পনা' তার-ই ব্যাখ্যা। আমরা আধুনিক ঐতিহাসিকের একটি উক্তির স্মরণ নিতে পারি: 'The historian without his facts is rootless and futile, the facts without their historian are dead and meaningless My first answer therefore to the question, 'What is history?' is that it is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past.'[১৫]

ইতিহাস যদি হয় বর্তমান ও অতীতের ভিতর অন্তহীন সংলাপের কাহিনী তাহলে তার সঙ্গে উপনিষদের এই সংলাপও যুক্ত করতে পারি - 'যাহা বিদ্যাযুক্ত, শ্রদ্ধাযুক্ত ও উপনিষদযুক্ত হোয়ে সম্পন্ন করা যায় তাই অধিকতর শক্তিশালী হয়' (ছান্দোগ্য ১।১।১০), ঋগ্বেদে যখন বলা হয় 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (১।১২৪।৬) এবং তার প্রতিধ্বনি তুলে ছান্দোগ্য-ও যখন বলে: 'একমেবাদ্বিতীয়ম' (৬।২।১) তখন এ-ও কী সেই অন্তহীন সংলাপের-ই অংশবিশেষ? কিন্তু তথ্য হলো ইতিহাস সংরক্ষণের দ্বিতীয় উপকরণ, সেই উপকরণ যেমন সামান্য-র বর্ণনাও দেয় আবার বিশেষের-ও কথা বলে।৮ ব্রহ্ম হলো উপনিষদের বিশেষ একটি শব্দ, যে শব্দকে উপলক্ষ্য করে উপনিষদও বলে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন (ছাঃ ২।২৩।১)।৮ তখন প্রশ্ন হতে পারে, এই ব্রহ্মের আলেখ্য সেই যুগে কি রকম ছিলো? সামাজিক ক্ষেত্রে তার মূল্য কি রকম মূল্যায়নের দ্বারা বদ্ধ ছিলো, এবং বিশিষ্ট জ্ঞানীপ্রবরদের নিকটই-বা কি রকম ছিলো? প্রসঙ্গটি অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও, প্রাসঙ্গিক এই কারণের জন্যে—যুক্তি ও বিচার সেই সময়ে কি ধরণের মানদণ্ডের দ্বারা চালিত হতো তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ নিম্নলিখিত ঘটনার ভিতর পাওয়া যায়।

যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদের আর্তভাগ-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ-এ তথ্য পাই, সামাজিক ক্ষেত্রে আলোচনার জন্যে যে সীমা রক্ষা করা হতো তার আয়তন ততটুকুই থাকতো যতটুকু সামাজিক আয়তনে বোধগম্য হয়। যখন যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মৃত্যুর পর পুরুষ কোথায় যায়? যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর- 'আমরা দুইজনে এই বিষয় অবগত হবো, আমাদের এই প্রশ্ন জনবহুল স্থানে বিচার্য নহে।' (৩।২।১৩)। উপনিষদ যে গুহ্যবিদ্যার সাথে যুক্ত, এইরকম বর্ণনার দ্বারা তা স্পষ্ট। যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সংবাদ-এ ব্রহ্ম বিষয়ে বিচারের পদ্ধতিতে এ কথাই আবার স্পষ্ট হয়, বিচারের ক্ষেত্রে যুক্তি কিম্বা প্রশ্ন, বুদ্ধিনির্ভর না-হোয়ে তথ্যনির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্রহ্মচিন্তায় এ কথাই স্বীকৃত, ব্রহ্ম হচ্ছে এমন অচিন্ত্যনীয় বিষয় যা থেকে সমুদয় বিষয় উৎপন্ন হয়, তাহাতেই লীন হয় এবং তাহাতেই জীবিত থাকে (৩।১৪।১ ছান্দোগ্য)। কিন্তু গার্গীর প্রশ্ন ছিলো ব্রহ্ম কাহাতে ওতপ্রোত? যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর, অতি প্রশ্ন করো না। এবং গার্গীও আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে এই বিশেষণই দিয়েছিলেন—ব্রহ্মবিচারে কেউ এঁকে পরাজিত করতে পারবেন না (৩।৮।১১-১২ বৃহদারণ্যক)। এইসব সংবাদের ভিতর আমরা আরও তথ্য পাই, আলোচনা কিম্বা জ্ঞানগত বিষয় সামাজিক ক্ষেত্রে কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্তি পেতে পারে, প্রসঙ্গালোচনায় এই নৈশ্চিত্য ছিলো বলেই গার্গী আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে ঐ রকম বিশেষণ দ্বারাই যাজ্ঞবল্ক্যকে বিভূষিত করেছিলেন। এবং এও স্পষ্ট, ব্রহ্ম হচ্ছে সেইরকম সিদ্ধান্ত যার ওপর অতি-প্রশ্ন আনা অর্বাচীনতা। যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞান একটি গুহ্যবিদ্যা বলে স্বীকৃত ছিলো সেই হেতু এই বিদ্যা শিখবার জন্যে যে-সব শিষ্য আচার্যদের কাছে আসতো তাদের অত্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গ্রহণ করা হ'তো, কঠোপনিষদের যম-নচিকেতার কাহিনী সেইধরনের সংবাদ, ছান্দোগ্যের প্রজাপতি ও ইন্দ্রবিরোচন সংবাদও সেইরকম ঘটনা। ড্যুসেনের ভাষায় এই গুহ্যবিদ্যার নাম—'a confidential secret sitting', আর এই বিদ্যার মূর্তের ব্যাখ্যা 'সৎ' শব্দের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে তার নাম হোয়েছিলো সগুণ, এবং 'তৎ' শব্দের দ্বারা নাম নিয়েছিলো—নির্গুণ। ব্যাখ্যায়

জন্যে আমরা যুক্তিবাদী রাসলের 'মিস্টিসিজম্ এ্যাণ্ড লজিক' বই থেকে একটি উদ্ধৃতির স্মরণ নি: 'Belief in a reality quite different from what appears to the senses arises with irresistible force in uncertain moods, which are the source of most mysticism and most metaphysics. While such a mood is dominant, the need of logic is not felt, and accordingly more thorough-going mystics do not employ logic, but appeal directly to the immediate deliverance of their insight. But such fully-developed mysticism is rare in the West.' [১৬] আমরা অন্য প্রসঙ্গে না গিয়ে এই উক্তির 'ইনসাইট' ও শেষ লাইনটি ধরে এই প্রশ্ন তুলতে পারি, এ যদি য়ুরোপে সম্ভব না হয় তবে সম্ভব কোথায়? রাসেল এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে কেবল একটি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। কিন্তু উইল ডুরাণ্ট তাঁর 'দর্শনের ইতিহাস' বই-এ এই সংবাদ পরিবেশন করেছেন—প্লেটো সম্ভবত রহস্যবিদ্যা শিখবার জন্যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন।[১৭] গুহ্যবিদ্যার কারক যে ভারত এ কথা কী আধুনিক পণ্ডিতরাও স্বীকার করেন? প্রশ্নটি এই কারণের জন্যেও নয়, য়ুরোপীয় প্রজ্ঞানে 'লোগোস' শব্দ উপনিষদের 'বাকই ব্রহ্ম' শব্দদ্বয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করলেও স্টোয়িকরা এর ভিতর বুদ্ধির সংযোগ দেখতে পেয়েছিলো, ইহুদি দার্শনিক ফিলোও এবং যুক্তিবাদী রাসেলও অংকের জ্ঞান নিয়ে সেই বুদ্ধির তত্ত্ব দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞানের সংবাদ রাখতে চেয়েছিলেন। 'বিশ্বাস' হলো এমন একটি শব্দ, যাকে অস্বীকার করে অগ্রসর হওয়া যায়, কিন্তু সেই অগ্রসর সীমার দ্বারা সঙ্কুচিত। যেখানে সংখ্যার জন্যে দুই বস্তু নেই, সেখানেও যুক্তিবাদী রাসেলকে অনুমান-এর ওপর নির্ভর করতে হোয়েছিলো 'Such reflections have led me to think of mathematical exactness as a human dream, and not as an attribute of an approximately knowable reality. I used to think that of course there is exact truth about anything though it may be difficult and perhaps impossible to ascertain it.' [১৮] শেষ লাইনটি কী বিশেষভাবে লক্ষণীয়? প্রায় খৃঃ পূঃ

তিনহাজার বৎসর পূর্বে এই জিনিষ-ই যদি আমাদের শ্রুতিতে দেখি, এবং সেখানে যদি অবিশ্বাস না দেখে বিশ্বাস দেখি? কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলছেন: এই আত্মা অণুপ্রমাণ হতেও অণুতর, সুতরাং ইহা তর্কের বিষয় নয়, হীন প্রাকৃতবুদ্ধি লোকের উপদেশেও এই আত্মাকে সম্যকরূপে জানা যায় না (১।২।৮), জানা যায় হৃদয়ের অনুভূতি, সংশয়রহিত বুদ্ধি ও সংস্কৃত মন দ্বারা (২।৩।৯)। এবং সংস্কৃত মনের ব্যবস্থা? এই সম্পূর্ণ বৈদিক সাহিত্যে মননের পূর্ণ বিকাশের জন্য দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বস্তু নিয়ে ব্যাখ্যা তৈরী করে সেই অস্তিত্ব বোধের জন্যে তত্ত্বগুলোর বর্ণনা জানায়। 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ মর্তং চামৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ' (বৃহঃ ২।৩।১) এর ভিতর দুই রূপের সব সত্যের বর্ণনাই দেওয়া হলো শুধু শব্দ দ্বারা, মূর্ত বা অমূর্ত, মর্ত্য ও অমৃত, স্থিতিশীল ও গতিশীল। এই বর্ণনার পর যখন আরও জানানো হচ্ছে, যিনি ইহাকে জানেন তিনি বিদ্যুৎ ঝলকের মত শ্রী লাভ করেন (২।৩।৬-বৃহঃ)। এটা কি বিশ্বাস? এর সঙ্গে আরও একটি গূঢ় ইংগিত এই উপনিষদের তত্ত্বের সাথে ছড়ানো, তা হচ্ছে 'নিদিধ্যাসন' নামক শব্দ, যার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জ্ঞাতবস্তুর ধ্যান। এই রূপ ধরবার জন্যে যেমন ক্রমাগ্রসরের পরিচয় দেওয়া হোয়েছে তেমনি বলা হোয়েছে বিবর্তনের কারণগুলো। যাজ্ঞবল্ক্য নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলছেন 'আত্মাকে দেখতে শুনতে মনন করতে হলে ধ্যান করতে হবে' (২।৪।৫—৪।৪।৬)। ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার-নারদ সংবাদ-এ দেখা যায়, পরপর কি শ্রেষ্ঠ তার বিবরণ। বাক্-কে ব্রহ্ম বলে বুঝতে হলে তার উপাসনা করতে হবে, তেমনিভাবে মন আকাশ প্রাণ ও সত্যের। এ হচ্ছে, এরকম এক পদ্ধতি যার পরিচয় নিয়ে ধরা যাবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মূর্ত ও অমূর্তের সম্বন্ধ। আত্মত এবেদং সর্বমিতি। মুণ্ডক উপনিষদ যখন জানায় 'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ' (১।১।৯) তখন তপস্যা শব্দ কি কারণের জন্যে তা স্পষ্ট হয়। ছান্দোগ্যের সত্যকামের কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে যিনি ব্রহ্মকে জ্যোতিষ্মান জেনে তপস্যা করেন, তিনি জ্যোতিষ্মান হন (৪।৭।৪)।

এইগুলো এইজন্যেই বলা হলো, ভারতীয় প্রজ্ঞানজগৎকে ধরবার জন্যে এইগুলোই দ্রষ্টব্য। য়ুরোপীয় দর্শনে রিভিলেসন কিম্বা আপ্তবাক্য একটি ঘটনা শুধু, তা কখনও নিরীক্ষার বিষয়বস্তু হোয়ে দাঁড়াতে পারেনি। গার্গীকে

এইজন্যেই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন : 'এই অক্ষরব্রহ্মকে না-জেনে যে সিদ্ধি পেতে চায় তার সিদ্ধি কোনকালেই হয় না' (বৃহঃ ৩।৮।১০)। মুণ্ডক এইজন্যেই পরা ও অপরার ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে এই সিদ্ধান্তই দিয়েছিলো 'বিদ্বান্নামরূপাদ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্' (৩।২।৮)।

গুহ্যবিদ্যার এইসব ধর্ম জেনে শোপেনহায়াব যেমন চমৎকৃত হোয়েছিলেন তেমনি চমৎকৃত হয়েছিলেন ঐ দেশের আব একজন পণ্ডিত। বিণ্টারনিজ্-এর বক্তব্য 'For the historian, however, who pursues of human thought, the Upanishads have got a far greater significance. From the mystical doctrines of the Upanishads one current of thought may be traced to the mysticism of Persian Sufism to the mystic logos doctrine of neo-Platonics and the Alexandrian Christians down to the teachings of the Christian mystics Eckhart and Tauler, and finally to the great German mystic of the nineteenth century, Schopenhauer.' [১৯] ভারতের বাইরে উপনিষদ-ধর্মের এই প্রতিষ্ঠা জেনে কী আমরা খুশী? প্রশ্নটি সেইদিক দিয়েও নয়, বর্তমান যুগেও উপনিষদের আত্মা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনচর্চার প্রাকার তৈরী করতে চেয়েছিলেন, ঈশ উপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি জেনে মহাত্মা গান্ধীও উজ্জীবিত মন নিয়ে বলে উঠেছিলেন 'আমি এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হোয়েছি, যদি সমস্ত উপনিষদাবলী শাস্ত্র হঠাৎ ভস্মীভূত হবার পর এই মন্ত্রটিই রক্ষা পায় তাহলে হিন্দুধর্ম এই মন্ত্রটির জন্যেই চিরকাল সজীব থাকবে।' প্রাচীন যুগে গীতা পর্যন্ত এই ধর্ম যে সজীব ছিলো ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দেয়, কিম্বা পরবর্তী যুগে যে ধর্মস্রোত রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত হোয়েছিলো উপনিষদের দর্শন যে ত র-ই কারক সে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু আধুনিক যুগ? উত্তর না-দিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিক এ্যক্টনের একটি বক্তব্যের স্মরণ নি : 'History must be deliverer not only from the undue influence of other times, but from the undue influence of our own, from the tyranny of environment and the presence of air we breathe.'[২০] এর সঙ্গে ঈশ উপনিষদের

যদি সেই বিখ্যাত শ্লোকটি স্মরণ করি? 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ ধনম্', রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মৃত্যু হোয়েছিলো চল্লিশের দশকে আর এটা হলো সত্তরের দশক, পার্থক্য কি খুব বেশী? ইতিহাস জানে।

যে গ্রন্থ সকল এই প্রবন্ধ লিখবার জন্যে প্রয়োজন হোয়েছে

১. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দিগদর্শন-রূপরেখা : পশুপতি মাল পৃঃ ২।
২. What is History?—E. H Carr, Pelican Book, পৃঃ ১৯।
৩. দীনেশ চন্দ্র সেন লিখিত 'রামায়ণী কথা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৪. বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কৃষ্ণচরিত্র—সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৪১০।
৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত উপনিষদ গ্রন্থের পাদটীকা, পৃঃ ১৬ দ্রষ্টব্য।
৬. উপনিষদ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৮, হোয়াইট লোটাস পাবলিশিং কোম্পানী।
৭. বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ১৮৮ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
৮. উপনিষদ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ২৩-২৪।
৯. ঐ ঐ পৃঃ ২৭-২৬।
১০. What is History?—E. H Carr পৃঃ ১১।
১১. History of Ancient Sanskrit Literature—Max Muller, পৃঃ ৩৫৩।
১২. উপনিষদ ২য় খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কৌষিতকী উপনিষদের 'সূচনা' দ্রষ্টব্য।
১৩. Philosophy of the Upanishads—Paul Deussen, পৃঃ ১৬।
১৪. উপনিষদ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৩৪।
১৫. What is History?—E. H. Carr পৃঃ ১১।
১৬. Mysticism and Logic—Bertrand Russell, Pelican Book, পৃঃ ২৫।

১৭. উইল ডুরাণ্ট তাঁর 'The Story of Philosophy' বই-এ এই সংবাদ পরিবেশন করেছেন . 'Twelve years he (মানে প্লেটো) wandered ·· some would have it that he went Judea and was moulded for a while by the tradition of the almost socialistic prophets and even that he found his way to the bank of Ganges. We do not know.' পৃঃ ১৩, Cardinal Pocket Book Edition.

ডুরাণ্ট-এর মন্তব্যের শেষ লাইনটি অবশ্য লক্ষ্যণীয়। কিন্তু তারকচন্দ্র রায়-এর 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' ১ম খণ্ডেও এই ধরণের সংবাদ স্টাটফিলডের 'Mysticism and Catholicism' বই-এর পৃঃ ৭৪ থেকে রেখেছেন। স্টাটফিল্ডের বক্তব্যের অনুবাদ এইভাবে রয়েছে : 'প্লেটোর মন অফিক গুহ্যতত্ত্বে পরিপূর্ণ ছিল। এই মতের উৎস এশিয়া। সম্ভবতঃ গুহ্যতত্ত্বের জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতেই ইহা মুখ্যতঃ আসিয়াছিল' পৃঃ ২২৭।

১৮. Portraits from Memory—Bertrand Russell, Clarion edition, পৃঃ ৪০।

১৯. History of Indian Literature—M Winternitz, পৃঃ ২৬৬।

২০. Acton-এর Lectures on Modern History (1906) থেকে কার্-এর 'What is History ?' বই-এ উদ্ধৃতি, পৃঃ ৪৪।

অরুণ ভট্টাচার্য : পিছন ফিরে পুনর্বার

কলসী ভেঙ্গে রাঙা চিতায় জল
ঢালতে কে যে শিখিয়েছিল আমায়,
শিখিয়েছিল, পেছন ফিরে
পুনর্বার তাকাতে নেই।

আজও আমি পিছন ফিরে
চাইতে পারি না।

ভূতগুলি সব অন্ধকারে
হেঁটে বেড়ায়।

আনন্দ বাগচী : অরুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে

পুরণো স্মৃতির গন্ধ বাতাসে নিমফুল এনে দেয়
পৃথিবীর সবচেয়ে নির্জন পায়ের শব্দ
মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমরা হাঁটি
অথচ দাঁড়িয়ে থাকি যে যেখানে
চুপচাপ পাশাপাশি, একা
থেকে থেকে এক আধটা কথা
হঠাৎ ফুরিয়ে-যাওয়া দিনের আঁধারে অবেলায়
কুয়োর কাঁটার মত এক একটা প্রশ্ন যায় তল খুঁজতে
বুকের গভীরে

যেখানে মুখ থুবড়ে আছে দড়ি-ছেঁড়া বালতির মতন
আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের
অসংলগ্ন 'আমি'
কৃষ্ণ-বৈশাখী রাত বাঁকুড়ায় মহাকাল পেঁচার মতই থমথমে
আকাশের জুয়েলারী চোখে পড়ে
পাতা পল্লবের মধ্যে নিশাচর হাওয়া
বাসা ভাঙ্‌ছ, দুপাশেব বাড়িগুলো নিদ্রায় উদ্যোগী
অসম্পূর্ণ আবছা গল্প খোলা-জানলা
কোনটার বন্ধ কাঁচে আলো
সামনে উঁচু রেলব্রীজ নীচে রাস্তা কিংবদন্তী ভরা
ভৈরব স্থানের দিকে হাসপাতালের পথে চলে'
হঠাৎ ফুরিয়ে গেল দিন, নিকটের সব ঝাপসা ক'রে,
চলতে চলতে দেখা গেল মানু'ষর
গোপন দলিল।

বাঁকুড়া
১৮ই এপ্রিল ১৯৭৭

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় : মাছির কুহর ওড়ে

মাছির কুহর ওড়ে মধ্যশহরের ভ্রূমণ্ডলে
ধন্নুকলতার নিচে গাঢ় চুনি, পিঠে অরণ্যেব কারুকাজ,
বসে আছো। শূরভোগ্যা,
রুত হয়ে বসে আছো। অসীম গরবে স্তূপ ভেঙে,
বাজুর শিঞ্জিনী
আলোর মালার মতো তুলে ধরে—সাতমহালের
দুয়োর সশব্দে ভেঙে শেষ মাঝখানে ঢুকে এল
দাঁতাল বরাহ ··

সবাই গোপন হয়ে মুখ গুঁজে বসে আছে
স্মৃতির আড়ালে—
কণ্ঠমালা ছিঁড়ে ফেলে আঁচল লুটিয়ে ছুটে চলে—
পুরবালা, ওগো পুরবালা—
কেউ তাকায় না পিছু ফিরে।

তোলপাড় হেসে ওঠে উচ্ছল গেলাশ, গেলাশের
আকণ্ঠ শরাবে বুদবুদ ওঠে মেয়েলি বুদ্বুদ....
ওগো মেয়ে—
কেন ভেসে ওঠো, কেন পরাগ ভাসিয়ে উড়ে যাও।

বাঘনখ হিমন্ত নিঃসাড়। একশহর মানুষ
বৈশাখি হলক-পোড়া পথ ধরে চলে গেল অশরীর হয়ে
অমানুষ হাওয়া পাক খেয়ে আনাচে কানাচে
কেউ নেই।
শুধু ঘরভরা এক অনন্ত শৃঙ্গার
শুধু অনঙ্গ নিশ্চোথ ঝরে পড়ে আছে বাসি রাত্রিবাস—
আর কেউ নেই।
হিম সেতারের তার, সুরের কাফন ছুঁয়ে ছুঁয়ে
মাছির কুহর ওড়ে।

শান্তিকুমার ঘোষ : এল হ্রস্ব হ'য়ে

কালো কষ্টির পথ
ছায়া ফেলে দুধারের পত্রবহুল গাছতরু
ফাঁক দিয়ে তারই চুঁইয়ে পড়ছে রোদ
রঙ ধরে কুয়াশায়
ক্বচিৎ পথচারী নির্জনতার তপোভঙ্গ করে

দণ্ড কলা পল
এল হ্রস্ব হ'য়ে বেলা
ন্যাখো হে জগৎবাসী
শ্যামশ্রী অঙ্গার ক'রে দিয়ে
অস্ত যায় দিনমণি
নামে অন্ধকার জীবনের দুই তটে

শিশির কুমার দাশ : দুটি কবিতা

বৃষ্টি

সারা রাত্রি বৃষ্টি পড়ে, গাছে গাছে, পাতায় পাতায়
মাটিতে, মাঠেতে, পথে, পাথরে পাথরে
শুয়ে আছে তার নীচে কালো ভালবাসা
তার চারিপাশে
বৃষ্টি পড়ে ফলের গন্ধের মত নরম নিঃশ্বাসে
নীল স্নিগ্ধ কাঁচা ঘাসে ঘাসে

ক্রমশ হিমেল ঠাণ্ডা, সাড়াহীন, ঘন কালো চোখে
ভালবাসা জেগে ওঠে অতি ধীরে ধীরে
ধোঁয়ার মতন হয়ে বৃষ্টির শরীরে
মিশে যায়, মাঠে মাঠে পাথরে পাথরে
সারারাত্রি বৃষ্টি পড়ে, শুধু বৃষ্টি পড়ে।

একটি বৃদ্ধের মুখ

হে শিল্পী, আমার জন্য আঁকো একটি চিত্র
একটি বৃদ্ধের মুখ, মুখে বহু-রেখা
রেখায় রেখায় ইতিহাস
সংগ্রামের ক্ষতচিহ্ন, বহু গল্প লেখা
অনেক অপূর্ণ অভিলাষ
অন্ধপ্রায় দুই চোখ, তবুও পৃথিবী যার মিত্র

এই বৃদ্ধ আমাদের অনেকেরই পিতা
অনেকেই এব কাছে ঋণী
ধূসর কোন এক দিন এ আমাকে ডেকেছিল
অন্ধকাবে। অন্ধকার বড় মায়াবিনী,
উপেক্ষা কবেছি তার গভীর আহ্বান
দুহাতে জ্বেলেছি তার প্রচণ্ড উজ্জ্বল নীল চিতা
হা-হা করে হেসে কেঁদে আমি তার মাতাল সন্তান

হে শিল্পী আমার জন্য আঁকো একটি চিত্র
সেই বৃদ্ধের মুখ, বিরাট ললাটে
বিধাতার জটিলতা, সন্তানের পাপ,
আমাদের ব্যর্থতার রক্ত, অভিশাপ,
যার দুটি চোখে
মৃত্যু এসে মুখ দেখে রোজ,
যার বুকে আনন্দ ও শোক,
যে ভাবে এখনও আমি শুদ্ধ, পবিত্র।

কবিতা সিংহ : বোধ

সকল বোধেই দুয়ার থাকে   খুন দরোজা
দরজা থাকে, নক্সা থাকে—গোলক ধাঁধার
যে ঘুরতে চায় ঘুরুক না সে   ঘূর্ণিপাকে
যে চলতে চায় তার জন্যেই চাবি আছে ?

যেমন দুঃখ   দুঃখ বুঝি দুঃখেই শেষ ?
যেমন সুখের সায়র কেবল ক্লান্ত জাহাজ
ফিরিয়ে আনে ? ফিরিয়ে আনে যেমন হাসি
দুঃখ আবার
দুঃখ ফেরে একা একাই সুখের টানে।

তেমনি তুমি টান দেবে না ?   হাতল ধরে
ঘষবে না কি লোহার উকো—তোমার চাবি
বানিয়ে নিয়ে খুলবে না খুন দরোজাখানি

এবং আবার দরজা খুলেই ফের দরোজা।

সকল বোধেই দুয়ার থাকে পেরিয়ে দুয়ার
পথের দিশা, এবং দিশার পথও থাকে
পথের শেষে আবার থাকে অচিন্ত্যবোধ
বোধের ভিতর একটি আলো—   জ্বলতে থাকে।

ফণিভূষণ আচার্য : জবানবন্দী

বিশ্বাস করো   সূর্যের লূতাতন্তুর মধ্যে আমরা এক হতভাগ্য মুহূর্তে আটকে গিয়েছি   আকাশের ধারে আমরা একমুঠো জীবন নিয়ে গঙ্গাযমুনা খেলছিলুম   রক্তের মধ্যে কে আমাদের ভুলিয়েভালিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে এলো এখানে   এই মদালসা নদী   এই রোদের কারুকাজ এই ফুলের ষড়যন্ত্র   এখানে আমরা জন্মের মতো বাঁধা পড়ে গেছি

এখানে মেঘ আমাদের সান্ত্বনা দেয়,   বাতাসে মিহিন ঘুমপাড়ানি আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব পিছলে যায় সূর্যের রূপোলি লালায় দিগন্তের বেড়া ধরে চাঁদ উঠে আসে   জ্যোৎস্নার শঙ্খশাদা আঁশে আমরা ভুলে যাচ্ছি আমাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি   পূর্বপরিচয়   এখানে আমরা এক অদৃশ্য লূতাতন্তুর মধ্যে চিরজন্ম বাঁধা পড়ে গেছি

মাথার ওপরে সূর্য   সোনালি খড়ে তার মুখখানা ঢাকা ঠিক যেন সদাশয় সিংহের কেশর   রক্তের মধ্যে কে আমাদের ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে এলো এখানে এই চিত্রকূট লূতাতন্তুর মধ্যে   সে আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে   বিশ্বাস করো   এখানেই আমাদের হাজার হাজার বার জন্মমৃত্যু হবে।

শরৎসুনীল নন্দী : অথচ

গোপন করিনি পরিচয়,
তুমি শুধু আপন আড়ালে থাকো স্থির।

বৃক্ষ নতজানু হয়, বলে ওঠে
'এখন আমাকে দাও নবীন বল্কল।'

আমি নতজানু হই, বলি
'আমাকে একমুঠো নবীন কুসুম তুমি দাও।'

অথচ একান্তে তুমি
আপন আড়ালে থাকো স্থির।

বিশ্বাস ভট্টাচার্য : দুটি কবিতা

ঋতু বদল

ঋতু পাল্টায়
কিন্তু একটি দিনের জন্য
বাদ পড়ে না দরে'জার সামনে
হাতপাতা সারবন্দী মানুষের ভীড়
ঋতু পাল্টায়
কিন্তু আমার গায়ে
আজীবন লেগে থাকে ডিসেম্বরের শীত

দরোজাটা খুলতেও ভয় লাগে।

দূরে কাছে

তুমি কাছে থাকলে
বুকে জ্বলে যন্ত্রণার চিতা
দূরে গেলে জন্ম নেয়
আশ্চর্য কবিতা।

গোকুলেশ্বর ঘোষ : সরে যাচ্ছে পাঁচিল

কোন পথ আমি খোলা দেখতে পাচ্ছি না। চোখের সামনে পৃথিবীর একটা বিরাট পাঁচিল উঠে গেছে আকাশ পর্যন্ত। ঐ পাঁচিলের বাইরে বসে যত মাথা ঠোকা যাক না কেন, পাঁচিলের দরজা খুলবে না।

বাইরে মাঝে মাঝে সাগরের ঢেউ এসে পাঁচিলের গায়ে ধাক্কা দেয়। এ-পাঁচিল টপকে যেতে চায় ভাবনা—কতটুকু উঁচু হবে—মাথা তুলে দাঁড়াতে ভেঙ্গে যায়, ধুয়ে যায়।

মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য ফুলেদের কি আশ্চর্য আগ্রহ। ডালপালা নিয়ে তারা আকাশ চুম্বন করতে চায়—অপলক চোখ মেলে তাকাতে তাকাতে ফুরিয়ে যায় দিন।

রাত্রি নামে। তারায় ভরে যায় আকাশ। সাগরের জলকল্লোল ভেসে যায় দূর দূরান্তর, পাঁচিল ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়·· কোথায় যেন ধস নামে··হঠাৎ সব কেমন ভেঙ্গে পড়ে। পৃথিবীর বিরাট পাঁচিলটা সরে যেতে যেতে ফুলগুলি ফুটে ওঠে, কোন ছিদ্রে জলপ্রবাহ, আকাশে পাখীর স্বচ্ছন্দ বিহার, দিন থেকে রাত্রি, রাত্রি থেকে দিন একে একে ফুলের বিষণ্ণ পাপড়ি জুড়ে নিটোল ভালবাসার দুর্জয় সঙ্কল্প, সরে যাচ্ছে পাঁচিল। ভাঙ্গাগড়ার একটা অদৃশ্য হাত মেলে ধরেছে পৃথিবীর বুকে। গ্রীষ্মের খররৌদ্রে, বর্ষার অজস্রধারায় কে যেন ছাতা মেলে ধরেছে, সে হাত হাতে ধরা আছে।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় : ত্রিতালী

(ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর বাজনা শুনে)

ষোলটি হরিণ নাচতে নাচতে
ঘাসমাটি পেরিয়ে
পাহাড়টিলা ডিঙিয়ে
ষোলটি হরিণ।

ধা-ধিন্-ধিন্-ধা

সামনে নদী, চারদিকে রোদ্দুর
ঢেউ কিংবা মেঘ
মেঘ কিংবা ঢেউ
আর সেই ষোলটি হরিণ।

ধা-ধিন্-ধিন্-ধা

স্রোতে পাথরনুড়ির শব্দ
পথে পাহাড়গুঁড়ির শব্দ
জলের গন্ধ বাতাসের গন্ধ ফুলের গন্ধ
আর সেই ষোলটি হরিণ।

না-তিন্-তিন্-না

বৃষ্টির শব্দ গাছের পাতায়
তার তলায় নাচতে নাচতে
সেই ষোলটি হরিণ।

তেটে-ধিন্-ধিন্-ধা—

সমরেন্দ্র দাস : বেসামাল

ঘুমের ওপারে ছুঁয়ে আছে মৃত্যু, এই ভেবে অনায়াসে হেঁটেছি সেইদিকে
সবুজ বনের ভিতর খেলা করে জলবালিকারা
ঐদিকে নয় ব'লে তুমি গেছ উপত্যকার দিকে মন্দিরের চাতালে
আছে ভোজসভা, পা ফেলছ ধীরে ধীবে খুব সন্তর্পণে একা

সব কিছু স্পর্শ করার ইচ্ছে ছিল গোপনে, তুমি তা পার নি
রমণীর বুকে চেয়েছ ফুটুক দরোজা—ফুলেল হাওয়া
মেঘগর্জনে বোঝাতে চেয়েছ প্রাকৃতিক বৃষ্টিধারা, অস্ফুট গান
ব্যর্থ হাহাকারে আজ সবকিছু বিপর্যস্ত—বেসামাল, বেসামাল।

টিলার ওপারে সূর্যাস্ত, তার লাল আভা তোমাকে ছুঁয়ে যায়, আমাকেও।

প্রদীপ মুন্সী : ফেরার পথ

ফিরে যাওয়ার পথ ভীষণ জটিল
ফেরাব পথে বহুদিন কেউ
জল ঢালেনি
বালির কলসীতে কেউ একবিন্দু
জল রাখেনি
তা কি এতই কঠিন কাজ
বনতলে তিক্ত ফাটল
আগুনে আগুন জ্বলে
রক্তে রক্ত ঝরে যায়

প্রদীপ চন্দ্র বসু : শেষ দৃশ্য

শোকমগ্ন অবেলায় সবাই অস্থির
ওপারে যাবার জন্য।
ওপারে উদ্ভিদ প্রেম
দীর্ঘ সমারোহে আজ পেয়েছে স্বীকৃতি
মুখোমুখি
এপারে নিষ্ফলা মাটি, বীজবপনের
অন্তর্জ্বালা নিয়ে কোনো
পুরুষ প্রকৃতি
এখনো ওঠে নি জেগে ;
মধ্যে নদী
রাত্রিদিন ঢেউ ভাঙ্গাগড়া নিয়ে
অনন্তে চলেছে।
নদী বহে যায়
প্রতিবিম্ব ভাসে,
শোকমগ্ন অবেলায় অস্থিব মানুষ
ঘরে ফেরে।

মঞ্জুভাষ মিত্র : নাভি

সেতুর উপর স্তবকে স্তবকে উঠল ফুটে
দিনের প্রথম ফুল। সূর্য ঘুরছে · নৃত্যগুরুর নাভি
সংকেতময় চিত্রবহুল পথে
হে চাকা তোমরা ঘোরো। আমি চলে যাব অমৃতসেতুর নীচে
জলের গভীরে
আলোকধারায় বিশ্ব যেখানে সচল।

নীল পার জুড়ে থরে থরে বসে কালো শকুনের দল
নিদ্রা-আহত মাংসের কাছে জানায় বিনীত দাবী
আমার দুহাতে ধরণীর সরু নাভি,
প্রেমের মাংস। হে মধুর নাভি আমাকে একটু মনে রেখো
আঁধার জলের অরূপ-কুসুম
আমাকে একটু মনে রেখো।

মুরারি শংকর ভট্টাচার্য : নির্বাসনে দিও না

(অরুণ ভট্টাচার্য শ্রদ্ধাস্পদেষু)

আর যাই করো
আমাকে তোমরা নির্বাসনে দিও না এমন
আমি একা একা থাকতে পারি না,

সেই কোন্ ছোট বেলা থেকে
এই বদভ্যাস
দলে দলে কেবল চলেছি
শতদলে বিকশিত হতেই চেয়েছি,

আর যাই করো
আমাকে তোমরা নির্বাসনে দিও না এখন
আমি একা একা চলতে পারি না।

প্রণয় কুমার কুণ্ডু : ইতিহাস

যে জানে, সে কখনো জানায় না নিজে
কস্তুরির জন্ম হলে পাড়া-পড়শীরা টের পায়,
যে জানে সে নিজেকে জানে না কখনো
আকাশ জানে না তার কতো গভীরতা,
বাছা, একটু ইতিহাস পড়ো।

সেই যে গোঁসাইপুরের বেচারাম ঘোষ
যার বহু জোত্ জমি,
কাল রাতে চলে গেছে দশ হাত কাপড়ে,
সেই যে সম্রাট খুড়ো বুড়ো বয়সেও
সাড়ে তিনশো' বেগমের প্রাণেশ্বর ছিল,
কে যেন বল্লে তাকে নিশ্চিত দেখেছে
মৌলালীর মোড়ে,
সেই যে একেব-তিন প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীটে
ইন্দ্রের সভা বসেছিল
এখন যেখানে কাঁদে বেলোয়ারি ঝাড় লণ্ঠন,
উর্বশীর কাশি শোনে বাদুরেরা অশথেব ডালে—
সেই যে তিন ভদ্রলোক রাজা হতে গিয়ে
মাত্র তিন হাত জমি হাতে পেযেছিল,
বাপু হে, বয়ে-সয়ে চলো,
মাঝে মধ্যে ইতিহাস পড়ো।

যে চায় জীবন তাকে এমনি পাঠায়
উদ্যত হাতের চাপে ফোটে না তো কুঁড়ি,
যে পেয়েছে রাজসৌধ পেয়ে'ছ সে রাজপথে হেঁটে—
বীভৎস ফীয়ার্স লেনে হাঁটেনি কখনো,
বৎস হে, ফাঁকে ফাঁকে ইতিহাস পড়ো।

মধুমাধবী ভট্টাচার্য : পথ ভুল করে মৌমাছি

বনফুল ঘরে মৌমাছি
সকাল বিকেলে হারিয়ে যায়
গুন্‌গুন্ গানে ভোমরা কালোয়
পথ ভুল করে মৌমাছি।

ধানের শীষে দুলছে বাতাস
এলোমেলো ওই রেলের বাঁশি
বাউলের সুর প্রান্তরে, হায়
কাঁপছে সন্ধ্যা সাতরঙে।

বনফুল ঘরে গুন্‌গুন্ ওই মৌমাছি।

বিজয় দে : তোমাকে কীভাবে

তোমাব প্রতি যতখানি দৃষ্টি দিলে ভালো হয়, ঠিক ততটুকু নয়
এজন্যে ভেঙে গেল আমাদেব সম্পর্কের রম্যসৌধ, শিলালিপি বা গূঢ়
ধাবাবাহিকতা··
আসলে আমি যতদূর চলে যাই তোমার দিকে ঠিক ততটুকু-ই ফিরে আসি
নিজের ভেতবে, তোমাকে জাগাবো বলে ভেঙে ফেলি, নিজেকে সাজাই—
নির্মম,
অবশ্য তুমি গোছগাছ তেমন ভালবাসো না বলে দূরে চলে যাও, সুদূরে
শুধু নীরবতা পাহারা দেয় আমার জাগরণ।

স্থাপত্যবিদ্যা শিখিনি তাই জানি না কেমন তোমার ঘর, কোন্ ছবি
ভালবাসো, কি রং, কোন্ আয়নায় তুমি স্বস্তি বোধ করো
কি আফ্‌শোষ, কেন যে তোমার সাথে বেড়াতে যাইনি স্টেশানে
জানা হোলো না আজও কিভাবে জানাবো তোমাকে বিদায় সম্ভাষণ।

গৌতম বসু : চিঠি

না হয় অনেকটা দূরে ফেলে এসেছো গল্পের মানুষ
তোমার ভিক্ষুক
আশ্বাসে আকীর্ণ, কবে বছর ঘুরে
তব মাটি ছোঁবে।

আমাদের নাম-লেখা ঘরে নম্র আয়োজন
উৎসব, আলপনায় কিছু খুঁত
মানুষজন,

একে ছুঁয়ে বারান্দায়

অশোককুমার মহান্তী : প্রবীণ কবির প্রতি তরুণ কবি

তোমাকে দেখার আগে ভয় ছিল,
মনকে তৈরী করার কথা ছিল,
প্রস্তুতিও ছিল কম নয়।

তোমাকে দেখার পর ভয় নেই ভীতি নেই,
দূরত্বের ব্যবধান নেই। কৃত্রিম ভদ্রতা নেই।
মনে হল, তুমি যেন আমার মুখর সেই
সত্তায় অপর এক নাম। তোমাকে
এপথে ভালোবাসা যায়
দু'হাত বিছিয়ে ভালোবাসা দেওয়া যায়
নেওয়া যায়

তুমি এলে, আর ভয় নেই
ভাবনা নেই, অমূলক চিন্তা নেই।

ব্যস্ততার খরস্রোতে সময় কাটে না
সময় অলস হয়, একা হয়
সম্পূর্ণ একাকী।

[ঝাড়গ্রাম, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭৭]

অশোক পালিত ঃ জননী ভঙ্গীখানি

কেন ভিক্ষুক হইবার চাহ মন। প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় হস্ত হইতে হস্তান্তরে যাইবার বাসনা কেন। তাহার দুঃখহরণ মুখ তোমার মনে পড়ে না। তাহার বসিবার জননী ভঙ্গীখানি। সে যে কত করুণার, কত পায়ে পায়ে লক্ষ্মীর পথ ফুটাইবার

তাহাকে দেখিলে, আহা, কে বলিবে, স্নিগ্ধ কথাটি কত সুষমা, কত মন-প্রসন্নতার জল অঙ্গে ধারণ করিয়াও এমন নিদারুণভাবে অপ্রতুল। স্বজন পরিজনের সপ্রেম দৃষ্টি কত তাহার অন্তঃকরণে। কে অস্বীকার করিবে, তাহার প্রতি বিভোর মনস্কতায় জীবন উৎসর্গ করা যায় এখনও!

হায়, তবে কেন ভিক্ষুক হইবার চাহ মন! হস্তান্তরিত হইবার দীন ঔপনিবেশিকতা কেন?

চন্দন রায় : গল্প, গল্প

১ এই নির্জন রাস্তায় কেউই থামতে চায় না। পিঠে একগোছা লোহার শিক, ডগায় দুলছে লাল রুমাল, ভাঙা গলায় 'ছ্যাখ্' 'ছ্যা—খ্' বলতে বলতে লজ্ঝড়ে ট্রাকটা চলে গেল, আমরা দেখলাম। দূরে একটা খালি রিক্সা দেখা যাচ্ছে। দু'জোড়া শরীর বইতে রাজী হবে না। একজন ডান হাতের নখে টোকা মেরে বাতাসে পয়সা-ঘুড়ি-হয় বা হাতে-সব-দেখিয়ে বলল, 'হেড না টেল?' বললাম, 'টেল।' হাতের চেটোয় বাঘের মাথা দেখিয়ে ধূপগুড়ির দু'জন হাসতে হাসতে রিক্সায় উঠল। যোগাযোগের কথা মনে করাতে করাতে ছেড়ে গেল দু'টো কবিতার মুখ। মুখোমুখি বেতার কেন্দ্র। একটু আগে সেখানে কবিতা বিক্রী হয়ে গেছে। হিপ্-পকেটে এখন গোপন অস্ত্রের মতো পঞ্চাশ টাকার চেক। পেছনে চায়েব দোকান। একটু আগে সেখানে কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে গেছে। হাতেব মুঠোয এখন প্রকাণ্ড দুর্বলতার মতো বন্ধুব ঠিকানা। একটু আগে-চলে যাওযা বন্ধু বলেছিল, 'চলে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

বাচ্চাদেব দেশলাইট্রেনের মতো এত্তোগুলো নিষ্প্রয়োজনীয কথা জোড়া দিতে দিতে পায়ের তলা গরগর করে কেঁপে উঠল, দুড়দাড করে হাজিব হল ট্রেন। আসা-যাওয়ার চীৎকার ব্যস্ততা এখন বড় খোলাখুলি। ফেরিওযালার গলার বিজ্ঞাপন প্লাটফরমেব এ মাথা ও মাথা কবছে। কেউ কেউ খালি পেটে শুধু শুধু দাম জেনে নিচ্ছে খাবারের। অকালগর্ভা যুবতীব হাত থেকে চেয়ে খাচ্ছে বিস্কুট পুত্রহীনা বৃদ্ধা। শেষ চুমুক দিয়ে হাতের ভাঁড আছড়ে ভাঙছে পরিতৃপ্ত মস্তান।

এইসব প্রচলিত শব্দছবি ভেবে দেখা বা দেখে ভাববার সময় নেই। সাদা পোষাকের মানুষ সবুজ ঝাণ্ডা ওডালে এইসব মিলিযে যাবে। আসা-যাওযার সময় বাঁধা। সময় নেই। ইস্পাতের রাস্তায় দাঁড়িযে ইঞ্জিনটা গলা ফাটিয়ে ডাক দেয় কটুর কাফবীর মতো।

২. ভয়ের গল্প, ভূতের গল্প, রাখ্‌খোস খোক্কোস, ওসব পাল্‌টে নাও, ও ঘুমোবে না, উল্‌টে চোখ টান মেরে খুলে রাখবে। বুঝলে তো, সব উল্‌টে যাচ্ছে। তখনকারগুলোর দিব্‌বি ঠাকুরের ছবি ছুঁইয়ে পেটের কথা বের করা যেত। এখনকারগুলো বাপ-মার শরীর ছুঁয়ে কত কিছু করে যায়। ওইটুকুনি পুঁচকে, খেতেও শিখল না ভালমতো, দেখাদেখি বিশ্রী কাণ্ড করে, 'বলে দেব' 'বলে দেব' বলে ভয় দেখায়। সব উল্‌টে যাচ্ছে। সব পালটে নাও। এর পরেরগুলো দেখো পেটে থাকতেই 'না' 'না' করে চীৎকার করে উঠবে।

হিমাংশু শেখর বাগচী : জীবন

জীবন মানেই বৃত্তের বাইরে
কিংবা বৃত্তস্থ কোনো শিল্পীর কারিকুরি
যেমন সহজেই বটগাছের ঝুরি
মাটির আত্মীয়তার পরমমোহে বাড়িয়ে দেয় হাত
আর সমস্ত যন্ত্রণার
কালঘাম মুছে ছুটে যায় নক্ষত্র, ইতিহাস, সভ্যতা
শুধু ঈশ্বর থাকেন আপনভাবে জেগে

অভিমান সরকার : চলাফেরা

কারুকাজ নষ্ট হোক
চাইনে
অজস্র শব্দের ভিড়ে
ভুল শব্দে নড়ে উঠুক জিভ
চাইনে
স্বরের সুষমায় পরাস্ত হোক
এলোমেলো পথ
পথের দু-ধারে গাছ কেড়ে নিক
বৈশেখী দুপুর
বেলাবেলি সুন্দর হোক ব্যস্ত চলাফেরা।

কেতকী কুশারী ডাইসন : বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রিতদের মধ্যে

বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রিতদের মধ্যে
টুক ক'রে কখন ঢুকে পড়েছে
পাড়ার পাগলী।

বেলফুল, জড়োয়া আর বেনারসীর পাশে
নির্বিবাদে সীট নিয়ে নিয়েছে
নোংরা কানি।

বিড়বিড় করছে, কানি টানছে,
খেয়ালে চেয়ার বদল করছে।
কেউ প্রায় লক্ষ্যই করছে না,
বা আড়চোখে তাকালেও মুখে কিছু বলছে না,
কারণ এ পাড়ায় সে বিশেষ পরিচিত।
কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না,
পাছে সে থান ইট বা নোংরা ছুঁড়ে দেয়।

বন্ধুগণ, আর কত দিন আমরা
পাড়ার পাগলী হয়ে থাকবো
পড়শীদের সহিষ্ণু নীরবতার প্রশ্রয়ে ?

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত : সময় অসময়

ক্রমশ দিনের ঘরে দিন বছরের ঘরে বছর
জমতে জমতে
একদিন নতজানু হয়ে
সময় ভেঙে পড়ে,
দর্পণে তখন মুখের রেখাচিত্র প্রাকৃতিক নিয়মে
ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।

অতঃপর মনে পড়ে একদিন
এই হাতে ধরা ছিল মানচিত্র
অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশের সত্যমুদ্রিত নির্ভুল অবস্থান ;
মনে পড়ে যায় একদিন ভূমধ্যসাগরের
চিরবসন্তে কার মুখ দেখবে বলে
কে যেন নিশান উড়িয়েছিল জয়যাত্রায় ;

ঢেউ ভেঙে ভেঙে
কারচুপিহীন হাওয়ায়
ভেসে ভেসে ভেসে
দিনের ঘরে দিন
বছরের ঘরে বছরকে
জামানত রেখে
ঘরমুখী হয়,

তখন প্রান্ত জুড়ে ধূসর মানচিত্রে
প্রাক্তনে অমিল,
করতল বেয়ে সময় ঝরে পড়ে,
অতঃপর
শিথিল মুঠোয় শুধু অলস প্রহর....।

মার্কিন উপন্যাসের ভাবনা

মার্কিন উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যা পাঠকেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হ'লো মার্কিন ঔপন্যাসিকদের অতীত অস্বীকৃতি, যত্নবান, তীক্ষ্ণদৃষ্টি পাঠক সহজেই লক্ষ্য করতে পারেন যে দেশীয় সংস্কৃতির কোন চিহ্ন মার্কিন উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। নব-আবিষ্কৃত বিরাট মহাদেশেব অতীত স্বীকৃতি পাযনি সাহিত্যে। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে বিতর্কেব অবকাশ আছে, কারণ পাঠক বলতে পারেন ওয়াশিংটন আর্ভিং, ফ্যানিমুর কুপার, অ্যাডগাব অ্যালান পো কিংবা ন্যাথানিয়েল হথর্নেব উপন্যাস-সাহিত্যের কথা, যেখানে পটভূমিক য় মার্কিনী ঐতিহ্যের কোনো সজ্ঞান প্রতিফলন নেই। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন এঁবা কোন্ যুগেব সাহিত্যিক, নিঃসন্দেহে এঁরা প্রথম যু'গর মার্কিন সাহিত্যিক। এবং এঁরা জাতিতে মার্কিন হলেও, এঁদের যাবতীয় সাহিত্যিক কীর্তি ইংলণ্ডীয় ইংরেজী সাহিত্যেবই অঙ্গ। নব-আবিষ্কৃত ভূখণ্ড অ্যামেরিকায় বসতি গড়ে ইংলণ্ডের যে নাগবিকেরা 'নতুন পৃথিবীর' পতাকা উড়িয়েছিলেন প্রথম যুগেব মার্কিন ঔপন্যাসিকেরা ছিলেন সেই সব দেশান্তবী ইংরেজদেরই সাক্ষাৎ বংশধর। এক অর্থে এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন দ্বৈতসত্তা বিশিষ্ট সাহিত্যিক, একদিকে ছেড়ে-আসা দেশ ও হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলোব করুণ স্মৃতি তাঁদের সর্বক্ষণেব সম্বল হয়ে রয়েছে, আর অন্যদিকে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী তাঁদের চঞ্চল করে তুলেছে ক্ষণে-ক্ষণে। কিন্তু তবু আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মানসচাঞ্চল্য তাঁদেব কোনো স্থায়ী চেতনা দান কবতে পারেনি, কোনো নতুন স্বপ্নকল্পনাব রাজ্যে নিয়ে যেতে পারেনি তাঁদের শিল্পীমানসকে। এই অব্যবস্থিত সাহিত্যিক চেতনার সুস্পষ্ট আভাস ফুটে উঠেছে এই যুগের উপন্যাস সাহিত্যের একটা বিরাট অংশে। এই সময়কার রচিত অধিকাংশ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা বা অন্যান্য চরিত্র এই মানসিক টানাপোড়েনেই পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। এই যুগের উপন্যাসে আর যাই থাকুক্ না কেন, নবজাগ্রত মার্কিনী-চেতনার কোনো

সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি নেই, এর জন্যই অধিকাংশ সমালোচকের মতে মার্কিন-উপন্যাস সাহিত্যের অগ্রদূতদের সম্মান এঁদের প্রাপ্য নয়, যথার্থ অর্থে এঁরা ঠিক মার্কিন ঐতিহ্যের ঔপন্যাসিক নন, অতীতের ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও আগামী দিনের ভবিষ্যৎ মার্কিন ঔপন্যাসিক—এই দু'এর মাঝামাঝি এঁদের স্থান। এঁরা ছিলেন মুখ্যতঃ রূপান্তরের কালের ঔপন্যাসিক। তবু স্বীকার করতেই হ'বে যে এঁরাই হচ্ছেন আধুনিক মার্কিন উপন্যাস সাহিত্যের জনক। উদাহরণ হিসেবে আমরা টমাস্ পেনের কথা বলতে পারি; এককালে 'বিদ্রোহী' এই বিশেষণে টমাস্ পেন অভিহিত হয়েছিলেন, কিন্তু, যদিও তার উপন্যাসবলীতে দুর্মর প্রাণচাঞ্চল্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, তবু কোনো বিশিষ্ট চেতনার অভাবে, তিনি কোনোদিন-ই মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেননি।

২

তা সত্ত্বেও ভুললে চলবে না যে এই টমাস পেন-ই মার্কিন সাহিত্যে নতুন পথের প্রথম দিশারী, তিনি তাঁর অপূর্ব প্রবন্ধাবলীতে সর্বপ্রথম নবীন চেতনার আভাস দিয়েছেন—যদিও তা সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠেনি; অথচ তাঁর সক্ষম প্রতিভার সাহায্যে তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক জগতের সিংহদ্বার মার্কিন সাহিত্যকদের সামনে খুলে দিয়েছিলেন এবং এই নতুন চেতনা-ই মার্কিন সাহিত্যকে ক্রমশ উত্তরণের পথে নিয়ে গেছে, আর এই চেতনার ভাষ্যকার হিসেবেই আমরা পেয়েছি ওয়াল্ট হুইটম্যানকে, আমরা পেয়েছি মার্ক টোয়েনকে।

টমাস পেন-এর প্রবন্ধসাহিত্যে যে নবচেতনার বার্তা অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছিল, তা-ই সর্বপ্রথম অভ্রান্তরূপে ধ্বনিত হয়ে উঠলো ওয়াল্ট হুইটম্যানের যুগান্তকারী কবিতাবলীতে। হুইটম্যা'ন মুখ্যত ছিলেন একজন উঁচুদরের বিপ্লবী কবি। তিনি চাইলেন সমস্ত সমাজব্যবস্থারই আমূল পরিবর্তন, এজন্যই তাঁর কবিতায় সহজেই লক্ষ্য করা যায় একটা ভ ভাগড়ার প্রচণ্ড বেগশীলতা। তিনি তাঁর কবিতায় নতুন নিরিখে মার্কিন জীবনকে সাজাতে চাইলেন—সাহিত্যের পুরনো বুনিয়াদকে ভেঙে চুরমার করে দিলেন—সৃষ্টি করলেন নতুন চরিত্র—সাহিত্যের পাতায় অমর করে রাখলেন মার্কিনী জল-হাওয়া-উদ্ভিদ-

নিসর্গ মানুষের অন্তরের কথা। সমাজের নীচুতলার মানুষ সাহিত্যের উপজীব্য হচ্ছে, সাধারণ শ্রমজীবীরাও সাহিত্যসৃষ্টি করছেন—মার্কিন সাহিত্যে এই ধারার প্রবর্তক হচ্ছেন ওয়াণ্ট হুইটম্যান যার জন্ম হয়েছিল সমাজের নীচুতলার অন্ধকারে এক কাঠমিস্ত্রীর ঘরে। আজ পর্যন্তও মার্কিন সাহিত্যে হুইটম্যান-প্রবর্তিত এই ধারা বিচিত্রভাবে সৃষ্টিশীল।

ওয়াণ্ট হুইটম্যানের কল্যাণে মার্কিন সাহিত্যেব সমস্ত বিভাগ-ই এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হ'লো। উপন্যাসের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন মার্ক টোয়েন। মার্ক টোয়েন-এর উপন্যাসবলীতে তাঁর প্রগতিশীল মানবধর্মী চিন্তাধারার সুস্পষ্ট নিদর্শন বর্তমান, তিনি দাস-ব্যবসায়েব বিরুদ্ধে সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে, এই অমানুষিক প্রথার বিরুদ্ধে তাঁব বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর সেদিন প্রেরণা জুগিয়েছিলো সাবা পৃথিবীর মানবতন্ত্রেব পূজাবীদের মনে, আব এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেব শ্বাসরোধকারী বণিকধর্মী বৈশ্য সভ্যতা আর্নেষ্ট হেমিংওয়েকে বাধ্য করেছিলো নিজের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করতে। এইভাবে আমবা দেখতে পাই যে মার্ক টোয়েন প্রবর্তিত মানবতন্ত্রী চিন্তাধারা মার্কিন ঔপন্যাসিকদেব একটা বিরাট অংশকে আজ উদ্বুদ্ধ ক'বে তুলেছে। মার্ক টোয়েন আধুনিক মার্কিন উপন্যাসের পথিকৃৎ।

মার্কিন সাহিত্যের রাজ্যে মার্ক টোয়েনেব পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্যিকদের একমাত্র সাধনা ছিল ইংলণ্ডীয় প্রভাবমুক্তির সাধনা, প্রাক্-মার্ক টোয়েনীয় মার্কিন সাহিত্য এই বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত। মার্ক টোয়েন-ই ইংলণ্ডীয় প্রভাবমুক্ত প্রথম মার্কিন ঔপন্যাসিক, এই প্রভাবমুক্তির জন্য তাঁকে কঠোর সাধনার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। তিনি মূলত বিগত যুগের অতীত-বর্তমানের ধারণাকে অস্বীকার ক'রে এক নতুন অতীত-বর্তমান সৃষ্টি করে এই পথে অগ্রসর হয়েছেন ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে পৌছবার জন্য। অতীত বলতে তিনি বুঝেছিলেন প্রাক্-আমেরিকান গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কে, আর তাঁর বর্তমান ছিলো নানা বিপরীত চিন্তাধারার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিপর্যস্ত উনবিংশ শতাব্দীর জটিলতার বাস্তব রূপায়ন তাঁর উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য, এজন্যই আমরা দেখতে পেয়েছি কানেক্‌টিকাট শহরের যে আধুনিক মানুষ মধ্যযুগীয় পৃথিবীকে চঞ্চল করে তুলেছিলো, তার সঙ্গে মার্ক টোয়েনের গভীর আত্মীয়তা।

৩

সাম্প্রতিক মার্কিন উপন্যাসের ইমারৎ বাস্তববাদের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সাহিত্য যুগধর্মের-ই মানসমুকুর। কাজেই অনিবার্যভাবেই আধুনিক মার্কিন উপন্যাসে, বর্তমান রূঢ় বাস্তব রূপায়িত হয়েছে। মার্কিন সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসই এক অর্থে বাস্তববাদী ইতিহাস। নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের সংঘাত, সংগ্রাম ও তার পরিণতি-ই হচ্ছে আধুনিক মার্কিন উপন্যাসের পটভূমি। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষের সংঘাত ও সংগ্রামের কাহিনীই বিভিন্ন ঔপন্যাসিকেরা স্ব স্ব বিশিষ্ট ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন। একজন সাহসদৃপ্ত, বলিষ্ঠ ও সংগ্রামী মানুষ বিরূপ পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে চায়—বড়ো হয়ে উঠতে চায়, এই সাধারণ ছবিটি-ই আধুনিক যুগের মার্কিন ঔপন্যাসিকেরা বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চান। মার্টিন অ্যারোস্মিথ কিংবা হাকল্‌বেরী ফিন্ অথবা হেমিংওয়েব বৃদ্ধ ধীবর—প্রত্যেকেই এই সংগ্রামী চেতনারই প্রতীক।

সাম্প্রতিক মার্কিন ঔপন্যাসিকেরা বৃহত্তর বা প্রসারিত অর্থে প্রত্যেকেই বাস্তববাদী, সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তববাদের সংজ্ঞা তাঁদের সকলের পক্ষে এক নয়. তাঁরা এক-এক অর্থে এক একজন বাস্তববাদী, বাস্তববাদের ধারণাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সাহিত্যিকগোষ্ঠী, নানা নামে অভিহিত হচ্ছেন বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাহিত্যিকেরা। তাঁদের মধ্যে কেউবা প্রতীকপন্থী, কেউবা রূপকপন্থী আবার কেউবা দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী এইরকম বিভিন্ন নামে অভিহিত হচ্ছেন, আবার এইসব দল ছাড়াও কিছু কিছু ঔপন্যাসিক অন্যান্য ব্যাপারেও একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেউ বা মনস্তত্ত্বের জটিলতা উন্মোচন বা যৌন সমস্যাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করেছেন আবার কেউ কেউ বা সামাজিক সাম্য-অসাম্য ও ঐতিহাসিক সমস্যাবলীকে সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। এভাবে দেখতে পাওয়া যাবে যে আধুনিক মার্কিন ঔপন্যাসিকেরা নানা দলে ও নানা পথে বিভক্ত হয়ে রয়েছেন—অথচ মজার ব্যাপার এই যে এইসব ঔপন্যাসিকেরা প্রত্যেকেই নিজেকে অভ্রান্ত বাস্তববাদী বলে মনে ক'রে থাকেন। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে দু'জন ঔপন্যাসিক, যাঁরা প্রত্যেকেই নিজেকে বাস্তববাদী বলে দাবী করছেন, তাঁরা পরস্পরবিরোধী মতামত পোষণ ও প্রকাশ করছেন একই বিষয় সম্পর্কে, তার ফলে পাঠকদের মনে এক জটিল

বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। সামগ্রিক বিচারে এর প্রতিক্রিয়া মার্কিন সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকরই হচ্ছে। আধুনিক মার্কিন উপন্যাসের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে আজকের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা—লেখক এবং পাঠক উভয়ের তরফ থেকেই। মার্কিন উপন্যাসের ভবিষ্যৎ অনেকখানিই নির্ভর করছে এই সমস্যার আশু ও সুস্থ সমাধানের ওপর।

সাম্প্রতিক বামপন্থী মার্কিন ঔপন্যাসিকদের পুরোধা হচ্ছেন হাওয়ার্ড ফাষ্ট ও পার্ল এস বাক। এঁরা দু'জন-ই গোঁড়া বামপন্থী—এঁদের আন্তরিক সমর্থন কমিউনিজমের দিকে। এদের মধ্যে হাওয়ার্ড ফাষ্ট তো এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও খোলাখুলিভাবেই একজন চরমপন্থী কমুনিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের নানা চরিত্রের ভেতর দিয়ে বিশ্ব-কমিউনিজমের প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতা সম্পর্কে তাঁর মতামত পরিস্ফুট করেছেন তিনি, তবু রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা তাঁর চেতনা যতই আচ্ছন্ন হোক না কেন, হাওয়ার্ড ফাষ্টের ঔপন্যাসিক প্রতিভা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। আধুনিক যুগের মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অদ্বিতীয় কাহিনীকার হচ্ছেন হাওয়ার্ড ফাষ্ট। তাঁর 'স্পার্টাকাস' 'ফ্রিডম রোড' বা 'দি লাষ্ট ফ্রন্টিয়ার' প্রভৃতি উপন্যাস যাঁরাই পড়েছেন, তাঁরাই আজ এ-কথা স্বীকার করবেন। এই সমস্ত উপন্যাসে তিনি মানুষের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকেই শিল্পরূপ দিয়েছেন। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে প্রাচীন রোমের দাসদের বিদ্রোহ হচ্ছে 'স্পার্টাকাস' উপন্যাসের মূল বক্তব্য। সাম্যবাদই মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে, এই কথাই তিনি 'ফ্রীডম রোড' উপন্যাসে বলতে চেয়েছেন, আর 'দি লাষ্ট ফ্রন্টিয়ার' হচ্ছে এক দুরন্ত অভিযানের কাহিনী। স্বাধীন জীবনকে যারা শৃঙ্খলিত করতে চায় আর স্বাধীন জীবনের মূল্য যাদের কাছে প্রাণের চেয়ে বেশী, মানুষের ইতিহাসের এই দুই বিরোধী শক্তির মধ্যে সংঘর্ষের এক আশ্চর্য কাহিনী হাওয়াড ফাষ্টের উপন্যাস 'দি লাষ্ট ফ্রন্টিয়ার'। এইসব উপন্যাস ও অসংখ্য গল্প রচনা ছাড়াও 'লিটারেচার এণ্ড রিয়েলিটি' নামক ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান গ্রন্থে তিনি তাঁর সাহিত্যিক মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্য ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরীয় অভ্যুত্থানের পর থেকে তাঁর মনেও কমিউনিজমের অভ্রান্ততা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে। জানি না বর্তমানে তাঁর মনের গতি কোনদিকে, তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই

যে এই ঘটনা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যময়, হয়তো এখন থেকে তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্যসৃষ্টি সম্পূর্ণ নতুন এক পথে এগিয়ে যাবে।

অন্যপক্ষে একজন নিষ্ঠাবান সাহিত্যশিল্পী হিসেবে পার্ল এস বাক্, হাওয়ার্ড ফাষ্টের চেয়ে অনেক বেশী সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁর রচনায় সাহিত্য কখনো রাজনীতির অধীন হয়নি, বরং রাজনীতি সর্বদাই সাহিত্যের অধীন রয়েছে। এই বিশেষ কারণেই তাঁর 'গুড আর্থ' ও অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাস মার্কিন সাহিত্যে ক্লাসিকের পর্যায়ে উন্নীত হবার সম্ভাবনা রাখে।

৪

রূঢ় ও নগ্ন বাস্তব রূপায়নের ক্ষেত্রে আধুনিক মার্কিন ঔপন্যাসিকদের ভাষা ও রচনাশৈলী সাধারণত (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) অলঙ্কারবর্জিত থেকেছে, সমস্ত ব্যাপারই তাঁরা স্পষ্ট করে, তীব্র করে বলেছেন, ফলে মাঝে-মাঝে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে আর সেজন্যেই শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্ন উঠেছে। তবে সাহিত্যের সঙ্গে শ্লীলতা-অশ্লীলতার সম্পর্ক সীমারেখা কতোটুকু—এই বিষয়ে মত-বিরোধ থাকলেও এটা যে একটা ত্রুটি এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। তা সত্ত্বেও, উপন্যাস লেখকের মানসযন্ত্রণা ও স্বপ্ন-কল্পনারই বিশ্বস্ত প্রতিবিম্ব—এ কথা স্বীকার করে নিলে, এইসব ঔপন্যাসিকদের ত্রুটি অনেকটাই স্খলনীয় বলে মনে হয়। মানুষের যৌনজীবনের বর্ণনার ক্ষেত্রে ড্যাস্ পাসস্ কিম্বা ক্যাল্ডওয়েল যতোটা অসংযমের পরিচয় দিয়েছেন, সিনক্লেয়ার লিউইস বা আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে ঠিক ততোটাই সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, ফলে শালীনতার বাঁধ ভেঙে ফেলে অশ্লীলতা কখনো মার্কিন সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত করতে পারেনি। আর এজন্যেই কোনো মার্কিন ঔপন্যাসিক অশ্লীল সাহিত্য রচনা করেছেন—এই ধরণের অভিযোগ অর্থহীন। তবুও ড্যাস পাসস্ তো শেষদিকে প্রায় ব্যাভিচারী হয়ে উঠেছিলেন। আর ক্যাল্ডওয়েলের যৌনবর্ণনা অনেক পাঠক-পাঠিকার পক্ষেই মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হিসেবে স্কট্ ফিজেরাল্ড স্মরণীয়।

৫

আধুনিক মার্কিন ঔপন্যাসিকেরা একান্তভাবেই সমাজসচেতন। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তব পরিবেশের সমস্ত প্রকৃতি বদলে গিয়েছে—এই সত্য তাঁদের চোখ এড়ায় নি, ঔপন্যাসিকদের এই সমাজ-সচেতনতার ছাপ সাহিত্যে সার্থকভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে এই সব বিভিন্ন পর্যায়ের উপন্যাসের কালানুক্রমিক পাঠে পাঠক-পাঠিকারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের একটি সুন্দর ইতিহাস খুঁজে পাবেন। এইসব উপন্যাসের প্রায় প্রত্যেকটিই সমকালীন বাস্তবের দর্শনস্বরূপ।

সমাজবিবর্তনের সূত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে সমকালকে বোঝা প্রায়শঃই বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়, বিগত অতীতকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যতো সহজ, রূঢ় বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা ততো সহজ নয়। প্রত্যেক কালের যে বিশেষ দর্শন বা চেতনা থাকে, যে সাহিত্যিক উপলব্ধি করতে পাবেন, তিনিই কথাসাহিত্যিক হয়েও সমাজবিজ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন।

কিন্তু অপেক্ষাকৃত সমকালের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ মার্কিন ঔপন্যাসিকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবনদর্শনকে দার্শনিকতার কোনো উচ্চ স্তরে উন্নীত করতে পারেননি, ফলে তাঁদের উপন্যাস ব্যাপকতা সত্ত্বেও প্রায়শঃই স্থান-কালের গণ্ডী পেরিয়ে যেতে পারেনি। এই কারণেই আপ্টন্ সিন্‌ক্লেয়ারের 'অযেল' বা 'জাঙ্গল' বহু গুণ সত্ত্বেও কালবিশেষেরই ইতিহাস—মহৎ উপন্যাস নয়। অবশ্য আদিপর্বে মার্ক টোয়েন এবং উত্তরপূর্বে সিনক্লেয়ার লিউইস ও হেমিংওয়ে তাঁদের উপন্যাসকে মহত্ত্বের মর্যাদা দিয়েছেন সার্বভৌম মানবচেতনা ও গভীরতর জীবন-বোধের গুণে। বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয়ার্ধে মার্কিনী সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম সংকটের দিনেও মার্কিন উপন্যাসের প্রগতিশীল ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে, টোয়েন, লিউইস ও হেমিংওয়ে একই যোগসূত্রে বাঁধা, আর এই সূত্রেই রয়েছে মার্কিন উপন্যাসের সমগ্র ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ।

পরিমল চক্রবর্তী

কবিতা কবিতা

[বাংলা দেশের একমাত্র কলকাতা শহরেই কাব্যচর্চা হয় না, গঞ্জে-গ্রামে, এমন কি যেখানে রেল যায় না বাসও ধূলো ওড়ায় না, সে সব দূর পাড়াগাঁয়েও বহু কবি নীরবে কাব্যচর্চা করে থাকেন। মফঃস্বল শহরেব চটি চটি পত্রিকাগুলিতে তাঁদের কবি-প্রতিভা ও নিষ্ঠার আশ্চর্য স্বাক্ষর থাকে।

এবার থেকে প্রতি সংখ্যায় আমরা বাংলাদেশের অজস্র লিটল ম্যাগাজিন থেকে এমনি সঞ্চয়ন প্রকাশ করব। এই সব কবিতা তথাকথিত বড় বড পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলির চেয়ে কাব্যের প্রসাদগুণে কোন অংশেই খাটো নয়। এবং, এই কবিবা শহরের কবিদের সঙ্গে সমান আসন দাবী কববেন সহজেই। অতি-পরিচিত কবিদের কবিতা প্রকাশিত হবে না। বাংলাদেশে উত্তরসূরি পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম এজাতীয় প্রচেষ্টার সূত্রপাত। স: উত্তবসূরি]

মৃদুল দাশগুপ্ত : বিসর্জন

১.

সে তার মুক্তির জন্য বসে আছে, ফুল্লরা আমার

আজ এই ফাল্গুনবাতাসে পোষ্টম্যানের শাদা হা'ড়, কিছু দাঁত, নখ
এলোমেলো রহস্যের শাদা বাড়ি, কড়িবরগা, শূন্য থেকে দুলতে দুলতে
দুপুরে কাসার শব্দে ঝন্‌ঝন্‌ মনে পড়লো, কবে যেন ছোট্ট, টিলার নীচে
ভার ছিলো মেষপালনের
সবুজ টিবিতে বসে, কথা ছিলো, আসমুদ্র প্রজারঞ্জনের

২.

ভ'ঙ' ঢেউ ভাসিয়ে এনেছে আজ নেপচুনের পানপাত্র
আর চাঁদমালা ,
ভাসে সিন্ধু-মহিষের আঁশ, অঙ্গার, ভাসে ধূসর শরের মতো পোকা
সন্ন্যাসী-কাঁকড়া জাগে ঝিনুক-কংকালে, রাত্রি নামে,
কালো জলে ভেসে যায় মানবীব ছিন্ন স্তন, মানুষের হাবানো আঙুল

৩.

'কে পাঠালো এই ঝর্ণা আমাদের বসন্তবিশ্রামে ?
—জেনে নিতে হবে এই পাথরের ভাষা' ব'লে
রুক্ষ চুল, কাঁধে অস্ত্র, প্রণয়ে দুহাত ভরে তৃষ্ণা মেটালো যে
সে তার মায়ের সঙ্গে পহ্‌লানপুরে থাকতো, কোনো দিন ভাখেনি পিতাকে।

[ধারাপাত, এপ্রিল ১৯৭৭]

ঈশ্বর ত্রিপাঠী : ইরাণীর জন্য

সোমবার থেকে শনিবার প্রতিদিন
আঁকাবাঁকা অক্ষরে দু চার লাইনের আশায়
একজন গম্ভীর মানুষ সম্ভ্রমের বেড়া পেরিয়ে বাইরে দাঁড়ান।

ডাকপিওন ফিরে যায়, তারও চোখে কৌতূহল জাগে
সেই সঙ্গে কিছু মায়া, অকারণ ঈর্শ্বরের উপরে বিরাগ
এমন আকুল চাওয়া কে ফেরায়, কেন যে ফেরায়
এই সব ভাবতে ভাবতে ডাকপিওন ভুলে যায়
অন্যদের চিঠি দিতে হবে।

[দহন, বৈশাখ ১৩৮৪]

মলয় সিংহ : ভাবনা

হয়তো বা তোমাকেই একান্ত নিজের কিছু কথা
হয়তো বা তোমাকেই নদীর জলের সাথে কুয়াশার খেলা
হয়তো বা তোমাকেই, তোমাকেই অন্ধকারে দেখি।

যারা সব পরিচিত ছিলো বয়সে হারিয়ে গেল সব
যারা সব পরিচিত ছিলো ক্ষুধায় কাতর দিনরাত
যারা পরিচিত ছিলো নদীর জলের ঢেউয়ে কোথায় হারিয়ে গেল সব।

হয়তো বা তোমাকেই, তোমাকেই অন্ধকারে দেখি।

[বড়িশা ভট্টাচার্যপাড়া থেকে প্রকাশিত কবিতা বুলেটিন
বৈশাখ, ১৩৮৪]

সানাউল হক খান : এ সব পাখিরা

এসব পাখিরা প্রয়োজনে শিস্ দিলে কাছে এসে বসে,
হাততালি দিলে উড়ে যায়,
এসব পাগল পাখিরা জানে, অভিমান থাকতে নেই, নেই গৃহলতা,
এরা ডিম পাড়ে নীলিমায়
চিরকাল
আড়ালে আবডালে নিজেদের ঘরবাড়ী বারবার ভেঙেচুরে দেয়।
অথচ এরাই শিকারীর চোখ-মুখ-ভুরু ভুলে যায়।
এসব পাখিরা কবি, এরা জানে,
আদরের হাত আর আহারের হাত এরা ফিরিয়ে দিয়েছে বহুবার
এসব পাখিরা কবি, এদের বিষয়বস্তু : সীমাহীন সুন্দরের ধ্যান।

[কিছুক্ষণ, ২য় বর্ষ, রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮৪]

কবিতার ভাবনা (৪)

শরুণ ভট্টাচার্য

· ·'টির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেষ্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতেব Fairy Tales আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম কবিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে। তাদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোন কোন স্থলে মার্টিনের এথিক্স্ এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোটবই বাহির হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল—রাজপুত্র পাত্তরেব পুত্র কোথায় বেঙ্গমা বেঙ্গমী। কোথায়—সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের সাত রাজাব ধন মাণিক।'

এমন সরস কৌতুক, ব্যঙ্গপ্রিয়তা ও তৎকালীন আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের প্রতি কৃপামিশ্রিত কটাক্ষ করা বোধহয় ববীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব ছিল। উপলক্ষ্য ছিল দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদাবের 'ঠাকুরমায় ঝুলি' গ্রন্থের ভূমিকা লেখা। ঠিক সত্তর বছর আগে, রবীন্দ্রনাথ তখনও নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন নি, সাহিত্যের স্কুলে কড়া অভিভাবকের স্থান নিয়েছিলেন। নইলে, এমন তীব্র ভাষা প্রয়োগ করতে পারতেন না, এবং বাংলা দেশের তদানীন্তন সাহিত্য-সেবীরাও সহ্য করে যেতেন না। ধাঁধার মতই, আমি ঠাকুরমার ঝুলি নামটি, গোড়াতে উল্লেখ করিনি। এই রচনায় পাঠকবা পাদপূরণ করতে পারবেন, কি একটু ভাববেন—একথা মনে করে।

আমার এই ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে আসছে যে শৈশবকালই একজন কবিকে গড়ে তোলে। একসময় কবিতার বই-এর নাম দিয়েছিলুম 'সমর্পিত শৈশবে'। সেই থেকে আজো পর্যন্ত, চোদ্দ বছর পরেও, ধারণা ক্রমশই দানা বাঁধছে। কবিতা বিষয়ে যখনই কিছু ভাবি, কবিতা লিখতে যাই, ভাব অনুষঙ্গ, আমার কাছে অন্তত শৈশবকালকে কেন্দ্র করে ঘটে। তার মানে এই নয়, পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা, দেখাশোনা, নানা করুণ রঙিন কাহিনী কিছু নয়। অবশ্যই সেগুলি আমারও কবিতার জগতে মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু

মনে হয়, শৈশবকালেই যেন একটা নিশ্চিত 'ছাঁচ' তৈরী হ'য়ে যায়। সেই ছাঁচটির 'পরেই সব অভিজ্ঞতা এসে মেশে, খাল বিল যেমন নদীতে যায়, নদী যেমন সাগরে মেশে।

'ঠাকুরমার ঝুলি'র দেশ একান্তই বাংলা দেশের। এখন যখন চৌরঙ্গীর ফুটপাথে য়ুরোপের কোন কোন দেশের শিশুসাহিত্যের রূপকথার বইগুলি দেখি তখন ভাবি 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পগুলিও রূপকথা—ওদের দেশেরগুলিও রূপকথা! প্রসঙ্গত fable গুলি পড়লে পার্থক্য আরো সহজে ধরা পড়ে। কথামালার সবচেয়ে নিকৃষ্ট গল্পও ওই বইগুলির উৎকৃষ্টতম গল্পের চেয়ে প্রাণবন্ত, রসালো। কারণ খুব সহজ। ওই সব দেশে আধুনিককালে সরকারী দপ্তর লেখকদের লিখতে বলেছেন—লেখো হে, এমন fable যাতে ছেলেরা রাষ্ট্রের প্রতি সদাসর্বদা অনুগত থাকে—কোনদিন কোন সমালোচনাই যেন তারা না করতে পারে এমন মনোভঙ্গিটি ছোটবেলা থেকেই তৈরী করে দেও। হয়ত একথা স্পষ্ট করে বলে না, কিন্তু লেখাগুলির streamline, তিরিশ-তলা-বাড়ির সাজানো আঙ্গিক দেখলেই ধরা পড়ে যে বিশেষ কোন ইঙ্গিত কাজ করছে অগোচরে। এখানে অসম্ভবকে রসের মণিকোঠায় ধরে রাখার কৌশল জানা নেই, বুদ্ধু ভুতুম, বা শিয়াল পণ্ডিত যা আমাদের কাছে অবাস্তব নয়—প্রত্যক্ষ জীবন্ত, সেই কাহিনী ওদের জানা নেই।

ঠাকুমা আমার খুব ছোটবেলায় মারা যান। তাঁর কাছে গল্প যদিও বা শুনে থাকি, মনে নেই। আমার ঠাকুমার বড় জা ছিলেন, বাবার জেঠীমা। ডাকতুম মম্মা বলে। রাত্রে তাঁর কাছে আশ্রয় নিতুম, বিশেষ করে সারা রাত্রি তিনি হাত-পাখা চালাতেন (ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও!), গায়ে পিঠে হাত বুলোতেন। সে সময় আমাদের বাড়িতে বিদ্যুৎবাতি ছিল না। তবুও তাঁর কাছেই প্রথম ছড়াবটে করে গল্প শুনি। সেইসব অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত কাণ্ড। আনন্দ-বেদনার বোধ তখন হবার কথা নয়, হয় মজা পেতুম, নয় ভয়। লকলকে জিভের ছবিটি সামনে ভাসতো। নীলকমল আর লালকমল কাহিনীর রাক্ষসী-রাণীর জিভ লাল, 'কবে সতীনের ছেলের কচি কচি হাড়-মাংসে ঝোল অম্বল রাঁধিয়া খাইবে, তা পেটের দুষ্টু ছেলে সতীন-পুত্রের সাথ ছাড়ে না। রাগে রাক্ষসীর দাঁতে-দাঁতে কড়্ কড়্ পাঁচ পরাণ সর্ সর্'—এইসব বর্ণনাগুলি

যখন গল্পে শুনতুম তখন কী যে মনে হতো। সারা শরীর অবশ হয়ে আসতো, শির শির স্নায়ুতে। জোর করে চোখ বুজতুম। অথচ সেই গল্পের এমনি নেশা, একবারও বলতুম না, থাক, আর শুনবো না।

দক্ষিণারঞ্জন তাঁর গ্রন্থের নিবেদনে জানাচ্ছেন 'একদিনের কথা মনে পড়ে, দেবালয়ে আরতির বাজনা বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে, মা'র আঁচলখানির উপর শুইয়া রূপকথা শুনিতেছিলাম।' দক্ষিণারঞ্জনের মত আমরাও, ঠাকুমার কাছে নয়, মা জেঠীমার কাছেই রূপকথা শুনেছি বেশি। 'মার মুখের এক একটি কথায় সেই আকাশ-নিখিল ভরা জ্যোৎস্নার রাজ্যে, জ্যোৎস্নার সেই নির্মল শুভ্র পটখানির উপর পলে পলে কত বিশাল "রাজ-রাজত্ব", কত "অছিন্ অভিন্" রাজপুরী কত চিরসুন্দর রাজপুত্র রাজকন্যার অবর্ণনীয় ছবি আমার শৈশব চক্ষুর সাম্নে সত্যকারটির মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। · পড়ার বইখানি হাতে নিতে নিতে ঘুম পাইত, কিন্তু সেই রূপকথা তা'রপর তা'রপর তা'রপর কত রাত জাগাইযাছে। তা'রপর শুনিতে শুনিতে শুনিতে শুনিতে, চোখ বুজিয়া আসিত, সেই অজানা রাজ্যের সেই অচেনা রাজপুত্র সেই সাতসমুদ্র তের নদীর ঢেউ ক্ষুদ্র বুকখানির মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে খেলিয়া বেড়াইত,— আমার মত দুরন্ত শিশু।—শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।' এই কথাগুলি কি দক্ষিণারঞ্জনের একলার কথা। মনে তো হয় না। সারা শিশু জগতের মনের কথা। চিরকালের দেশে দেশের শিশুদের একই স্বপ্ন, একই কৌতূহল, একই উৎকণ্ঠা, একই অজানা রহস্যের প্রতি আকর্ষণ। শুধু গল্পের বাঁধুনি দেশে দেশে ভিন্ন, চরিত্র ভিন্ন।

আর দেখা যাক বলবার ভঙ্গিটি কি। বলতে বলতে সব সময়েই যে শিশু আগে ঘুমোতো তা নয়। আমাদের মনুমার হাতপাখা বন্ধ হয়ে যেত, তাঁর চোখ মাঝেমধ্যে জড়িয়ে আসতো ঘুমে। দুরন্ত শিশুর বড় বড় ডাগর ডাগর চোখ তখন কোন্ সুদূর রহস্য জগতে। সে ঘুমোয়নি। ঘুম কি আসে—রাজপুত্র যে রাজকন্যার জন্য গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়েছে—ডুব দিয়ে রাজপুরীর ভেতরে ঢুকে সিঁড়ির পর সিঁড়ি, তারও পরে সিঁড়ি ভেঙ্গে কোন বন্ধ দরজায় আঘাত করছে—সেসময় ঠাকুমার ঘুম এলে দুরন্ত শিশু শুনবে কেন। সে বলছে, তারপর—তারপর। এই তারপর-এর শেষ নেই।

'তারপর হোল কি'—'যেই না রাজপুত্র'—আবার হয়তো ঠাকুমার চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু শিশুর কাছে নিস্তাব নেই। শিশু ঘুমোবে তখন যখন রাজপুত্র রাজকন্যাকে পাতালপুবী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে নিজেব রাজপুবীতে। তখন তাব ভয শঙ্কা মিটবে, রহস্যেব সমাধান হবে, নিশ্চিন্ত হ'যে মা ঠাকুমাব হাতে মাথা বেখে ঘুমোবে।

চন্দ্রশেখব মুখোপাধ্যায় সেই যে বলেছিলেন, এখানে (শ্মশানে) আসিলে সকলেই সমান হয়, আব এক ইংরেজ কবি লিখেছিলেন Death the leveller, রূপকথাব রাজ্যে গেলেও তাই। এখানে দাসদাসীব ছেলে, মন্ত্রী সেনাপতির ছেলে, বাজবাণীর ছেলে—সবাই সমান। রূপকথার জগতেব মত এমন সাম্যবাদের দেশ আব কোথাও সত্যি খুঁজে পাওযা যাবে না। দক্ষিণারঞ্জন সেই দেশের সন্ধান দিয়েছেন আমাদেব। আমরা বড হয়েও, যখন জানি এর কিছুই হযত সত্য নয়, যখন 'রিয়ালিজমের' প্রকাশ কাব্য-সাহিত্যে দেখতে না পেলে আমরা তাকে জাতসাহিত্য বলতে রাজী নই, তখনও কিন্তু নির্জন একাকীত্বে এই বই হাতে পডলে অন্য বই পড়তে মন যায় না—সেই 'unreal' জগতেই মন ঘোরাফেরা করে। প্রায় সাত আট বছর আগে 'এক্ষণ' পত্রিকার কোন একটি শারদীয়া সংখ্যার 'কিম্বদন্তী রাজকন্যার দেশে' বলে একটি কবিতা লিখেছিলুম, ঐ কবিতা সেই শৈশবেরই স্মৃতিচারণ। কবিতাটি আমি হারিয়েছি, হাতের কাছে 'এক্ষণ'-এর সংখ্যাটিও নেই—কবিতাটি যে খুব ভালো হয়েছিল তাও মনে হয় না, কিন্তু লেখবার সময় মন মশ্‌গুল হযে ছিল—এটা বেশ মনে আছে। যেন একটা জগৎকে ধরতে চেয়েছিলাম—যে জগৎ আমার কাছে আর ফিবে আসবে না—তবু তারই গল্প তারই স্মৃতি সব জমা হয়ে থাকবে আমাবই একান্তে। এখানে আমার কোন শরিকের প্রযোজন নেই, আমি একলা থাকতে চাই। থাকতে চাই কবির স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসনে।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে মোহিতলাল বা সুধীন্দ্রনাথে রূপকথার জগৎ অনুপস্থিত। প্রথম জীবনে প্রেম, দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবন জিজ্ঞাসা—এই দুই গূঢ় গভীর অতি সিরিয়াস কাব্যধর্মিতার মাঝে রূপকথার রাজ্য কোথাও উঁকি ঝুঁকি দেয় নি তাঁদের কাব্যে। বিশেষত সুধীন্দ্রনাথের কবিতা শেষের

দিকে, বিশুদ্ধ মননধর্মিতা ও দেশকাল-নিরপেক্ষ pure idea বা pure reason (কাণ্ট কথিত ?) এর ছান্দোবদ্ধ ভাষ্য। আমি তাঁর ভক্ত পাঠক, একথা বহু আলোচনা-সভায় বলেছি, অনেক প্রবন্ধে লিখেছি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার এই ক্ষোভ, তিনি আমাদের, কবি হিসেবে, খুব কাছের মানুষ ছিলেন না (ব্যক্তিগত জীবনে যদিও দত্ত-দম্পতি আমার খুবই কাছের মানুষ ছিলেন, আমি তাঁদেব ছুটি নৌকোয় পা দিয়ে জলের ধারা গায়ে মেখেছি, কাব্য ও সংগীতের)। জীবনানন্দ 'চৈতন্য' নামক বস্তুকে চিনিয়ে দিলেন, মননের পরিবর্তে—তিনি আমাদের কাছে চলে এলেন বাংলাদেশের প্রকৃতিকে মনের সামনে চোখের সামনে স্পর্শ গন্ধ যাবতীয় ইন্দ্রিয় দিয়ে মাখামাখি করে—কিন্তু তবুও তিনি রূপকথার জগৎ থেকে কিছু আহরণ করলেন না। বুদ্ধদেব পারতেন, তাঁর মানসিকতা সেদিক থেকে প্রস্তুতও ছিল—কিন্তু তিনি প্রধানত মানুষী প্রেমের জৈব প্রেমের কবি—শেষ জীবনে মহাকাব্য থেকে অনেক আহবণ কবেছেন। কিন্তু অজিত দত্ত পেবেছেন। তাঁর আলোচনায় পরে আসছি। শুধুমাত্র 'কুসুমেব মাস' নামটিতেই আমার বক্তব্যের সমর্থন মিলবে।

সেই সময়ে আর মাত্র অমিয় চক্রবর্তীব কবিতার কিছু কিছু আভাষ পাই এই জগতের। পুরোপুরি রূপকথা থেকে আহরিত নয়, কিন্তু মনে হয় যেন সেই জগতে যেতে চান তিনি, সেই রহস্যময়তায় :

'দূবে বুড়ো বট ঝিমন্ত-জাগা,
ঝাঁ ঝাঁ বোদ লাগা,
একটু হাওয়ার মন্ত্র

আবার একটু বাদেই

ঝনঝন করে সৃষ্টি সুদ্ধ ভাঙছে, গড়ছে, চলছে—
কোথায় তুমুল শব্দ (আয়না)

'ঝিমন্ত' বট, 'ঝনঝন'—এই সব শব্দে কিসের ইঙ্গিত ?

এই কবিতায় সেই পরিবেশ, অনুষংগ তৈরী হয়েছে বলেই তো আমার মনে হয়। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় একটা খ্যাপা ঘরছাড়া বৈরাগীর চিত্র বারবাব ফুটে ওঠে, সেই ঘরছাড়া বৈরাগী কখনো কখনো বাংলাদেশের কবি কখনো বিশ্বপথিক, কখনো 'unreal'-এর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। সেই সব দুর্লভ

মুহূর্তে তাঁর কাব্যে বেজে ওঠে রহস্যের সুর—তখন আভাষ পাই গল্প বলার—সেই গল্প রূপকথারও হতে পারে নাও হতে পারে, কিন্তু মেজাজটি সেই রূপকথারই

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি। (চিরদিন)

লক্ষণীয়, 'যাই' ক্রিয়াপদ নয়, শব্দটি 'যেই' অর্থে ব্যবহৃত। এরকম ব্যবহার রূপকথার অসম্ভবের রাজত্বেই সম্ভব। এই বলা আব শোনা—হয়ত প্রেমিক-প্রেমিকার—কিন্তু 'দিনের কাহিনী' আর 'বাত চন্দ্রাবলী'র সাযুজ্যে এক স্বপ্নের জগৎ অমিয় চক্রবর্তী তৈবী করেছেন নিঃসন্দেহে—যে জগতের সন্ধান তাঁর সমকালীন আর কোন কবি দিয়েছেন বলে মনে তো হয় না, অজিত দত্ত ছাড়া। আবার কোথাও বর্ণনা

কুমুদ কহলাব ভাসে থৈ থৈ জলে,

আহা, এমন পংক্তি সমস্ত বাংলা কবিতা ঘেঁটেও পাঠক তো সহজে পাবেন না। এই পংক্তি বিশ্লেষণেব বাইরে—এর ব্যঞ্জনা শুধুমাত্র রসিকের। চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে হয সময়ের পর সময়—আর পরেব পংক্তিতে যেতে ইচ্ছে হয না।

বাঙ্গালী বড় হুজুগে—এ অভিযোগ অনেক দিনের। কবিতাব জগতেও যে কীরকম তা একমাত্র প্রমাণিত হয় যখন দেখি জীবনানন্দের পাশে আমরা আর সব কবিকে ম্লান কবে বেখেছি। অমিয চক্রবর্তীব কথা বুদ্ধদেব গল্প বলতেন, নরেশ গুহ বলেছেন, দীপ্তি ত্রিপাঠি তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন—কবিতা-পাগল অশোক মিত্র জীবনানন্দ অমিয় চক্রবর্তীব কবিতার পর কবিতা মুখস্থ বলে যেতেন—এই, আর কে? তাকে ভালোবেসেছেন বলে তো আর বিশেষভাবে কোন কবিকে আমি অন্তত জানি নে [আমার বন্ধু ভুবন বসু ছাড়া—তিনি কবি নন, কবিতার একান্ত পাঠক, আর কবি কল্যাণ সেনগুপ্ত কাটিহারের—'এই অল্প ক'জন তাঁর ভক্ত পাঠক সারা বাংলা দেশে। জগদীশদা,

কবি এবং অধ্যাপক, তাঁর বেশ কিছু কবিতা তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন।] অবশ্যই এই নামগুলি শুধু আমার পরিচিত মহলের মধ্য থেকে বাছাই-করা।

এ প্রসঙ্গে একটু ব্যক্তিগত কথা বলি। পাঠক ক্ষমা করবেন ('কবিতার ভাবনা' রচনাটি অবশ্য আগাগোড়াই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ, এ লেখার কোন পরিকল্পনা নেই। যখন যেমন মনে আসে, লিখি, চিন্তার free association যাকে বলে, আমার পরম সুহৃদ মনস্তত্ব জগতের খ্যাতিমান বন্ধু হিরণ্ময় ঘোষাল এ জাতীয় লেখাকে খুব মূল্য দেন—আমাকে লিখতে অনুরোধ করেছিলেন একদা, এই সব লেখার non-plan-টাই plan)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোন শহর থেকে Prof. David Appelbaum আমাকে একটি আমন্ত্রণ[১] পাঠিয়েছিলেন এপ্রিল মাসে, ১৯৭৬ সালে। আমন্ত্রণটি ছিল একটি symposiumএ যোগদানের জন্য।'The Moral Vision of Modern India Tagore and Gandhi' এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় মিলে এর আয়োজন করেছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তীকে সম্বর্দ্ধনা দেবার জন্য।

আমরা কি অমিয়বাবুর জন্য কিছু করেছি—ভারতবর্ষ দূরের কথা—এই হতভাগা বাংলা দেশে। হুজুগে কলকাতা শহরে—যেখানে দুধের দাঁত-ওঠা শিশু কবিকে নিয়ে মাঝে মাঝে হৈ চৈ দেখতে পাই। আমরা অতি সহজে ট্রাডিশনকে ভুলি, ইতিহাসকে ভুলি—ভাবি আমরা তো নিজে নিজেই কবিতা লিখতে শিখেছি। কারো কাছে আমাদের ঋণ নেই—আমরা প্রায় স্বয়ম্ভু। বলাই বাহুল্য, এগুলি আমার ব্যক্তিগত ক্ষোভের কথা—তাই একটু তিক্ত।

সেই অনুষ্ঠানের নাম ছিল A Symposium Honouring the Poetic Statesmanship of Amiya Chakravarty May 7-8, 1976. ওঁদের আমন্ত্রণ পত্র এবং অমিয় চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত চিঠি যখন পেলাম বুঝতে দেরী হ'ল না যে আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার পেছনে রয়েছেন কবি স্বয়ং। এটি তাঁর স্নেহের, ঔদার্যের স্বাক্ষর। আমন্ত্রিত হলেও সেখানে যাবার প্রশ্ন ওঠে না আমার মত ছাপোষা কবির। সুতরাং কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আমার ইংরেজী গ্রন্থ Dimensions থেকে এই লাইন কটি (অংশবিশেষ) চেয়ারম্যান Prof. Appelbaum-এর কাছে পাঠাই :

'Amiya Chakravarty was closely associated with Tagore

as his secretary for a time, and obviously shared his spirit, along with the poet, that was responsible for building up of Santiniketan. Evidently, one would expect this younger poet writing along the tradition set forth by Tagore himself.

Things happened otherwise. True, he inculcated the best of Tagore's ideas through his own literary exercises, but the form he chose for his poetic expression was completely different from that of Tagore's. His poems, included in *Durjami* or *Abhijnanbasanta* reflected a typically modern mind in his use of expressions, and idioms. One might even draw some palpable similarity between some of these poems with those of E E. Cummings', at least in structural design

To critics searching for a philosophical understanding of his poems, one might get at some idea of a certain type of existentialism. This, to my mind, can not be equated with that kind of philosophical realism with which the term existentialism is correlated Amiya Chakravarty retains the essential Indian spirit within the broad texture of his universal mind. The poet is perhaps happy and complacent with the positive role of mankind 'astivada', which might be a near substitute of the western term 'existentialism' ..

Life has been, to Amiya Chakravarty, a fragmentary episode. Mixed up with this feeliing, there is a sense of transitoriness. But he has been able to draw immense zest for life. Even in such a broad canvas he has observed

minute details and noted down the 'magic casements' all around…

[Dimensions p. 94-96]

সিম্পোসিয়াম কমিটির চেয়ারম্যান-অধ্যাপককে যে লেখাটির অংশবিশেষ পাঠিয়েছিলুম, তারই খানিকটা ওপরে উদ্ধৃতি দিলুম এই মনে করে যে উত্তরস্মৃতির পাঠকগোষ্ঠীর অনেকেরই আমার Dimensions গ্রন্থটি হয়ত পড়া নেই। লেখাটি পাঠিয়ে মনে সান্ত্বনা এলো এই যে আমার সামান্য রচনাটি অন্তত এঁদের Felicitation file-এ জমা থেকে যাবে। এবং অমিয় চক্রবর্তীর বিশ্বজোড়া সম্মান-অনুষ্ঠানে আমারও যৎসামান্য ভূমিকা থাকবে। অন্তত কবি যে খুশি হবেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না (১৯৪৪-৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ক্লাশে এই কবি ছিলেন আমাদের মাষ্টারমশাই—জেনারেল ক্লাশে পড়াতেন রোমান্টিক পোয়েট্রি—টিউটোরিয়ালে পড়াতেন মডার্ণ পোয়েট্রি, এবং বলা বাহুল্য, জাত-কবির স্বভাব অনুযায়ী, ক্লাস নিতেন খুবই অনিয়মিতভাবে। এজন্য আমাদের অভিযোগের অন্ত ছিল না। এখন আমারও যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, অভিযোগের জন্য নিশ্চয়ই বকুনি খেতে হবে না। কিন্তু এই কবি অধ্যাপক ছাত্রদের কোনদিনই তুমি করে বলতেন না, এখনও বলেন না। স্বর্গত আচার্য সুনীতিকুমারের কথা তো সবাই জানেন, না নিতেন প্রণাম এবং ছাত্রের ছাত্রদেরও আপনি ছাড়া সম্বোধন করতেন না, আমরা সব সময়ই লজ্জায় মরে যেতুম)।

কিন্তু সিম্পোসিয়াম শেষ হবার ক'দিন পরেই কবি অমিয় চক্রবর্তীর একটি ব্যক্তিগত চিঠি এলো আমার কাছে। শুধু বিস্মিত হলুম না সেটি পড়ে, অভিভূত হলুম। উনি লিখেছেন আপনি শুনে খুশি হবেন আপনার ছোট্ট লেখাটি সিম্পোসিয়ামের চেয়ারম্যান Prof. David Appelbaum উদ্বোধনী দিবসে নিজেই পড়েছেন। আপনার লেখাটি বহু প্রশংসিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সভা শেষে অনেক তরুণ অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী Prof. Appelbaum ও আমার কাছে আপনার বিষয়ে জানবার জন্য এসেছিলেন', ইত্যাদি ইত্যাদি।

খুশি তো আমার হবারই কথা। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কবির একজন ভক্ত পাঠক এই শ্রদ্ধার্ঘ পাঠালো তাতে আমেরিকার জনগণ যে কবির প্রতি আরো শ্রদ্ধান্বিত হলেন একথা ভেবেই আমার মন সেদিন ভরে উঠেছিল।

হয়ত আমার মতো 'তাঁর কাছের মানুষ' আরো কেউ কেউ তাঁর বিষয়ে লিখে থাকবেন এই অভিনন্দন সভায়। প্রকৃতপক্ষে, এমন একটি মানুষকে, কবিকে আমরা বাংলাদেশের কবিরা, যথোচিত মর্যাদা দিই নি। সেই সম্মান উনি বিদেশ থেকে পেলেন আগে। [অবশ্য একাদমী পুরস্কারের সম্মান তিনি পেয়েছেন] এর জন্য হয়ত আমাদের একদিন আফশোষ করতে হবে। এরকম নজির আমাদের দেশে তো কম নেই। শরৎচন্দ্রকে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁর জীবন-সায়াহ্নে যথোচিত সম্মান দেখিয়েছেন, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ তাঁর জীবন-সায়াহ্নেও কি সচেতন হয়েছিলেন? যেমন কচি-কাঁচা লেখককে নিয়ে অযথা হৈ চৈ করা অশোভন, তাতে তাঁদেরই সর্বনাশ করা হয়, তেমনি যিনি সম্মান দাবী করেন তাকে প্রাপ্ত বয়সে যথাযোগ্য সম্মান না দেখানও অন্যায়। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বা সরকারী কর্তৃপক্ষ যেন মনে রাখেন, কবিকে শিল্পীকে গুণীজনকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে তাঁরা নিজেরাই সম্মানিত হন। প্রকৃত কবি, শিল্পী তাঁদের পাঠক, দর্শক বা শ্রোতার হৃদয়ে চিরকালের আসন নিজেই আদায় করে নেন।

অনেক এলোমেলো কথার প্রসঙ্গ এলো। রূপকথা থেকে কত দূর সরে এলাম—এজাতীয় লেখায় এই দোষ—এতো কথার ভীড় মনের মধ্যে হুড়মুড় করে আসে চৈত্র শেষের দমকা হাওয়ার মত। রূপকথা উপকথা অমিয় চক্রবর্তীকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে এমন কথা আমি বলিনে, কিন্তু তাঁর কবিতায় হঠাৎ হঠাৎ এমন সব শব্দ, এমন চিত্র, এমন অনুষংগ এসে পড়ে যে দরদী পাঠককে ওই দেশে নিয়ে যায়, ক্ষণিক মুহূর্তে যেন আমরা কোন্ অজানা পুরীর সন্ধান পাই। যেমন উড়িষ্যার একটি ছোট্ট স্টেশন—নামটি মালতী-পাটপুর। সেখানে ট্রেন থেমেছে হঠাৎ। 'ওড্র'দেশের এই ছোট্ট জনবিরল মালতীপাটপুর ইস্টিশনটি কবির যেন রূপকথার রাজ্য। এই 'ওড্র' শব্দটি পাঠক লক্ষ্য করুন। এই ওড্র দেশের মালতীপাটপুর ইস্টিশনের কাছে 'সোঁ সোঁ শব্দ কি দূর সমুদ্রে। স্বপ্নের বালি ?—' এবং এমনই একটি কবিতা 'দিঘি'।

সোনালি দোলে ঝিনুক তল
মুক্তো ঝলক
আরো গহন আলোর নীল।

এই তিনটি পংক্তির সব কটি বিশেষ্য, বিশেষণ রূপকথার গল্পে চলে আসে। 'ঝিনুক' 'মুক্তো' এসব ছাড়া তো রূপকথাই হয় না। ঠাকুরমার ঠাকুরদার ঝুলির গল্পই বলা হয় না। 'সোনালী' বা 'গহন' অথবা 'আলোর নীল' এমন আভাষ সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের স্মৃতিতে জাগিয়ে তোলো কিসের যেন ইংগিত।

মধুকোরকে মুকুলরাশি/কমলদল নেই

মনে হয় যেন এমন কবিতাকে এমন শব্দচয়নে কেন যে রূপকথার গল্প লেখা হয় না। আর একটি কবিতায় দেখছি

টিপ-পরা চন্দ্রা রাত উঠেছে তন্দ্রাণী (লিরিক-কণিকা)

অথবা

সুতো-জরি দেয় তাকে রুপোলি ইঁদুর (হারানো অর্কিড)

সবশেষে যে কবিতাটি পুরোপুরি রূপকথার রাজ্যে নিয়ে যায় তা অবশ্য, বিষয়-অনুযায়ী, খ্যাপা বাউলের গান। কিন্তু কবিতার কয়েকটি পংক্তি পড়া যাক

গহিন জলে লুকিয়ে চলে আমার জাগর চাঁদ
ছলছলিয়ে কালো ঢেউয়ে উপচে পড়ে বাঁধ
অগাধ পূর্ণিমায়

আর এই ভরা পূর্ণিমায় 'উজল কাজল রাত পারায়ে' কবি ভোরবেলার কাছে যেতে চান।

আমরাও কবির সঙ্গে তাঁর নিজস্ব জগতের সন্ধানে ঘুরে মরি। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় যখন রূপকথার অনুষংগ আমাদের সচকিত করে, অজিত দত্ত সেখানে পুরোপুরি রূপকথার রাজত্বেই নিয়ে যান

যেখানে রূপালি ঢেউ-এ দুলিছে ময়ূরপঙ্খী নাও,
যে-দেশে রাজার ছেলে কুমারীরে দেখিছে স্বপনে

সেই দেশে অজিত দত্ত কত অনায়াসে আমাদের নিয়ে গেছেন। এমনি করেই দক্ষিণারঞ্জন আমাদের শুকপঙ্খী নৌকোর কথা শুনিয়েছেন: 'সোনার খাটে গা, রূপার খাটে পা রাখিয়া রাজপুরীর মধ্যে পাঁচ রাণীতে বসিয়া সিঁথিপাটি করিতেছিলেন। এক দাসী আসিয়া খবর দিল, নদীর ঘাটে যে, শুকপঙ্খী নৌকা

আসিয়াছে, তাঁহার রূপার বৈঠা, হীরার হাল।' অজিত দত্ত বলছেন : কুঁচের বরণ কন্যা একাকী বসিয়া বাতায়নে'—
দক্ষিণারঞ্জন বললেন,

'কুঁচ-বরণ কন্যা মেঘ-বরণ চুল'

তারপর অজিত দত্ত পাষাণ-পুরীর বর্ণনা দিয়েছেন—গদ্যে যা বলেছেন দক্ষিণারঞ্জন,

যে-দেশে পাষাণপুরী, মানুষের চোখের পাতাও
অযুত বৎসরে যেথা নাহি কাঁপে ঈষৎ স্পন্দনে,
হীরার কুসুম ফলে যে-দেশের সোনার কাননে,

আর দক্ষিণারঞ্জনের রূপকথায় কলাবতীর দেশে 'মোতির ফুল' পাওয়া যায়। মোহিনী, মায়াবী, পাশাবতী—এমনি সব নারীদের কথা অজিত দত্ত আমাদের শুনিয়েছেন। আভাষ ইংগিতে নয় অমিয় চক্রবর্তীর মত, একেবারে trans-plantation যাকে বলে—আমাদের নিয়ে গিয়ে সেই রাজত্বে রেখে এসেছেন।

আর একটি কবিতা দেখা যাক্—এই কবিতাটিতে রূপকথার অনুষংগ আছে যদিও রূপকথার জগৎ ধরা দেয়নি এখানে :

—বহু দূরে শাল, তাল,
তমাল, হিন্তাল আর পিয়ালের ছায়া-ম্লান দেশে

'বসন্ত-সন্ধ্যার মোহ' দক্ষিণ বাতাসে ভেসে আছে। সেখানে 'প্রভাত-পদ্মের ভরে কেঁপে ওঠে তারার মৃণাল'। অজিত দত্ত এই জগতে বারবার আমাদের নিয়ে গেছেন—তাঁর কাব্যে যদিও অন্য একটি সুর রয়েছে পাশাপাশি—তা হচ্ছে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের—কিন্তু একই কবি-চিত্তে দুটি বিপরীত মননধর্মিতার অপূর্ব সহাবস্থান ঘটেছে। যে কোন কবির পক্ষে আমার তো মনে হয়, এটি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক।

প্রতিটি মহৎ শিল্পের যেমন গঙ্গোত্রী থাকে—যেখান থেকে হঠাৎ নামে গঙ্গা পাগলপারা হয়ে, তেমনি কবিতায়ও থাকে। আমার কাছে এমনি গঙ্গোত্রী হলো রূপকথার রাজ্য। আমি বহু কবিতায় নীলকমল লালকমলের কথা এনেছি, বড় হয়ে—এনেছি বললে ভুল হয়, তারা এসে গেছে, আমি বারণ করিনি।

কিন্তু অজিত দত্তের মত রূপকথার জগৎ অবিকৃতভাবে আসেনি। প্রতীক হয়ে আমার কাছে এসেছে। তা ভালো কি মন্দ, কাব্যের বিচারে রসের বিচারে উৎকর্ষ কি না, আজও বুঝতে পারি না। তবে, সেই শিশুকালের পরম নিশ্চিন্ততার মধ্যে, ঝরঝর বর্ষাধারায়, টিনের চালের ঝমঝম শব্দে, হাড়-কাঁপানো শীতে কাঁথার নীচে শুয়ে, আধো-ঘুমে আধো জাগরণে নীলকমল লালকমলের যে জগৎ—সেখানে কি আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। সব দরজা আমার কাছে কি বন্ধ হয়েই থাকবে।

[ক্রমশ]

১. আমন্ত্রণ-পত্রটির সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি সুন্দর আলপনার ছবি পাঠিয়েছিলেন প্রফেসর, সেটিও মুদ্রিত হলো বইএর শুরুতে।

সংযোজন : লেখাটি ছাপবার সময় খবর এলো শ্রীঅশোক মিত্র মাননীয় মন্ত্রী হয়েছেন। শ্রীঅশোক মিত্র বাংলাদেশের সম্ভবত একমাত্র কবিতা-প্রেমিক মন্ত্রী। আমাদের দেশে ক্রিকেট-প্রেমিক মন্ত্রী ছিলেন অনেকেই। কবিতার কথা কখনো কোন মন্ত্রী বলেছেন কিনা জানা নেই। কবিরা এই বার্তায় নিশ্চয়ই খুশি হবেন। অর্থনীতির বিদগ্ধ ভাষ্যকার হলেও সেই বিদেশীর মত তিনি নিশ্চয়ই বলতে পা.রন, 'Economics is my lawful wife, poetry my mistress.'

রাগ-সংগীতের নানাদিক

আর্য্য-সভ্যতা যখন তার গৌরব শীর্ষে উঠেছে, তখনই জন্ম নিয়েছে আমাদের সংগীত। প্রাচীন ঋষিদের স্তোত্র আর মন্ত্রপাঠের মধ্যেই আমাদের সংগীতের শুভ-জন্ম। তারপর অনেক বাধা-বিপত্তির সর্পিল পথ বেয়ে সেই সংগীত রূপান্তরিত হয়েছে আমাদের পরিচিত রাগ-সংগীতে। কালের যাত্রায় স্বাভাবিক গতিতেই কিছু কিছু রীতি-নীতি গড়ে উঠেছে। রাগ-সংগীত নিয়েছে একটা স্পষ্ট ও নির্দ্ধারিত রূপ।

একদিক থেকে বলা চলে, মহান দার্শনিকতার মধ্যেই আমাদের সংগীতের জন্ম। আর একথাও অনস্বীকার্য যে, সংগীত ছিল এদেশে ভক্তিবাদেরই একটা অবিভাজ্য অঙ্গ। আসলে, সমস্ত সৃষ্টির অন্তরালে উপস্থিত এক মহাশক্তিকে উপলব্ধি করার প্রেরণাই আমাদের সংগীতে দার্শনিকতার পথ খুলে দিয়েছে। নারদ, ভরত, মতঙ্গ প্রভৃতি সংগীত-বিশেষজ্ঞের আবির্ভাবের আগেই নাদব্রহ্মের তত্ত্ব জন্ম নিয়েছিল। এই তত্ত্বের সঙ্গে মিলেছে ওঙ্কার-ধ্বনি। সংগীতের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান করে নিয়েছে ঈশ্বর সন্ধানের ব্যাকুল আত্মনিবেদন। সেই জন্যই বিভিন্ন যুগে দেখা গেছে, সংগীত শুধু ললিতকলার একটা প্রকার-ভেদ হিসেবে মানুষের জীবনে জড়িয়ে নেই। সংগীত হয়ে উঠেছে মুক্তির এক বিশিষ্ট পথ। একালেও সেই মহান দার্শনিকতা সংগীতের অবয়ব থেকে সরে যায়নি আদৌ। ওস্তাদ আলাউদ্দিন, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ প্রভৃতি গুণীজন একালেও সেই মহান সংগীতধারাকে সযত্নে লালন করে এসেছেন। রাগ-সংগীত বিভিন্ন যুগে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই তার পথ করে নিয়েছে সত্যি, কিন্তু তার অন্তর্লীন দার্শনিকতাকে কখনো একেবারে হারিয়ে ফেলেনি।

কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, রাগসংগীত হিন্দু-সভ্যতার মধ্যে জন্ম নিলেও এই সংগীত কখনো সঙ্কীর্ণতার গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখেনি। মুসলমান আক্রমণ বরং এক বিচিত্র সাংস্কৃতিক মিশ্রণের সুযোগ এনে দিয়েছিল। আর, সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের সংগীত সেই সুযোগের পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার

করেছে। অবশ্য, আমাদের গানে ইসলামী প্রভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বোধ হয় এখনো সম্ভব নয়। তবে একথা বলা চলে, আমাদের সংগীতের বিশাল পটভূমিতে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার মানুষই তাঁদের অর্ঘ্য নিয়ে এসেছেন। সেইজন্যই খসরু, সদারঙ, অদারঙ প্রমুখ গুণীজন আমাদের সংগীত ক্ষেত্রে সসম্মানে স্থান করে নিয়েছেন।

এমন কি ইংরেজ রাজত্বেও রাগ-সংগীত তার উদার বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে। ক্রমে তার পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। হারমনিয়াম, বেহালা প্রভৃতি বিদেশী যন্ত্রও রাগসংগীতে স্থান পেয়েছে কালের অমোঘ নিয়মে। নতুন যুগের অপরিমেয় সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সংগীত।

স্বাভাবিক কারণেই সংগীতের বিষয়বস্তু বদলে গেছে। মূলতঃ সংগীত ছিল ভক্তিমূলক। ক্রমে সেখানে প্রকৃতি একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিল। বিভিন্ন ঋতু আর সময়কে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জন্ম নিল রাগ-রাগিণী, বসন্ত ঋতুর আনন্দ-হিল্লোলে মুখর হয়ে উঠল বসন্ত, বাহার, হিন্দোল প্রভৃতি রাগ। বর্ষায় শোনা গেল মেঘ আর মল্লার। তেমনি ভোরের নরম আলোর মাধুরী ফুটিয়ে তুলল ভৈরোঁ, রামকেলী, যোগিয়া, কালেংড়া ইত্যাদি রাগ। সন্ধ্যার বিষণ্ণ ম্লানিমাকে দীর্ঘশ্বাসের মতো করুণ করে তুলল পূরবী, ইমন, মারবা। বিভিন্ন স্বরের নিপুণ বিন্যাসের মাধ্যমে আমাদের সংগীত-স্রষ্টারা প্রকৃতি, সময় আর পৃথিবীর বিভিন্ন রূপকে সাংগীতিক সৃষ্টির মধ্যে বিধৃত করে রাখলেন।

বলে নেওয়া ভাল, সাম্প্রতিক সমীক্ষায় চমকপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। কয়েকটি রাগ শোনানোর পরে তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ শ্রোতার (যাঁরা রাগসংগীত সম্বন্ধে আদৌ উৎসাহী নন) কাছে তাঁদের মতামত চাওয়া হয়েছিল। দেখা গেল, তাঁদের প্রতিক্রিয়া এবং মতামত মোটামুটি একই ধরণের। কাফি সম্বন্ধে তাঁরা জানিয়েছেন—রাগটা মিঠে, কোমল, শান্ত এবং কিছুটা হাল্কা। পুরিয়া-ধানেশ্রী শুনে তাঁরা বলেছেন—এটা মিষ্টি, গভীর, করুণ, পবিত্র আর ছায়াঘেরা। রাগেশ্রী সম্বন্ধেও তাঁদের মতের ভেতরে পার্থক্য নেই বললেই চলে। এতে রাগসংগীত সম্বন্ধে দুটো জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—প্রথমত, রাগের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি সাধারণ মানুষের কাছেও ধরা পড়ে, আর দ্বিতীয়ত, রাগের আবেদন এত সার্বজনীন যে, এদের প্রতিক্রিয়া শ্রোতার কাছে মোটামুটি একই ধরণের।

ভাতখণ্ডেজী রাগ পরিবেষণের ক্ষেত্রে দুটো লক্ষণের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে সময় ও ঋতু অনুসারে রাগ পরিবেষণ করা হয় এবং সেক্ষেত্রে স্বরবৈশিষ্ট্য এবং স্বর-স্তর—এই দুটো দিক থেকে রাগের সময় এবং ঋতুগত কাল নির্ধারণ করা যায়। তিনি বলেছেন, কোমল ও তীব্র স্বর এই ব্যাপারে রাগের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারে।

স্বর-স্তরের ভিত্তিতেও তিনি রাগের সময় বা কালসূচী নির্ণয় করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, যে-সব রাগের বাদী স্বর রাগের পূর্বাঙ্গে থাকে, সেগুলো গাইবার সময় হল মধ্যদিন এবং মধ্যরাত্র। আর বাদী স্বর উত্তরাঙ্গে থাকলে রাগ পরিবেষণ করতে হবে মধ্যরাত্রি থেকে দুপুরের মধ্যেই। এছাড়া তীব্র মধ্যমের প্রভাবও কম নয়। তীব্র মধ্যমের ক্ষণিক স্পর্শ গোধূলির রাগকে মধ্যরাত্রির রাগে পরিণত করতে পারে। পূর্ব-রাগ তখন উত্তর-রাগে উত্তীর্ণ হয়।

এই ধরণের শ্রেণীবিভাগ আদৌ বিজ্ঞান-সম্মত কিনা, সেই প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে। একথা মনে রাখতে হবে যে, দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে রাগ পরিবেষণের তেমন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। কয়েকটি রাগের কথা ছেড়ে দিলে, সেখানে শিল্পীর ইচ্ছে মতোই রাগ-পরিবেষণ করা চলে। সেইজন্যই ডঃ চৈতন্য দেব মনে করেন যে, রাগসংগীত পরিবেশনের সময় কালভিত্তিক নিয়মগুলোর সর্বভারতীয় গুরুত্ব নেই। তাছাড়া, ভাতখণ্ডেজীর নিয়ম অনুসারে চললে মিশ্র রাগগুলোর ব্যাখ্যা কি হবে? ধরা যাক, ভৈরব-বাহার রাগটির কথা। ভৈরব (বা ভৈঁরো) ভোরের রাগ আর বাহার হল গভীর রাত্রির রাগ। এই দুই রাগের মিশ্রণে সময় আর ঋতুগত নিয়মের ব্যাখ্যা কি করে হবে?

এই জন্যই ক্রমে নিয়মগুলো শিথিল হয়ে আসছে। সঙ্গীত-অনুষ্ঠান বেতার-সূচী এবং শহরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রভাবে ক্রমেই রাগ পরিবেষণের ব্যাপারের পুরোনো রীতির কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা দিচ্ছে। কিন্তু এত কথার পরেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের রাগসংগীতের মৌল ভিত্তি হল সময় আর ঋতু-বৈচিত্র্য।

অথচ মানুষের হৃদয়ের বিভিন্ন অভিব্যক্তিও সহজেই আমাদের রাগসংগীতে স্থান করে নিয়েছে। আনন্দ, বেদনা, বিচ্ছেদ-ব্যথা, হতাশা, ব্যর্থ ভালবাসা—সব আবেগই মূর্ত হয়ে উঠেছে গানে। দর্শন আর প্রকৃতি-প্রেমের গণ্ডী ছাড়িয়ে আমাদের গান ক্রমে মানুষের পার্থিব কামনা-বাসনার অনুবদ্ধ হয়ে উঠেছে। অবশ্য

কখনো কখনো রাগসংগীত আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল বিত্তবানের শুভ্র প্রাসাদে। নবাব আর রাজাদের গজদন্তমিনারে, কিন্তু অনন্তকালের জন্য রাগসংগীতকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখতে পারল না। সেই সুর ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল আকাশে বাতাসে।

গ্রহণ-বর্জনের উদারতা রাগ-সংগীতে ছিল বলেই আমাদের সংগীত কখনো একই বৃত্তে আত্ম-পরিক্রমা করেনি। যা-কিছু স্বল্পমূল, তাকে যেমন বিসর্জন দেওয়া হয়েছে, তেমনি টেনে নেওয়া হয়েছে দূরান্তের দুর্মূল্য সম্পদকেও। ক্রমে জন্ম নিয়েছে গজল, কাজরী, টপ্পা, কাওয়ালী প্রভৃতি বিভিন্ন সংগীতধারা। লোক-সংগীতও তার দুর্লভ সম্পদ নিয়ে এসেছে। তাকে নতুন করে রূপান্তরিত করে নিয়েছে রাগসংগীত। তবু স্থানের নাম দিয়ে এখনো সেই বিদেশীদের কিছু কিছু চেনা যায়। গুর্জরী, জৌনপুরী, মালবী, গান্ধারী, বঙ্গাল-ভৈরব, মুলতানী, প্রভৃতি রাগ তাদের লৌকিক উৎসবের ঠিকানা জানিয়ে দেয় আমাদের। পাহাড়ী রাগটি বয়ে আনে অসমতল ভূমির আবেগ, চঞ্চলতা। কোন কোন গানে পাওয়া যায় ঝিঁঝোটি রাগের ছোঁয়া। কীর্তনে শোনা যায় দেশ, পিলু আর ভীমপলশ্রীর নরম রেশ। তেমনি, রাজস্থানের অনেক লোকগীতিতে রসিয়া রাগটির আমেজ খুঁজে পাওয়া যায়। সেইজন্যই এ-কথা বলা চলে, দীর্ঘদিন ধরেই রাগসংগীত আর লোকসংগীত পাশাপাশি চলেছে, একে অপরকে করেছে সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত। এতেই প্রমাণিত হয় যে, রাগ-সংগীত কখনোই নিজেকে ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ রেখে আভিজাত্যের গৌরব খুঁজে বেড়ায়নি। বরং মাটি আর মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই মুক্তির দিগন্তে পৌঁছেছে।

রাগসংগীতের গতিশীলতার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে নতুন রাগ সৃষ্টির মধ্যেও। আমাদের সংগীতের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্রষ্টার বিচিত্র সৃষ্টি-শীলতার ছাপ। সেইজন্যই পুরোনো রাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অজস্র নতুন রাগ। আলাউদ্দীন উপহার দিয়েছেন হেমন্ত, হেম-বেহাগ, মালুয়া-মল্লার। আলী আকবরের কাছ থেকে আমরা পেলাম চন্দ্রনন্দন, গৌরী মঞ্জরী, লাজবন্তী, মিশ্র শিবরঞ্জনী প্রভৃতি রাগ। তারাপদ চক্রবর্তী দিলেন ছায়া-হিন্দোল প্রভৃতি রাগ। রবিশঙ্করের নিপুণ সেতারে শোনা গেল মোহনকোষ, পরমেশ্বরী, রসিয়া প্রভৃতি। ভৈঁরোকে নতুন করে শুনলাম বিলায়েৎ খাঁর আশ্চর্য সুর-লাবণ্যে। অবশ্য দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীতে যত নতুন রাগের সৃষ্টি হয়েছে, তার সবই যে ভাল তা নয়। অনেক সময় তাত্ত্বিক অজ্ঞতায় জন্ম নতুন নামে

পুরোনো রাগ যুক্ত হয়েছে। আরোহী-অবরোহী সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণায় ব্যক্তি-বিশেষের নামে ধুনকেই রাগ-পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু এটা দেখা গেছে যে, এই ধরণের প্রয়াস সব সময় সফল হয়নি। অনেক সময় একটা রাগের জনপ্রিয়তার ফলে সমধর্মী রাগ অপ্রচলিত হয়ে গেছে। (যেমন ভাটিয়ার ছড়িয়ে পড়ায় আনন্দ-ভৈরবের নাম প্রায় মুছে গেল স্মৃতি থেকে)। সেইজন্যই এ-কথা বলা চলে, বিভিন্ন রাগ অস্তিত্বের সংগ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যাপৃত রয়েছে, তার ফলে সে-গুলোই টিঁকে আছে যাদের মধ্যে রয়েছে মৌলিকতা আর গভীরতা।

একথাও মনে রাখতে হবে যে, রাগসংগীত এখন স্বরূপে ছাড়াও, সহজ ভঙ্গীতেই সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে গেছে। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, প্রমুখ গুণীজন তাদের গানে রাগ-সংগীতের বিপুল প্রভাব মেলে দিয়েছেন। বাজারে বা মন্দিরে যে কীর্তন শোনা যায়, তাতেও বিভিন্ন সুরের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় রাগ-সংগীত। অবশ্য এটা ঠিক যে, এই ধরণের গানে রাগ সংগীতের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো বা গায়নরীতি পুরোপুরি অনুসৃত হয়নি, কিন্তু রাগ কাঠামো বা ঋতুবৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয়ে রাগসংগীতের ধারাকেই অব্যাহত রাখা হয়েছে। তান, বোলতান, গমক, মুরকী, আলাপ, ঝালা প্রভৃতি প্রকরণগত দিকগুলোও বাদ দিয়েই রাগ-সংগীতের মূল কাঠামোকে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ স্রষ্টা সতর্কভাবে গ্রহণ করেছেন। এতে বাণীর সঙ্গে সুর একাত্ম হয়ে গেছে। আর স্বরলিপির বাঁধনে সংগীত ধরা দিয়েছে গায়ক-শ্রোতার কাছে। তাতে সংগীতের নতুন ধারা প্রবাহিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রাগসংগীতের মতো সংগীতের মুক্তি মেলেনি।

এখানেই সংগীতের অন্যান্য ধারার সঙ্গে রাগ-সংগীতের মৌল পার্থক্য। রাগ-সংগীতের অভিসার অনন্ত অসীমে। বন্ধনকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে বলেই এর চিরন্তন মুক্তি। রাগকাঠামো বা সংগীত পরিবেশন পদ্ধতিতে কিছু কিছু নিয়ম দৃঢ়-পিনদ্ধ হয়ে গেছে সত্যি, কিন্তু অবিশ্রান্ত গতিশীলতা আর সৃষ্টিশীলতায় রাগ-সংগীত চিরদিনই প্রাণবন্ত থেকে গেছে। রাগ-কাঠামোয় অফুরন্ত নমনীয়তা আছে বলেই বারবার রাগ-মিশ্রণ ঘটেছে। বিভিন্ন রসের ও ভাবের ধারায় রাগের মধ্যেও এসেছে বিচিত্র হৃদয় বন্ধন। সগৌরবে হাজির হয়েছে সঙ্কীর্ণ ও সালঙ্ক রাগের মিছিল।

অথচ এক একটা রাগে কী বিপুল গভীরতা, কী বিচিত্র ঔদার্য। প্রত্যেকটি রাগ যেন আমাদের জীবনের মতোই বর্ণাঢ্য, রূপময়। গায়ক আর শ্রোতাকে একটি রাগ এক অনির্বচনীয় শান্তির রাজ্যে পৌঁছে দেয়। অবশ্যই এর জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি দরকার, বিশেষ করে গায়ক বাদকের ক্ষেত্রে। নিরলস তালিম নিতে হয় যোগ্য গুরুর কাছে। ক্লান্তিহীন সাধনা আর একাগ্রতায় শিল্পী পৌঁছোন আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণদ্বারে। এই সময়টা নিঃসন্দেহে একঘেয়েমী আর শাসনের কঠোরতায় প্রাণান্তকর। রবিশঙ্কর নিজেই স্বীকার করেছেন, এই প্রস্তুতিপর্বে শিল্পী অনেক সময় নিজেকে ক্রীতদাসের মতোই মনে করেন। অথচ জীবনের এই কষ্টকর লগ্নগুলোই শিল্পীর বাকী দিনগুলোর জন্য স্বর্ণময় বিনিয়োগ।

এই শিক্ষণপদ্ধতিতে শ্রবণশক্তিই সবকিছু। সেইজন্যই এতে লিখিত স্বরলিপির প্রাধান্য এত কম। অবশ্য, তার ফলে রাগ-সংগীতের মৌল বৈশিষ্ট্যটাই রক্ষা পেয়েছে। রাগসংগীত স্বরলিপির বাঁধনে নিজেকে ধরা দেয়নি কখনোই। আর তাতে মুক্তির স্বাদ থাকায় পরিবেশনে এসেছে সীমাহীন বৈচিত্র্য। এমনি করেই গড়ে উঠেছে অজস্র ঘরানা। একই রাগ বিভিন্ন ঘরানার শিল্পীর কণ্ঠে বিচিত্র রূপ নিয়েছে। অন্তরালের ঐক্যের মধ্যেও প্রকাশের বৈচিত্র্য রাগ-সংগীতকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে ক্রমেই।

অথচ বৈচিত্র্য রয়েছে একই শিল্পীর পরিবেশনেও। প্রত্যেক সার্থক শিল্পী নিজের সৃষ্টি মানসের ছাপ রেখেছেন তাঁর গান বা বাজনায়। স্বরলিপির বাঁধনে রাগসংগীত বাঁধা না পড়ায়, এর কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ গড়ে ওঠেনি। মুক্তির অনুপম লাবণ্যে তাই শিল্পী প্রত্যেক রাগকে নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছেন। সুরের সঙ্গে স্রষ্টার আপন মনের মাধুরী মিশেছে। রাগ কাঠামো বজায় রেখে গায়ক নিজের শিল্পী মানস অনুযায়ী পরিবেশন করেছেন বিভিন্ন রাগ। সেইজন্যই ফৈয়াজ খাঁ, তারাপদ চক্রবর্তী, আমীর খাঁ, রবিশঙ্কর, আলী আকবর, বিলায়েৎ প্রভৃতি কলাবিৎ প্রতি মুহূর্তে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন পরিচিত রাগের সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে থেকেও। একই রাগ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ নেয়।

এইজন্যই রাগ-সংগীত বাণীকে এড়িয়ে চলেছে চিরদিন। বন্ধনে তার অনাদিকালের অনীহা। বাণীর বাঁধন থাকলেই সুরের পথ পরিক্রমা নিয়ম মেনে চলত। মুক্তির আনন্দ যেত হারিয়ে। তাছাড়া রাগ-সংগীতের জগতে বাণীর

প্রয়োজন তো সত্যিই সামান্য। প্রত্যেক রাগেরই নির্দিষ্ট ভাব ও স্বাদ আছে। সুরের কাঠামোতেই সেই ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেইজন্য কণ্ঠসংগীতেও বাণীর স্থান গৌণ। সুরের ধারা সেখানে গায়ক বাদকের আনন্দ বেদনাতে পৌঁছে দেয় শ্রোতার হৃদয়ে। এই কারণেই রাগ-সংগীত দেশ ও কালের গণ্ডী পেরিয়ে গেছে। দেশ দেশান্তরে ভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষ আমাদের রাগ-সংগীতের মর্ম বুঝে নিয়েছে তার সুরের বক্তব্য থেকেই। সুরের ধ্বনি থেকেই আমাদের গান সারা বিশ্বে প্রচার করে চলেছে সেই মহত্তম বাণী—মানবতার ঐক্যের চিরায়ত স্বপ্নের কথা।

নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

অরুণ মিত্রের একটি কবিতা

সম্প্রতি, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় একটি কবিতা বিশেষ করে মনে দাগ কেটেছে। চতুরঙ্গ-র বর্তমান সংখ্যা মানে কার্তিক-পৌষ ১৩৮৩। বন্ধুবর শ্রীআতাউর রহমান বা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কি আর একটু তৎপর হতে পারেন না। কলেজ-জীবন থেকে এপর্যন্ত, আমার কাছে অন্তত, লোভনীয় পত্রিকা ছিল মাত্র তিনটি। কবিতা, পূর্বাশা, চতুরঙ্গ। এই পত্রিকাগুলিতে লিখতে পারলে কবি জীবন সার্থক হোত, মনে পড়ে। [আর এস পি-র বন্ধুরা কি 'ক্রান্তি' পত্রিকাটি আর প্রকাশ করতে পারেন না।] বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা'র শততম সংখ্যা প্রকাশ করে গেছেন—অথচ বেঁচে থাকতেই বন্ধ করে দিলেন। এটা কবিতা-প্রেমিকের কাছে ছিল পরম বেদনার বিষয়। সঞ্জয়দা ও সত্যদার আপ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রমে 'পূর্বাশা' দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়েছে, মাঝে মধ্যে এখনো বেরোয়। হঠাৎ ক'দিন আগে নতুন 'পূর্বাশা' স্টলে দেখলুম—মনে মনে সত্যপ্রসন্ন দত্তর প্রতি শ্রদ্ধায় আনত হ'ল মন। তবু, নিয়মিতই অনিয়মিতভাবে বেরুচ্ছে একমাত্র চতুরঙ্গ, উত্তরসূরির মতোই।

কবিতাটি অরুণ মিত্র র। অরুণ মিত্র সেই জাতের কবি যাঁরা জনপ্রিয়তার মোহে পড়ে কখনোই স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হন না, যেমন হননি একদা সঞ্জয় ভট্টাচার্য (সঞ্জয়দার একটি কাব্য-গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)। কিছু কিছু কবিতা-পাঠক একান্ত নিভৃতে এঁদের কবিতা পড়েন। সেই একান্ত নিভৃত কাব্যপাঠের আনন্দ অনেক সহস্র ব্যক্তির উচ্ছ্বসিত উল্লাসের চেয়েও মূল্যবান, রসের জগতে। আমার বয়েসী আরো দুজন কবি আছেন—যাঁদের কবিতার আমি একান্ত অনুরাগী, কিন্তু তাঁরাও অরুণ মিত্রের মতই প্রান্তবাসী। অরুণকুমার সরকার এবং লোকনাথ ভট্টাচার্য (সমবয়েসী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও আমার প্রিয় কবি, কিন্তু তিনি মোটামুটিভাবে জনপ্রিয়।) অরুণকুমার সরকারের কবিতার দু' একটি উদ্ধৃতি এদিক ওদিক চোখে পড়ে—(তাঁর প্রেমের কবিতার তুলনা আমি তো এখনো পাই নি আধুনিক কাব্যের জগতে)। কঙ্কন-নন্দী সম্পাদিত 'কবি' পত্রিকায় শরৎকুমার কিছুদিন আগে

অরুণকুমার সরকারের একটি পরিচ্ছন্ন আলোচনা করেছেন। কিন্তু লোকনাথ দিল্লীতে চিরনির্বাসিত। লোকনাথ ভট্টাচার্যের কবিতার এমন একটি বিশিষ্ট ধরন আছে, রয়েছে বিচিত্র অনুভূতিমালা যা তাকে স্মরণীয় করে রাখে।

তবু ভালো, দেরীতে হলেও, অরুণ মিত্র-র কথা আজকাল কাউকে কাউকে উল্লেখ করতে শুনছি। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার কবিতাটি পড়তে পড়তে আমি একাধিক কারণে বড় বিষণ্ণ বোধ করলুম। প্রথমত, যে-কবিতা মনে গভীর দাগ কাটে তাতে আমি সহজেই বিষণ্ণ বোধ করি, সে সময় বড় একলা থাকতে ইচ্ছে করে—স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কাউকেই কাছে দেখতে ইচ্ছে হয় না—এমন একটি বৈরাগ্য মাথা চাড়া দেয়। দ্বিতীয়ত, কতগুলি এমন অর্থবহ ইঙ্গিত তাঁর কবিতায় পেলাম যা আমার জীবনের সঙ্গে ভয়ানকভাবে জড়িত। সর্বোপরি, কবিতাটির মধ্যে রয়েছে সহজ আন্তরিকতা (এ-জিনিষটি বড়ই দুর্লভ। বর্তমান-কালের কাব্যজগতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে শব্দের চতুর প্রয়োগ—এর থেকে আমরা মুক্তি পাবো কবে।)।

আমার এ চোখ দুটো টলটল সরোবর হয়ে যায়,

আমি যেন অরুণ মিত্রের চোখ দুটো পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি—প্রৌঢ়ত্বের নিবিড় প্রশান্তি সেই টলটল স্থৈর্যের প্রতীক। আর তাঁর অবসরপ্রাপ্ত শান্ত জীবনের 'হাত পা এলিয়ে দেওয়া ঢিলেঢালা ঘুমে'র ছবিটি আমার কাছে মূর্ত।

'হয়তো ফুলন্ত ডালে অন্য পথের নির্দেশ ছিল, হয়তো সূর্যের রশ্মি ছেঁটে তীরমার্কা এঁকে দেওয়া ছিল। সে সবও দেখিনি।

[পাঠক, ফুলন্ত শব্দটি কী অনায়াস লক্ষ করুন]। জীবনে তিনি অনেক দেখেছেন, অনেক পথ পার হয়ে এসেছেন—তাঁর নিজের মধ্যেই তিনি তৃপ্ত—এমন একটি অভিজ্ঞতার স্তরে তাঁর বয়েস এসে মিলেছে।

কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে তিনি অবশেষে 'পৃথিবীর পরম আশ্রয়' বা 'প্রসন্নতা'র কথা জানতে পেরেছেন। আরো জেনেছেন—

এই ধুলো তো শালিধান গমদানা ফসলের বীজ,
এই তো এক বুকের নিকষ পাতা যাতে প্রতি মুহূর্তের সোনা
আড়ে দীঘে আঁকি বুকি কেটে যেতে পারে।

(আড়ে দীঘে বা শালিধান শব্দ দুটি কী সুন্দর এসে গেছে)

এমন ধূলি মাটির কবিতাকে স্বর্গের উপাদান করে ফেলতে পারা যে কত আয়াস-সাধ্য, সারা জীবনব্যাপী কাব্যসাধনার ফসল, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

অরুণ ভট্টাচার্য

সময়ানুগ

নিয়মিত 'দর্শক' পত্রিকাটি পাচ্ছিলুম। দেবকুমার বসু অন্যতম সম্পাদক (রবি মিত্র সহযোগে)। তাতে থাকতো শিল্প-চর্চা ও নাটক। অর্থাৎ পত্রিকাটির যুগ্ম-ধারা। হঠাৎ কিছুদিন থেকে দেবকুমার-সম্পাদিত নিছকই কবিতা পত্রিকা 'সময়ানুগ' পাচ্ছি। অর্থাৎ যুগ্মধারা 'ত্রিধারায়' পর্যবসিত হয়েছে। পরিচ্ছন্ন কাগজটি হাতে নিলে মন ভরে যায় (কবিতা-নির্বাচনে অবশ্য দেবকুমার খুবই বন্ধুবৎসল—আর একটু নিষ্ঠুর হতে বলি সম্পাদককে) কিন্তু আমার একটি চিন্তা ধরেছে। আমার ধারণা ছিল, কবিতা ও সংগীত, এদুটি ধারায় আমার যাতায়াত—দেবকুমারেরও দুটি ধারা। অর্থাৎ আমরা সমান সমান যাচ্ছিলাম। এখন আমি আবিষ্কার করলুম, আমি হচ্ছি দেবকুমারের, অঙ্কের ভাষায়, টু-থার্ড।

অরুণ ভট্টাচার্য

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিণ্টস্মিথ, ১১৬ বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল॥
শিউলিসুরভি রাতে বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্মরগানে তব মর্মের বাণী বোলো।"

—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী : মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঠ-খোদাই হরেকৃষ্ণ বাগ

মুদ্রায় অলঙ্করণ-রীতি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[বর্তমান লেখাটি আচার্য সুনীতিকুমারের একটি দুষ্প্রাপ্য রচনা। হরেন ঘোষ -সম্পাদিত Four Arts Journal (১৯৩৫) ভারতীয় সংস্কৃতি-জগতে একদা আলোড়ন এনেছিল। সেই গ্রন্থের অন্তর্গত আচার্যদেবের এই প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে এখনো অপ্রকাশিত রয়েছে। আমরা স্বচ্ছন্দ অনুবাদের মধ্য দিয়ে লেখাটি বাঙ্গালী পাঠকদের উপহার দিলাম। ভাষাতত্ত্বের বাইরেও তিনি যে ভারত-সংস্কৃতির কত বিচিত্র শিল্পচর্চা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন এই লেখাটি থেকেই তার প্রমাণ মিলবে। সম্পাদক : উত্তরসূরি]

ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের পর ফরাসী প্রজাতন্ত্রের নতুন মুদ্রা তৈরী প্রসঙ্গে ফ্রান্সে এক ব্যক্তি বলেছিলেন, ফরাসী দেশের মুদ্রা এমন সুন্দর হওয়া উচিত যে, সবচেয়ে কম মূল্যের মুদ্রাধিকারীরও যেন চারুশিল্পের একটি সুন্দর নিদর্শনের সংগ্রহ থাকে। এই কথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স তার মুদ্রার নকশা করেছিল। বস্তুতঃ, কেবলমাত্র সৌন্দর্যের রূপায়নে এমন জিনিষ খুব কম আছে যা ফরাসী মুদ্রার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তা সে ব্রোঞ্জেই হোক সোনা বা রুপোতেই হোক, Oudine-এর মিলনের দেবীর মুণ্ডই হোক, Daniel Dupuis বা Roty-র বীজবপনকারী স্ত্রীলোকের মূর্তিই হোক। ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত আমাদের অনেক দেশকেই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, বিশেষ করে ইট্যালীকে। ইট্যালীর চলতি মুদ্রা খুবই সুন্দর। নিকেলের তৈরী 20 সেন্টিমিমি-র চলতি মুদ্রা যার সামনের দিকটায় শস্যের ডাঁটি ধরা হয়েছে, তা বিশেষ করে উল্লেখ করার মতো।

প্রাচীন গ্রীকরা সৌন্দর্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিল। তাদের সভ্যতার অন্যান্য অনেক জিনিষের মতো প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রের মুদ্রাও প্রাচীন ও আধুনিক বহু লোকের কাছেই চিরকালীন প্রেরণাস্বরূপ হয়ে থাকবে। বস্তুতঃ, বলা যেতে পারে পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক রাষ্ট্রগুলি তাদের মুদ্রাপ্রস্তুতকরণে গ্রীসীয় গুণাবলীর কিছু ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। আমাদের মুদ্রাবিজ্ঞান-শিল্পে যেটুকু আছে তা সচেতনভাবে এবং সাফল্যজনকভাবে গ্রীকদেরই অনুকরণ করা হয়েছে মাত্র। ফ্রান্স ও ইট্যালীর মুদ্রার কথা এখানে ধরা যেতে পারে। ইংলণ্ডের রাজার মূর্তিটির অন্যদিকে অশ্বপৃষ্ঠে সেণ্ট জর্জের মূর্তিটি Parthenon ভাস্কর্যের অনুপম গ্রীকমূর্তি থেকে ইট্যালীর শিল্পীরা নিয়েছেন। স্বাধীন আইরিশ রাষ্ট্রের নতুন মুদ্রা, যেটিতে একশ্রেণীর গৃহপালিত পশুপক্ষীর মূর্তি রয়েছে, তা গ্রীক ভাবধারারই আধুনিকীকরণ। গ্রীক মুদ্রায় কয়েকটি জীবজগতের একটি বিশ্বস্ত ও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীক ভাবছায়ায় তৈরী অন্যান্য ভাল ভাল জিনিষের মধ্যে পেরুর কয়েকটি মুদ্রায় 'ইনকা' মেয়ের চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রার কথা উল্লেখ করতে পারি। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ৫ সেণ্টের নিকেলের মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে বাইসনের চিত্রাঙ্কিত আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান মুদ্রার কথাও উল্লেখ করতে পারি। প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি মুদ্রা তৈরী ব্যাপারে গ্রীকদের দ্বারা সমভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। রোমান মুদ্রা গ্রীকদেরই শিল্পভাবনার প্রতিফলন। নিকট প্রাচ্যের গ্রীকভাষী লোকেদের মুদ্রা গ্রীসীয় শিল্পের কখনও ক্ষীণ কখনও স্পষ্ট ও পরিষ্কার প্রতিধ্বনি।

আমাদের দেশে, ভারতে, মুদ্রাবিজ্ঞানশিল্পে একটি গ্রীকপ্রভাবমুক্ত ঐতিহ্য ছিল। এটা সত্যি কথা। এবং এ খুবই সম্ভব যে প্রথম মুদ্রাগুলো —বিনিময় মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত প্রতীক চিহ্নিত ধাতুখণ্ডগুলি—ভারতেই উদ্ভূত হয়েছিল। (সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদাড়োতে আবিষ্কৃত হয়েছিল অন্তত একটি আয়তাকার মুদ্রা বা ধাতুনির্মিত একটি বড় পদক যার বয়স সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব তিন সহস্র বৎসর। খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীর গ্রীকপ্রভাবে এশিয়া মাইনরে প্রস্তুত মুদ্রাগুলিই পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীর প্রাচীনতম মুদ্রা।) কিন্তু গ্রীক-পূর্ব ভারতীয় মুদ্রাগুলি চতুষ্কোণ বা আয়তাকৃতি রৌপ্য বা তাম্র খণ্ডবিশিষ্ট ছিল। তাতে কেবল কয়েকটি প্রতীক চিহ্ন আঁকা থাকত—যাদের ছাপমারা

মুদ্রা বলা হোত, ভারততত্ত্ববিদ্‌রা যেগুলোকে 'পুরানা' (Purana) বলতেন। সেগুলোর সৌন্দর্য বা প্রস্তুতকরণে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। ভারতীয় জীবনযাত্রায় গ্রীকপ্রভাব, এমনকি আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্বেই, এসেছিল; পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আকেমেনিয়নের সংস্পর্শে অনুপ্রবেশ করেছিল বলে মনে হয়। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের অনধিক দুশত বৎসর পূর্বে—যবন অথবা যোন (আওনিয়ান বা গ্রীক) কবল রাজ্যের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। আকেমেনিয়ন মুদ্রাগুলো গ্রীকদের প্রস্তুত, অথবা গ্রীক প্রভাবে প্রস্তুত। আশ্চর্যের নয় যে আমরা আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক আফগানিস্থানের হিন্দু রাজা সৌভূতিকে (Saubhuti) Sophutes নামে গ্রীক অক্ষরে গ্রীকদের প্রস্তুত মুদ্রাতে দেখতে পাই। (তৎকালে আফগানিস্থান আর্য ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল)। আলেকজাণ্ডারের আসা ও চলে যাওয়া খুব ঝটিতি ছিল। কিন্তু তার সাঙ্গপাঙ্গরা থে'ক গিয়েছিল, অন্ততঃ ভাবতে মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমান্তে। তারা আবার ফিরে এসেছিল। এবং প্রাচীন হিন্দুদের জীবন ও সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। মুদ্রাপ্রস্তুতকরণেব দেশীয় রীতি মরে যায় নি। সগৌরবে গ্রীক মুদ্রাই প্রবর্তন কবা হয়েছিল। কখনও বখনও দুটি ঐতিহ্যর মধ্যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে একটি নতুন আর্টের জন্ম হয়েছিল।

ভারতে প্রস্তুত গ্রীকমুদ্রার উদাহরণ দেবার দরকার নেই। কারণ এগুলো বহিরাগত বিদেশীদের দ্বারা প্রস্তুত। ভারতের ছাপমারা মুদ্রাগুলো চারুশিল্পের কোন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে না। কিন্তু মনে হয়, গ্রীক শিল্পের দ্রুত প্রভাবে দেশীয় মুদ্রার ছাঁচ-প্রস্তুতকারকরা সুন্দর মুদ্রা তৈরী কবার প্রথম চেষ্টা করে।

খ্রীষ্টজন্মের শতবর্ষ পূর্বে ও পরে ভারতের দেশীয় রাজ্যে ও প্রজাতন্ত্রে প্রস্তুত কিছু মুদ্রা ছাপমারা মুদ্রাশিল্পেব ঐতিহ্যে বিপ্লব এনেছিল। মুদ্রার ওপর শিল্প-সুলভ নক্সার মূল্যবোধে মর্যাদা প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের এই নতুন উদ্দীপনা ভারতীয় মনকে দুই ধরনেব মুদ্রা তৈরী করতে প্রণোদিত করেছিল। ঐগুলো গ্রীকপ্রভাবেই প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু ঐ দুটির মধ্যেই ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্য কাজ করছিল। প্রথমটি ইণ্ডো-গ্রীক রাজা প্যান্টালিয়নের (Pantaleon) একটি তাম্রমুদ্রা। এই রাজা, যিনি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ছয় শতাব্দীর মধ্যভাগে

কাবুল উপত্যকা ও পশ্চিম পাঞ্জাবে রাজত্ব করতেন, ভারতীয় প্রজার মনকে জয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। এটা প্রতীয়মান হয় যে তিনি ভারতীয় মুদ্রা 'পুরানা'র চতুষ্কোণ বা আয়তাকার ঢং'কই তার মুদ্রার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। গোলাকৃতি গ্রীকমুদ্রার ঢং'ক গ্রহণ করেন নি। তিনি ভারতীয় ঢং'কই গ্রহণ করেছিলেন (তার সমসাময়িক অন্যান্য গ্রীক ভারতীয় শাসকদের মতো।) বর্ণিত মুদ্রাটির এক পার্শ্বে গ্রীক অক্ষরে রাজার নাম সহ একটি ভারতীয় সিংহ এবং অপর পার্শ্বে একটি স্ত্রীমূর্তি ডান হাতে একটি পদ্মফুল ধরে আছে। প্রাকৃত ও ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা—RAJINO PANTALEVASA। বোধ হয় প্রাচীন ভারতের প্রস্তুত মুদ্রার মধ্যে এইটি অন্যতম সুন্দর মুদ্রা, যদিও এটা এখন অস্পষ্ট এবং দাগা ধরে গেছে। এই মুদ্রার মধ্যে ইণ্ডো-গ্রীক সংস্কৃতির সমন্বয় পরিষ্কার রয়েছে। মুদ্রায় স্ত্রীমূর্তিটি গ্রীসীয়ভাবাপন্ন নয়—এটা ভারতের ধরন। উড্ডীয়মান ওড়না বা চাদরসহ সমতল ভূমির প্রাচীন ভারতীয় স্ত্রীলোকদের মতো অনাবৃত বক্ষের পাতলা ছিপছিপে লাবণ্যময়ী মূর্তিটিকে দেখে প্রাচীন ভারতীয় শ্রী ও সৌভাগ্যের প্রাচুর্য ও সুখের দেবীশ্রী অথবা লক্ষ্মী বলে মনে হয়। যে কোন মুদ্রার পক্ষে যথোপযুক্ত মূর্তি।

এই সময়কার অন্য মুদ্রাটি হচ্ছে তক্ষশীলার বিখ্যাত মুদ্রা যেটিতে সেই সময়কার উত্তর ভারতের দুটি ভিন্ন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জানোয়ার সিংহ ও হাতির বর্ণনা পাওয়া যায়। উল্টোদিকে সিংহের সঙ্গে স্বস্তিকচিহ্ন আর চৈত্যের চিহ্ন এবং অন্য দিকে হাতির সঙ্গে নন্দীপদ প্রতীক চিহ্ন রয়েছে। এটা মুদ্রাবিজ্ঞান শিল্পের একটি অপূর্ব নিদর্শন। গ্রীকদের পরে আমরা পাই কুষাণ সম্রাটদের। তাদের মুদ্রা তাদের ধর্মমতের মতই বৈশিষ্ট্যমূলক ছিল। কুষাণরা হচ্ছে মধ্য এসিয়ার ইরানীয়। তারা ভারতীয়, পারস্য ও গ্রীক সভ্যতায় শিক্ষিত ছিল। আমরা তাদের মুদ্রার সামনের দিকে দেখতে পাই বর্শা নিয়ে রাজার মূর্তি, ইরাণীয় সাজে। মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে ভারতীয়, ইরাণীয় ও গ্রীকদেশীয় কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি (ব্রাহ্মণ্য অথবা বৌদ্ধ)। পৌরাণিক কাহিনীগুলো মার্জিত গ্রীক অক্ষরে লেখা পল্লবী বা মধ্য পারস্যের সঙ্গে যুক্ত ভাষায় রয়েছে। এই কুষাণ মুদ্রায় আমরা কুমার বা মহাসেনা (কার্তিকেয়) বুদ্ধ ও শিবের একটি পুরানো ঢঙের মূর্তি দেখতে পাই, ষাড়ের কাছে ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান।

এই মুদ্রাগুলি চারুশিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব, ধর্ম ও ইতিহাসের ছাত্রদের নিকট খুবই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এইগুলো গ্রীক মুদ্রা-বিজ্ঞানশিল্প সম্বন্ধে অতি সামান্য ধারণার পরিচয়।

চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে গুপ্ত রাজারা একটি নতুন যুগের প্রবর্তন করে। এবং সেই থেকে আমরা ভারতীয় কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে একটি সুরুচিসম্পন্ন জাতীয় ঐতিহ্যের দেখা পাই। গুপ্ত রাজাদের মুদ্রায় উচ্চমানের গ্রীক শিল্প প্রভাবের প্রচুর চিহ্ন আছে। এবং এর মধ্যে স্থানাভাবে কিছু চৈনিক প্রভাবও রয়েছে। (উদাহরণস্বরূপ, অক্ষরগুলি উপর থেকে নীচে লেখার পদ্ধতি এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে ঝালরের কাজ)। কিন্তু এই প্রথম উন্নতমানের একটি জাতীয় শিল্পের দৃষ্টান্ত পেলাম। গুপ্তযুগের মুদ্রার বিচিত্রতা ও সৌন্দর্য এক অনাবিল আনন্দ দেয় যেটা তুলনা করা যায় গ্রীকমুদ্রার সুরুচিবোধের সঙ্গে। এই মুদ্রা থেকে জানতে পারা যায় পৌরাণিক কাহিনীগুলো সমকালীন দেবনাগরীর অক্ষরে সংস্কৃত কাব্যের অংশবিশেষ ছিল। বিষয়বস্তুগুলো সুন্দর কাব্যের মতো ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়ম কর্তৃক প্রকাশিত একটি পত্রিকায় জন অ্যালানের Catalogue of Gupta Coins এর সুন্দর সুন্দর ছবিগুলি দেখে একজন বেশ আনন্দে এক আধ ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। আমরা দুটি বিশিষ্ট মুদ্রাকে বর্ণনার জন্য বেছে নিচ্ছি। সমুদ্রগুপ্তের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মুদ্রার সামনের দিক দেখাচ্ছে—সম্রাট একটি কুশানের উপর বসে বীণা বাজাচ্ছেন। এবং অন্যটি কুমারগুপ্তের একটি মুদ্রার অপরদিক, ভাস্কর্য শিল্পের রত্ন, একটি সুন্দর দেবীমূর্তি, সম্ভবতঃ স্ত্রী—একটি ময়ূরকে আদর করছে—তাকে কিছু ফল খাওয়াবার চেষ্টা করছে। প্রথমটিতে আমরা একজন বড় শাসকের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের ছবি দেখতে পাই। ঐ সময়ে জীবনের প্রাচুর্যের ছবিও রয়েছে। বীণার আকৃতি বিশেষ করে লক্ষ্য করার মতো। দ্বিতীয়টিতে আমরা সমসাময়িক যুগের একটি দৃশ্যের পরিচয় দেখি যার সাদৃশ্য আমরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত গীতিকাব্যে দেখেছি, এক স্বর্গীয় নারী আর চমৎকার পাখীদের এক যথার্থ ছবি। নারীর পদ্মের ডাঁটা ধরে থাকাটা বৈশিষ্ট্যমূলক। এই মুদ্রা দুটির সামনের ও পেছনের উভয়দিকের কাজই যে কোন দেশের থেকে সুন্দরতম। এবং এগুলো প্রাচীন ভারতীয় কারুশিল্পের গৌরবময় নমুনা হিসেবে দাবী করে।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পর ভারতীয় ভাস্কর্য কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিল। কিন্তু ভারতীয় মুদ্রাশিল্প ক্রমশই নষ্ট হয়ে আসছিল। গ্রীক প্রজাতন্ত্র ও নগররাষ্ট্রগুলো চমৎকার মুদ্রাশিল্পের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রগুলো তার ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারেনি। এখানে ওখানে কেবলমাত্র বিশেষ উপলক্ষ্যে সত্যিকারের শিল্পসম্মত মুদ্রা প্রস্তুত করা হোত, কোন কোন বিশেষ রাজপুরুষের দ্বারা কোন বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, পশ্চিম মহীশূরের কংগুদেশের ক্ষুদ্র স্বর্ণমুদ্রার উপর সুন্দর হস্তীর ভাস্কর্যটি। (সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতাব্দীর) যেটি কাশ্মীরে অনুকরণ করা হয়েছিল, মুসলমানদের আক্রমণের অনতিপূর্বে কাবুলের হিন্দু রাজার প্রস্তুত ষাঁড় ও ঘোড়সওয়ার-অঙ্কিত টাকাগুলো এবং রাজা বীরসিংহের অদ্বিতীয় ঘোড়সওয়ারের স্বর্ণমুদ্রাটি। ১১শ শতাব্দীতে গোয়ালিয়র রাজ্যের, সম্ভবতঃ নলপুরী অথবা নরওয়ারএর, একটি চমৎকার অপ্রকাশিত নমুনা যেটি কলিকাতার শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের সংগ্রহে আছে এবং যেটি সম্পর্কে পুরাতত্ত্ব বিভাগের শ্রী কে. এন. দীক্ষিত মহাশয় আলোকপাত করেছেন।

এই সমস্ত মুদ্রাগুলো কোনক্রমে গুপ্তরাজাদের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছিল। তারপরে এল তুর্কির আক্রমণ, মুসলমান ধর্মকে সঙ্গে নিয়ে। তুর্কিদের নিজস্ব কোন শিল্প ও সংস্কৃতি ছিল না। পারস্য শিল্পকলা ও সংস্কৃতি, যেগুলো তুর্কিরা আফগানিস্থানে গ্রহণ করেছিল আরব জয়ের পর, তাইতে সনানিয়নের নিজস্ব মুদ্রার ধারা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভারতে তুর্কি শাসকরা কিছুকালের জন্য ভারতের দেশীয় মুদ্রাশিল্পকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল। ক্রমশ ইসলাম তার নিজস্ব স্বরূপ দেখাতে শুরু করে এবং একটি হস্তলিপির আকৃতির এক নতুন মুদ্রার জন্ম হয়। এই মুদ্রাগুলো হিন্দুদের মূর্তিপূজার ঐতিহ্যকে ধুয়ে মুছে দিল। ইতিহাস বলছে, যখন পঞ্চদশ শতাব্দীর এক বাঙ্গালী হিন্দু দনুজমর্দ্দনদেব বাঙ্গালীর স্বাধীন রাজা হোল তখন তিনি যে মুদ্রা তৈরী করিয়েছিলেন সেইগুলো বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত কথায় লেখা হয়েছিল। (এক পার্শ্বে ছিল শ্রী শ্রী দনুজমর্দ্দন দেবস্য এবং শ্রী শ্রী চণ্ডিচরণ পরায়ণস্য), অন্য পার্শ্বে তাতে শক বৎসর টাকশালের নির্দ্দেশ বা প্রস্তুত করার

স্থান দেখান ছিল—এই রীতি আমাদের হিন্দুভাবাপন্ন অহম রাজারা অনুকরণ করেছিল এবং শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার হিন্দু রাজারাও আত্মসাৎ করেছিল।

মুঘলদের আবির্ভাবের সাথে সাথে মৌর্য ও গুপ্তদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি নতুন যুক্তরাজ্যের জন্ম হোল। হোল শিল্পকলা ও সাহিত্যের উন্নতি। ভাস্কর্যে ও অঙ্কনে একটি নতুন রীতির উদ্ভব দেখা দিল যাকে বলা যায় মুঘলরীতি। এতে হিন্দু রাজপুত এবং পারস্যরীতির সমন্বয় ঘটল। আকবর এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, বিশেষ করে পরবর্তীকালে মুদ্রাশিল্পে একটি নতুন শিল্পরীতি দেখা দিল। রাজপুত মুঘল এবং সমসাময়িক শিল্পীদের অঙ্কন রীতির উপর ভিত্তি করে একটি নতুন শিল্প-ঐতিহ্যের সৃষ্টি হোল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই ঐতিহ্য মূর্তিপূজা-বিরোধী ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্তও পৌঁছল না। কিন্তু মুদ্রাশিল্প তখন উচ্চশিখরে পৌঁছেছিল। আকবর তাঁর মুদ্রায় মূর্তির প্রচলন করেছিলেন। এই সময়ের তিনটি মুদ্রার কথা জানা যায়। প্রত্যেকটিই স্বর্ণমুদ্রা। একটি রাজপাখীর, একটি পাতিহাঁসের এবং অপরটি রামসীতার প্রতিকৃতি। প্রথম দুটি মুঘল যুগের পক্ষী-গবেষণার একটি প্রশংসাযোগ্য নমুনা, মুঘল যুগের সকল শিল্পকর্মের মধ্যে। শেষটি স্বর্ণমুদ্রার বৃত্তের মধ্যে একটি রাজপুত চিত্রকে ক্ষুদ্রাকারে ধরা হয়েছে। মুঘলযুগের মুদ্রাগুলোর লেখাগুলো সুস্পষ্ট পারসীয় হস্তলিপির একটি চমৎকার নিদর্শন হিসাবে ধরা রয়েছে। রাম-সীতার আধ মোহরের বিশেষ নমুনাটিতে মুদ্রা রাখার বাক্সে রাখা আছে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা একটি পৌরাণিক চিত্র (প্যারী শহরের বিবলিওথেক ন্যাশিওনালে রক্ষিত)। জাহাঙ্গীরের সময়ের মুদ্রাগুলো বিভিন্ন রকমের দেখা যায়। তাঁর নিজের প্রতিকৃতিও বিভিন্ন রকমের ছিল। এ ছাড়া তাঁর খুব চমৎকার এক প্রস্ত সোনার মোহর ছিল। সেগুলোতে বিভিন্ন রকমের মূর্তি জন্তু ও অন্যান্য জিনিষ আঁকা ছিল। মুঘল যুগে ধাতুর উপর আঁকা মানুষের ও জীবজন্তুর মূর্তিগুলো একটি মূল্যবান সম্পদ, বিশ্বের মুদ্রাবিজ্ঞানীর কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকও বটে।

ভারতের মধ্যে নেপালই একমাত্র জায়গা যেখানে সুন্দর মুদ্রাতৈরীর একটি বিরাট ঐতিহ্যকে ধরে রাখা হয়েছে। এখানে আমরা একেবারে নতুন ধরণের মুদ্রা পাই যেগুলো তন্ত্র এবং তান্ত্রিক প্রতীকতার উপর ভিত্তি করে তৈরী। জ্যামিতিক

নিয়মে তৈরী হয়েছে এবং কারুকার্যে দর্শনীয় হয়েছে। এই রীতিতে হস্তলিপির গুণাবলি পরিস্ফুট। দেবনাগরী অক্ষরগুলো নক্সার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নমুনা হিসাবে এখানে একটি রৌপ্য মুদ্রা উল্লেখ দাবী করে, শুধুমাত্র দর্শনীয় বস্তু হিসাবে এরকম একটি মুদ্রার তুলনা পৃথিবীতে বিরল। এক পার্শ্বে আটটি পদ্মফুলের পাতা—প্রতি পাতায় একটি করে দেবনাগরী অক্ষর বা যুক্তাক্ষর শ্রী—শ্রী—শ্রী—গো—র—ক্ষ—না—থ, শিবের জপনাম। নেপাল রাজ্যের অভিভাবকতুল্য দেবতা। পদ্মের মধ্যস্থলে একটি তলোয়ার এবং কালী বা উমার একটি জপমালা। শিব পত্নী, তাকে উপাসনা করা হচ্ছে শ্রী—ভ—বা—নী। অপর পৃষ্ঠে একটি স্বস্তিকা চিহ্ন—রাজার নামশুদ্ধ—পৃথিবী—বিক্রম—শাহ—দেব এবং শাল লেখা রয়েছে। দর্শনীয় মুদ্রা হিসাবে এটি একটি প্রশংসনীয় মুদ্রা।

বর্তমান ব্রিটিশ ভারতের মুদ্রার শোভাবৃদ্ধি করবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ইংরেজদের এই ব্যাপারে শিল্পবোধের কিছু অভাব রয়েছে। মুদ্রার সামনের দিকটা রাজার মস্তকের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। কিন্তু নিশ্চয়ই রাজকীয় প্রতিমূর্তির একটি সুন্দর ধরণ ভারতীয় মুদ্রার উপর সন্নিবিষ্ট করা উচিত। আমাদের ভারতীয় মুদ্রার পিছন দিকটাতেও উন্নতিরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। টাকা এবং অন্যান্য রৌপ্যমুদ্রার অপরপৃষ্ঠে ইংলণ্ডের গোলাপ এবং ভারতের পদ্মফুলের পাশাপাশি কেন স্কটল্যাণ্ডের কাঁটাগাছ আর আয়ারল্যাণ্ডের ত্রিপত্র গুচ্ছ রয়েছে? ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিস্থানীয় সুন্দর কিছু বেছে নেওয়া উচিত। ভারতীয় মুদ্রায় বিশিষ্ট পারসিক ধরনে মুদ্রামূল্যের শ্রেণী বিভাগের কোন মানে হয় না। দেশের নাম ও মুদ্রামূল্যের শ্রেণী দেবনগরী অক্ষরে লেখা উচিত, এতে বোঝা যাবে যে অক্ষরগুলি নিজেই কত সুন্দর দর্শনীয। ভারতে কি এমন কেউ নেই, ব্রিটিশ হোক বা ভারতীয়ই হোক, যে মুদ্রা ব্যবস্থার এই পরিবর্তন আনতে পারে, যে পূর্বোল্লেখিত ফরাসীর নেতার মতো উৎসাহিত হতে পারে, যে ভারতকে একটি সুন্দর মুদ্রা উপহার দিতে পারে, যা আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক প্রতীকে পরিণত হবে এবং হবে স্বর্গীয় আনন্দের উৎস, শুধু সমসাময়িক ব্যক্তির কাছেই নয়, ভবিষ্যৎ মানব-জাতির কাছে।

[সম্ভাব্য রচনাকাল ১৯৩৪-৩৫] অনুবাদ : রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রস্তুতিপর্বে এজরা পাউণ্ড

প্রদীপ মুন্সী

হেনরী জেমস্ একবার একজন লেখককে উৎকৃষ্ট রচনার শর্ত হিসেবে নামপত্রে একটি শব্দ লিখতে বলেছিলেন—নিঃসঙ্গতা। জেমস যেসময় এমন কথা বলেছিলেন সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশের পক্ষে তা নিতান্ত প্রতিকূল। এক অবক্ষয়ী নৈতিক বিশৃংখলার মধ্যে আধুনিক সাহিত্যের মৌল ভিত্তিতে, নিঃসঙ্গতা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিফলনে, একদিকে লেখকরা বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন, অপর দিকে পাঠকরাও লেখকদের থেকে গেলেন সরে। নৈতিক অবক্ষয় সূক্ষ্ম অনুভূতি-সম্পন্ন 'সিরিয়াস' লেখকদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যাকে অনেক লেখক সত্তার অহংকার বলে মনে করেছিলেন। ভিক্টোরীয় যুগের কিছু মানুষের কাছে এই যুগ 'রূপান্তরের যুগ' বলে প্রতিভাত হয়েছিল। বিশৃংখলা ও নৈতিক অবক্ষয়ের চিহ্নের সূচনার উল্লেখ করে জেমস বললেন, জীবনের ভয়ংকর হিংস্র ও বিশৃংখল রূপ তিনি অনুভব করতে পারছেন। আমরা বুঝতে পারি সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের কাছে রূপান্তরের প্রক্রিয়ার ধারা অস্পষ্ট হয়ে থাকেনি—উনিশ শতকের ইউরোপের ঈশান কোণে রুক্ষ মেঘ জমেছে, হাওয়ায় ধূলি ঝড়ের পূর্বাভাস, ভিক্টোরীয় যুগের আপেক্ষিক মংগলের আকাশে কালো আশংকার ছায়া ঝড় তুলে সব কিছু ভংগুর করে পরিবর্তন আনছে।

এক শতক ধরে মূলত অর্থনীতি-ভিত্তিক তত্ত্ব সমাজে একদিকে পারস্পরিক সম্পর্ক রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। বিকল্প হিসেবে এবং অন্যদিকে দাঁড়ালো পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান যা মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করল। পূর্ব ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা পুরোনো প্রথার সঙ্গে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠল। উনিশ শতকের সত্তর আশির দশকে মানুষের ধারণায় এল সঞ্জীবিত এক নতুন বিশ্বাসবোধ—বিজ্ঞান, কেবলমাত্র বিজ্ঞান সমস্ত রকমের সমস্যার সমাধান করতে পারে। প্রধান কর্তব্য, সঞ্চিত তথ্য পর্যবেক্ষণ

করে বিশ্লেষণ করে টুকরো টুকরো করে চিরে দেখা। 'এনলাইটেনমেণ্ট' দৃষ্টিভঙ্গী মানুষকে দেখেছে প্রাকৃতিক বিশ্বের অংশ হিসেবে। স্বাভাবিক, যা অবশ্য অনিবার্যও, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা মনস্তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ডুব দিল 'মন' সেই বিচিত্র জটিল এক নিরন্তর ক্রিয়াশীল প্রবাহের স্রোতে। ফ্রয়েড কাজ করেছিলেন উনিশ শতকের জড়বাদী, নিমিত্তবাদী ও যুক্তিবাদী কাঠামোর মধ্যে, তবু যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ অন্যমনস্ক পাঠকদের কাছে অজ্ঞাত থাকেনি। ফ্রয়েডের পরম কারণবাদ উনিশ শতকের ভোগবাদী আনন্দের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও মানুষের আচরণ ক্রিয়াকলাপ অজ্ঞাতশক্তি-প্রণোদিত। যার বিষয়ে সে কিছুই জানে না, তা মানুষের আচরণের এক নতুন ভূমিকার সূত্রপাত করল। জীবনে এল অস্বস্তি। মানুষের আচরণের মূল্যায়নে নতুন বিস্তৃতির কথা মনে রাখতে হবে, স্বাভাবিক ঘটনাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে হবে, মনে রাখতে হবে আপাতদৃষ্টিতে ছোট ঘটনাও বিশ্লেষণের আলোয় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। স্বাভাবিক অস্বাভাবিকের উনিশ শতকীয় পার্থক্যের দৃঢ় সীমারেখা ভেঙ্গে গেল। অদ্ভুত স্বপ্ন, অশালীন উক্তি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমরা সকলেই প্রায় নিউরোটিক লক্ষণযুক্ত, সুপার-ইগো ইগোকে বিকৃত করতে পারে। সুপার-ইগো আমাদের চাহিদাকে সীমিত করে। বিশ শতকের নৈতিক ধারণার ওপর এর প্রভাব হোল অপরিসীম। সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনে করব ফ্রয়েডের প্রবৃত্তি সম্পর্কে তত্ত্ব, যা লিবিডোর চাহিদা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ আপনা থেকেই দায়িত্বশীল এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ এই ধারণার ওপর মানুষ এতদিন দাঁড়িয়েছিল। সেই ধারণাকে ফ্রয়েডের তত্ত্ব প্রচণ্ড আঘাত করল। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের ফল হল সুদূরপ্রসারী। মহাযুদ্ধের পূর্বেই 'নতুন নারীরা' পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজকে আঘাত করল। লরেন্স লিখলেন, 'আমাদের সমস্যা নতুন সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা অথবা পুরোনো সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস।'

১৯১৪ সালের যুদ্ধ পরিচিত পৃথিবীর সীমানা চুরমার করে দিল। যুদ্ধে অক্ষম বৃদ্ধ প্রজন্ম আর রণক্ষেত্রে পথে ট্রেঞ্চ যুদ্ধরত প্রজন্মের মধ্যে শুরু হল সংঘাত, যা পুরোনো নিয়ন্ত্রণের প্যাটার্ণ বদলে দিল। নিয়ন্ত্রণে অধিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ ও সেনানায়করা ইতিমধ্যেই বিকৃত। ভার্সাই চুক্তি নতুন প্রজন্মের কাছে পুরোনো

সাম্রাজ্যবাদী খেলা বলে মনে হয়েছিল। এই প্রজন্মর কাছ থেকে রাজনীতিবিদ ও সেনানায়করা পেল শুধু ঘৃণা—১৯১৮ পরবর্তীকাল সমস্ত বকমেব নিয়ন্ত্রণকে সন্দেহ করছিল। 'ক্ষমতা দূষিত করে' এই বক্তব্য হযে উঠল এই প্রজন্মব ধারণা, অস্বস্তি আর বিদ্রোহের প্রতীক। স্বাধীন ইচ্ছাব প্রকাশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাব মধ্যে বহুলাংশে নিঃশেষিত হয়ে যায়। নরনারীব ব্যক্তিগত সম্পর্ক সংকুচিত কবার ক্ষেত্রে এর ক্ষমতা সম্পর্কে লরেন্স বললেন, নরনারীব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে যে অনুপম সৌন্দর্য আছে অনুভূতিহীন ভালবাসা তা বিকৃত করেছে, ব্যাহত করছে। এর চালিকা শক্তি হিসেবে তিনি নির্দেশ করলেন কারিগরী ও শিল্প বিকাশের। মানুষ হয়ে পড়ছে অস্বাভাবিক, তাব সূক্ষ্ম সুন্দর অনুভূতি সব বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতা সম্পর্কে, মূল্যবোধের সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিল—স্থূল অনুভূতিহীন পাটোয়ারী বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই কেবলমাত্র জীবনে কৃতকার্য হয়, কৃতিত্ব অর্জন করে—অবশ্যই জাগতিক অর্থে। ঠিক এই ধরনের চিন্তা ভাবনা নয়, তবে এর প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছিল। কর্মের জীবনকে তিরিশের যুগে সন্দেহের চোখে দেখা হোত। বিশুদ্ধ চিন্তা এবং কর্মের মধ্যে সংকটের কঠিন প্রশ্নের সমাধানে সংশয় দেখা দিল।

সামাজিক জ্ঞানের বহুধা বিস্তারের ফলে দেখা দিল নৈতিক অস্থিরতা—পশ্চিমী জীবনধাবা সম্পর্কে এতদিনেব অটুট আনুগত্যে দেখা দিল ভাঙন। এই জীবনধারার কোন যৌক্তিকতা নেই, কোন যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা খোঁজা নিষ্ফল প্রচেষ্টা। আপেক্ষিক নীতিশাস্ত্রে নৈতিক মূল্যমানের অবজেকটিভকে স্বীকার কবা হল না। ফ্রেজাব বললেন, সমস্ত খ্রীষ্টান ধর্মীয় আচার বর্বব অনুষ্ঠানের কৃত্রিম রূপ ছাড়া আর কিছুই নয—ধর্ম যেমন যাদুবিদ্যার স্থান পূরণ করেছিল, তেমনি কবে ধর্মও একদিন মিলিয়ে যাবে—প্রতিষ্ঠিত হবে যুক্তির রাজ্য। পরবর্তী বিকাশের আলোয় প্রাচীন সমাজকে দেখা হল এক সংহত কাঠামো এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন প্যাটার্নের রূপ হিসেবে। সমাজকে পূর্ণভাবে গঠিত করা, তাকে ঢেলে সাজাবার জন্য বিভিন্ন পথের কথা বলা হল। বিশ্বজনীন মানুষের প্রকৃতির 'মিথ' সম্পূর্ণ ভেংগে পড়ল। এই সব অনিশ্চয়তা এবং বিশৃংখলার পশ্চাতে আরও একটি গভীর অন্তর্নিহিত সমস্যা বর্তমান ছিল—সাধারণভাবে স্ব-কৃত মানুষের কোন মেটাফিজিক্যাল রূপ দেওযা সম্ভব হোল না। ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে রূঢ় বাস্তবেব পটভূমিতে মানুষ তার প্রবৃত্তির শিকার মাত্র, ডারউইনীয় ঐতিহ্যে

মানুষ প্রকৃতির অংশ আর মার্কসীয় দৃষ্টিতে মানুষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির ফলশ্রুতি। বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ (বার্ট্রাণ্ড রাসেল) মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দেখল "অণুর আকস্মিক সমাবেশের ফলশ্রুতি।" পূর্বের মত দর্শন আর প্রণালীবদ্ধ হয়ে থাকল না। রাসেল বললেন, "দার্শনিকদের উচিত বিজ্ঞানের জগৎ এবং দৈনন্দিন জীবনের হিসেব করা।"

পশ্চাৎপটের পরিবর্তনের গভীরতা এবং ব্যাপকতা আমাদের যুগের লেখকদের লেখার রীতি পরিবর্তনের কারণ বুঝতে সাহায্য করে। আমরা বুঝতে পারি আমাদের এমন ধর্মীয় বা সামাজিক ঐতিহ্য আর নেই যা থেকে একজন কবি প্রয়োজনীয় অর্থবহ উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন। পূর্বসূরীদের চেতনার রক্তে ছিল উজ্জ্বল বিশ্বাসবোধ। ধর্মবিশ্বাস তখনো ভেংগে পড়ে নি। মধ্যযুগীয় কবিরা যে মাটির রসে লালিত সে মাটির ওপর বিশ্বাস হারান নি। অতীতে ছিল মিথ, ছিল ধর্ম। এসব কবির নিজস্ব দর্শন সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথবা আর এক অর্থে ধর্ম, মিথ প্রভৃতি কবির কাছে প্রেরণার মন্ত্রের মত নিত্য-উচ্চারিত সতত ক্রিয়াশীল। সেজন্য কবির নিজস্ব কোন দর্শন-সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নি। বিশ শতকে ধর্ম, মিথ, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সম্পর্ক ভঙ্গের প্রবাহে কোন সুসংবদ্ধ দর্শন বা বহির্জগতের এমন কোন ধারণা আর নেই যা কবিকে আঁকড়ে ধরতে পারে, তাকে প্রেরণা দিতে পারে। মিলটনের যে সম্পদ ছিল আধুনিক কবির তা নেই। ডিকিনসনের বুকের আলোয় ছিল পিউরিটান খ্রীষ্টান ধর্মীয় জগৎ। বিশ শতকের কবির জীবনে ধ্রুবতারা অপ্রাসংগিক। তার ব্যক্তিগত অনুভূতি আত্মীভূত করবার মত বস্তুগত কোন প্রয়োগরীতি নেই। কামিংসের কবিতা তাঁর বিচিত্র ব্যক্তিত্বের চিত্রকল্প। অ্যালেন টেট বলেছেন, ঐতিহ্য আচরণ ও বিচারবোধকে বিশিষ্ট করে' সীমার ভিতরে রাখে। উত্তরস্মৃতি হিসেবে পাওয়া ঐতিহ্যের শিকড় বাস্তব জীবনপ্রবাহে নিহিত, অথবা আমরা যদি ঐতিহ্য সৃষ্টি করি (যা আমাদের নিয়ত পুনরাবিষ্কার) তবে সেই বিশিষ্ট জীবনবোধ আমরা পরবর্তীদের জন্য রেখে যাই। ঐতিহ্য সব সময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশমান এবং কোন কোন অবস্থায় তা স্পষ্ট প্রকাশিত হয়ে সত্যে পরিণত হয়।

স্থির বিন্দু নেই, নৈতিক মান নেই, অস্তিমান ইনটেলেকচ্যুয়াল ধারণা নেই।

ফলে কবিদের মধ্যে ধারণা গড়ে উঠল যে উপযুক্ত ফর্ম সৃষ্টি সম্ভব শুধু আত্ম-প্রকাশের মাধ্যমে, বিশ্বজোড়া বিশৃংখলাকে অনুসরণ করে। কবিতা হয়ে উঠল কবির বিচিত্র অনুভূতির স্বাক্ষর, কবিতায় দেখা দিলো কাঠামোগত বিশৃংখলা যা আধুনিক কবিতার প্রায় সাধারণ লক্ষণ। কখনও কবির এটা স্বেচ্ছাকৃত, বিশৃংখলাব সার্বিক প্রকাশের জন্য কবিতায বিশৃংখলা আনা, অথবা কখনও অনুভূতির মেকানিজমের, যা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত তা প্রকাশ করতে গিয়ে কবিতায় কাঠামোগত বিশৃংখলা একজন কবি বা লেখক নিজের কাছে যা স্বীকাব করেন তা প্রকৃতপক্ষে তাঁর অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ, অভিজ্ঞতাব এই সংশ্লেষণ সমাজ ও ব্যক্তিজীবন বিন্যাসের পূর্বশর্ত। দৃষ্টবাদী এবং যুক্তিবাদী ঐতিহ্য আমাদের চেতনাকে হীনভাবে অনুসবণ কবে, কবি বিশেষ কবে তার বিরুদ্ধে। বৈজ্ঞানিক এবং সমাজতত্ত্ববিদদের যা আযত্তেব মধ্যে কবি তার মধ্যে থেমে থাকেন না—কবি তাঁদের জ্ঞানের সীমানা পার হযে যেতে চান, আরও গভীরে ডুব দেন। কবি চেষ্টা করেন অনুভূতি এবং ইনটেলেকটেব পাবস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিযা ভাষার আবেগপ্রবণ জটিলতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ কবতে। আধুনিক কবিতা কবির সচেতন মানসের প্রকাশ আর কবিতার মধ্যে নিহিত অচেতন অভিপ্রায় কবিতায় কবির সাংস্কৃতিক মানসের বিশ্বপ্রকাশ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আট বছর আগে এজবা পাউণ্ড আমেরিকা ছেড়ে ইউরোপে আসেন। আমেরিকান সংস্কৃতি সম্পর্কে তীব্র বিরাগ এবং বিরক্তির বীজ পাউণ্ডের রক্তে ক্রিয়াশীল। আমেরিকানদের কোন সাহিত্য নেই। হুইটম্যান যে গণতান্ত্রিক উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছিলেন তাও বিনষ্ট। কলেজের শিক্ষক হিসেবে পাউণ্ডের অভিজ্ঞতা তাঁকে টেনে আনলো ইউরোপে আশ্রয়ের জন্য, অন্তত ইউরোপে মহান অতীত যদিও ম্লান, তবু হয়তো তার উজ্জ্বল অবশেষের কিছু চিহ্ন পাওয়া যাবে, পাউণ্ড চারিদিকে উৎসুক চোখে দেখলেন। অধ্যয়ন করলেন শিল্প ও সংগীতে আদর্শ সৌন্দর্যের। সংস্কৃতির সব দিক সম্পর্কে ক্লান্তিহীন আগ্রহ নিয়ে পাউণ্ড ঘুরলেন। যত আবিষ্কার করেছেন তত তাঁর মনে হয়েছে বর্তমান সংকীর্ণ, অপ্রতুল। প্রায়শ তিনি দেখলেন কুৎসিত আসবাব, বাড়ী আর নোংরা রাস্তা। এ সবকিছুই উজ্জ্বল মহান অতীতেব বিরোধিতা করছে যেন।

সুতরাং সৌন্দর্যমণ্ডিত সুষমা যাতে আনা যায় সেজন্য পাউণ্ড সচেষ্ট হলেন। Sigesmondo Malatesta পাউণ্ডের কল্পনার রঙের সুষমায় আরও রঙীন হয়ে উঠল। তাঁর কল্পনায় আরও মহত্ত্ব উজ্জ্বলতা নিয়ে দেখা দিল অতীতের বীর নায়করা, ট্রয়ের হেলেন। এই পৃথিবী যে শুধু শিল্পীদের বিরুদ্ধতা করছে তাই নয়, যাঁরা বিশিষ্ট যাঁরা প্রতিভাবান তাঁদেরও বিরুদ্ধে। অন্তর্দৃষ্টি মূল্যহীন। ১৯২০ সালে যুদ্ধশেষে ইউরোপে ফিরে এসেছে শান্তি, শ্মশানের অবসানের। সূক্ষ্মবোধ-সম্পন্ন মানুষের মনের হতাশা আরও তীক্ষ্ণ, গভীর বেদনাদায়ক। আপেক্ষিক শান্তি এবং সমৃদ্ধির যুগে যে মানুষের যাত্রা শুরু তিনি তাঁর বন্ধু ও প্রিয়জনকে নিহত হতে দেখলেন। পাউণ্ড দৃষ্টি দিলেন ইউরোপের কবিতার দিকে, ইউরোপের কবিতার ঐতিহ্য তার কাছে বিশেষ আবেদন নিয়ে এসেছিল। এলিয়টের কবিতায় আমরা সাধারণভাবে যে সব বিষয়ের সংগে পরিচিত, পাউণ্ডের কবিতায় সে সব কিছু নেই, পাউণ্ডের প্রধান বিষয় শিল্প, কবিতা তাঁর কাছে শুধুই আর্ট। কবিকে অধ্যয়ন ও সচেতন শ্রমের ভিত্তিতে কবিতাকে শিল্পে পরিণত করতে হবে। শুধু মাতৃভাষার গণ্ডির ভিতরে নয়, মাতৃভাষার সীমানা ছাড়িয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে' নিজের শিল্পকর্মকে পরিচালিত করতে হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে আধুনিক কবিতা ইমেজিস্ট আন্দোলন থেকে প্রারম্ভিক প্রেরণা পায়। ইমেজিস্ট আন্দোলন আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই আন্দোলন ভিক্টোরীয় বহুল্যতা বর্জন করে' কবিতার পরবর্তী বিকাশের পথ সূচিত করেছিল। ইমেজিস্ট আন্দোলনের প্রধান এজরা পাউণ্ড Hulme এর পাঁচটি কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রথম ইমেজিষ্ট শব্দটি ব্যবহার করেন। এর পূর্বে পাউণ্ড এবং আরও দুজন সহযাত্রী কবি কবিতা সম্পর্কে তিনটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন—বিষয়ী অথবা বিষয়গত 'বস্তু' কে সোজাসুজি গ্রহণ করা উপস্থাপনার সহায়ক নয়, দ্বিতীয়ত, এ জাতীয় কোন শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা, তৃতীয়ত, ছন্দে সংগীতের ধারাবহিকতা আনা। এ সম্পর্কে আমরা এলিয়টের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি—পাউণ্ড তাঁর সাহিত্যে সমালোচনামূলক লেখার তাৎক্ষণিকের বেশী মূল্য দিতে চান নি। আক্ষরিক অর্থে তিনি কোন প্রণালী লিপিবদ্ধ করার পক্ষে ছিলেন না—তাঁর সাহিত্য-

সংক্রান্ত আলোচনা সময়ের উপযোগী এবং তিনি এগুলো লিখেছিলেন সেই অর্থে। তবু পাউণ্ডের সমালোচনা আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না, তার দিকে আমাদের চোখ ফেরাতে হয়—সমসাময়িক সমালোচনার ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখা, বিশেষ করে কবিতা লেখার আর্ট সম্পর্কে তাঁর মতামত স্থায়ী, অখণ্ডনীয় এবং প্রয়োজনীয়। পাউণ্ডের রচনা তাঁর সময়ের দিক থেকেও প্রাসংগিক। কবিতার সমগ্রতার দিকে পাউণ্ড আমাদের যে দৃষ্টি ফেরালেন ভবিষ্যতের কোন সমালোচক তা এড়িয়ে যেতে পারবেন না। কবিতা কি ভাবে লেখা উচিত—শুধু নিজের জন্য নয়—পাউণ্ড সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। প্রত্যেকটি পরিবর্তনের মধ্যে পাউণ্ড অনুভব করেছেন তীব্র তাৎক্ষণিক প্রয়োজন। শুধু নিজের ভালো কবিতা লেখা নয়, এর মধ্যে দিয়ে সুষ্ঠু হয়ে ওঠে পাউণ্ডের গভীর আকাঙ্ক্ষা—সমবুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টিশীল মানস পরিমণ্ডলে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া।

ইমেজিস্ট আন্দোলনের প্রধান নায়ক পাউণ্ডের কবিতা এবং কবিতা-সম্পর্কিত তত্ত্ব, ইমেজ সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি বোঝবার পক্ষে জাপানী কবিতার আলোচনা সহায়ক হতে পারে। সতেরো শতকের মধ্যভাগে জাপানে ঋতু-কেন্দ্রিক হাইকু নামক ছোট কবিতার বিকাশ হয়। জাপানী কবিরা হাইকুর সীমিত বন্ধন পার হয়ে কবিতায় নিয়ে এলেন চিত্রকল্প এবং প্রতীকের ঘন বাঁধুনি। একজন জাপানী কবির কবিতার একটি ছবি—বৃক্ষশাখা থেকে ফুল ঝরে পড়ছে, ফুল ফুটছে, কবি ফিরে তাকিয়ে দেখছেন—ছোট প্রজাপতি। তিন লাইনেই এই হাইকুটি শেষ হয়েছে। আমরা বুঝতে পারি বসন্তের ঐশ্বর্য, চেরীফুল ঝরে পড়ছে, বৃক্ষশাখা পুষ্পহীন হয়ে পড়ছে। চেরীফুলের এই ঝরে-পড়া বেদনা প্রকৃতির নিয়মে অনিবার্য। প্রজাপতি নিয়ে আসছে গ্রীষ্মের প্রতিশ্রুতি, সংগে আনছে আরও সৌন্দর্য। কবির মনে হচ্ছে বৃক্ষশাখা আন্দোলিত হচ্ছে, ফুল ফুটছে, ফুল ঝরছে—এক ধরণের সৌন্দর্য আর এক ধরণের সৌন্দর্যে রূপ নিচ্ছে।

এই শতকের প্রথম দিকে পাউণ্ড জাপানী কবিতা অধ্যয়ন সুরু করেন। ১৯১৪ সালে পাউণ্ডের লেখায় আমরা দেখি তিনি প্যারিসের মেট্রো স্টেশনে কোন সময় কতগুলো সুন্দর মুখের মানুষ দেখেন। এই দৃশ্যের অনুভূতিতে তিনি

তিরিশ লাইনের দীর্ঘ কবিতায় ধরবার চেষ্টা করেন। তার একবছর পর তিনি তিরিশ লাইনের দীর্ঘ কবিতাকে সংক্ষেপ করে দু লাইনে রূপ দেন :

ভীড়ের ভিতর এইসব অপচ্ছায়ায়, মুখের পাপড়ি-ভেজা কালো শাখা।

প্যারিসের স্টেশনে পাউণ্ডের অনুভূতির এই ছবির মধ্যে আমরা শুধু শব্দ নয়, শব্দের মধ্যে দিয়ে রঙের ছটা, রঙের সুষমা যেন দেখতে পাচ্ছি। পাউণ্ডের কথায় এই রূপের সন্ধান আকস্মিকভাবে রঙের ছটা রঙের সুষমা নিয়ে আসে—পাউণ্ডের কাছে তা ছিল নতুন শব্দের সূত্রপাত, রঙের নতুন ভাষা। হাইকুর কাছে পাউণ্ডের ঋণ নির্দিষ্ট এবং গভীর। পাউণ্ডের কথায় জাপানীরা এই ধরণের জ্ঞানের সৌন্দর্য অনুভব করেছিলেন—বৃক্ষশাখা থেকে ফুল ঝরে পড়ছে, কবি তাকিয়ে দেখলেন ছোট প্রজাপতি। এরপর পাউণ্ড তাঁর টেকনিকের সংজ্ঞা দেন The 'one image poem' is a form of superposition, that is to say, one idea set on top of another, পাউণ্ডের এই মন্তব্য অন্য সহযোগী কবিদের নজর এড়িয়ে যেতে পারে নি। দীর্ঘ ইমেজিস্ট অথবা vorticist কবিতা কি হতে পারে—এই প্রশ্নে পাউণ্ড বলেছেন, জাপানীদের 'Noh' নাটকের ধারার সমগ্র নাটক একটি ইমেজে ধরা যেতে পারে। ইমেজিসমের যে ইস্তাহার পাউণ্ড প্রকাশ করেন সে সম্বন্ধে বলা যেতে পারে তার টেকনিক জাপানী, এবং যৌক্তিকতাই হচ্ছে জাপানী কবিতার বিশিষ্টতা। পাউণ্ডের ক্যান্টোতে হয়ত এই 'unifying' ইমেজ আছে।

১৯১৩ সালে পাউণ্ড ইমেজের এক সংজ্ঞা দেন যা সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত an intellectual and emotional complex in an instant of time—ইমেজ বা প্রতিমা জটিল আবেগ ও মননের মুহূর্ত প্রকাশ। বাক্‌প্রতিমা ছবির পুনর্নির্মাণ নয়—অসম আইডিয়া এবং আবেগের জটিলতারই তাৎক্ষণিক প্রকাশ। তাৎক্ষণিক এই প্রকাশ আকস্মিক যুক্তির আস্বাদ নিয়ে আসে। দেশকালের সীমার বন্ধন পার হয়ে হঠাৎ এক বিকাশের অভিজ্ঞতা, যা আমরা মহৎ শিল্পে পাই। এলিয়ট বলেছেন, 'সাধারণ মানুষের প্রেম এবং দর্শন-অধ্যয়নের মধ্যে কোন সাধারণ ঐক্য নেই। কবির মনে এই অভিজ্ঞতা নতুন এক সমগ্রতার সৃষ্টি করে, জন্ম দেয়।' স্মর্তব্য, এলিয়টের বিচার মনস্তাত্ত্বিক আর পাউণ্ডের নান্দনিক, কারণ পাউণ্ডের প্রধান বিষয় শিল্প

যদিও বলা যেতে পারে কবিতায় এর ফলশ্রুতি এক। দীর্ঘ কবিতায় পাউণ্ড যে unifying ইমেজের কথা বলেছেন তা এখানে পাই না। একথা মনে করা যেতে পারে বাক্‌প্রতিমার যে সংজ্ঞা পাউণ্ড দিয়েছেন তা হাইকু-অনুপ্রাণিত।

পাউণ্ডের Lustraর কিছু কবিতায়, এপ্রিল এবং এ্যালবা নামে কবিতা দুটোয় খুব সরলভাবে বাক্‌প্রতিমার কৌশলের ব্যবহার করা হয়েছে। চীনা ধরণের লেখা পাউণ্ডের কয়েকটি কবিতা হাইকু টেক্‌নিকে লেখা হয়েছে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাউণ্ডের বিখ্যাত Liucha কবিতা। পাউণ্ড এই কবিতায় কোমল ব্যঞ্জনার বাক্‌প্রতিমার সুন্দর পরিণতি দান করেছেন। Near Perigord কবিতার শেষ সাত লাইনে পাউণ্ডের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট। এ স্বর নিঃসন্দেহে পাউণ্ডের নিজস্ব—কিন্তু শেষ লাইনে super-positry টেক্‌নিকের জন্য কবিতার অর্থ বাক্‌প্রতিমার রূপ নেয়।

সৃষ্টিশীল অনুবাদ পাউণ্ডের কবিতার নিজস্ব ধরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পাউণ্ডের কবিতাকে তাঁর অনুবাদ-কর্মের থেকে পৃথক করা যায় না, অনুবাদ তাঁর কবিতার অংশ। পাউণ্ড যখন অন্যের অনুভূতি বা ভাব ব্যবহার করেছেন তখনই তিনি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। সম্ভবত পাউণ্ড উপলব্ধি করেছিলেন তিনি যা বলতে চান কেবলমাত্র ঐ বিশেষ পথেই বলা যেতে পারে।

'হোমেজ টু সেক্সটাস প্রপারটিয়াস' কবিতাকে সজীব শিল্পকের্মর ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে অনুবাদ বলে ধরা যেতে পারে। প্রপারটিয়াস্‌ অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে তা নিজের দাবীতে কবিতা হয়ে উঠেছে। পাউণ্ড সাহিত্যকে ব্যক্তিপ্রতিভা এবং ঐতিহ্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখেছিলেন। পাউণ্ডের নিজের কথায় সত্য আত্মপ্রকাশের জন্য একজন কামনা করে, কেউ বলে আমি হই কিংবা অন্য কিছু—কিন্তু বক্তব্য শেষ হবার প্রায় সংগে সংগে 'one ceases to be that thing', I continued in long series of translations which were but mere elaborate mask's। প্রপারটিয়াসকে কেন তিনি মুখোশ হিসেবে ব্যবহার করেছেন তা ১৯১৭ সালে বর্ণনা করেন। তখনকার কুটিল সাম্রাজ্যবাদী অপরিসীম মূর্খতার জন্য পাউণ্ডের মত আন্তর্জাতিকতাবাদীদের অনেক মূল্য দিতে

হয়েছিল। সেই দানবীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে পাউণ্ড রোমান কবিকে মুখোশ হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর কবিতার স্বপক্ষে পাউণ্ড বলেছেন প্রপারটিয়াস্ এমন কতগুলো আবেগ উপস্থাপিত করে যা আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। পাউণ্ড তাঁর নিজের অনুভূতির সার্থক রূপ দিতে পারতেন কিন্তু সাধারণভাবে তাঁর অভিজ্ঞতা মানসিক ধারণা অসীম নয়। প্রপারটিয়াসের সার্থকতা এখানেই। পাউণ্ডের শিল্পবোধ, সূক্ষ্ম অনুভূতি অর্থ খুঁজে পেল, প্রপারটিয়াসের মধ্যে এমন এক গঠন দেখলো যার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রকাশিত করলেন নিজেকে। প্রপারটিয়াসের কবির প্রচেষ্টার বিফলতা এবং সমসাময়িক জগতের স্বীকৃতির অসম্ভাব্যতা—আর সংগে সংগে ফুটে উঠেছে মৃত্যু-চেতনা। সমস্ত কিছু এক সমতলে এসেছে—এসেছে বক্তব্য, হতাশা আর বিরাগ। ভবিষ্যতের স্ব-কৃতির আশার পিছনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে হতাশা। পাউণ্ড বুঝেছেন, নিরুত্তর ছায়াদের বৃথা ডেকে ফেরা, শীর্ণ সংকীর্ণদের নিকট থেকে কোন মহৎ কথার প্রত্যাশা বৃথা। প্রপারটিয়াসের বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু তার প্রেম, আবেগ এবং সিনথিয়া। প্রপারটিয়াস্ আমাদের কাছে প্রেমের কবি। পাউণ্ড কবিতার প্রথম অংশে শিল্পের স্বরূপ এবং শিল্পীর আশা আলোচনা করেছেন। পাউণ্ডের বিষয় শিল্প এবং শিল্পীর স্বাধীনতা। শিল্পের দাবীর মধ্যে দিয়ে সভ্য প্রতিষ্ঠার বিশ্বাসের মধ্যে এক আশাহীন শূন্যতা বিরাজিত। কবিতাটির রচনাকাল ১৯১৭। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রকথিত গুরুত্বপূর্ণ কাজের উত্তরে পাউণ্ড বলেছেন তিনি যুদ্ধের গান করবেন যখন তাঁর সাথে একটি বালিকার বিষয় শেষ হবে। এ কবিতায় পাউণ্ডের দৃষ্টিভংগী ঐতিহাসিক। অতীত সম্বন্ধে কোন ভাবালুতা নেই, কোন রকমের ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ প্রপারটিয়াস্‌কে পাউণ্ড মুখোশ হিসেবে ব্যবহার করেছেন আর প্রপারটিয়াস্ নিজে অতীতেরই অন্তর্গত।

১৯০৮ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত পাউণ্ডের কর্মকেন্দ্র ছিল লণ্ডন। এই সময়ের সাহিত্য শিল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংগ্রামে পাউণ্ডের ভূমিকা ছিল অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই পাউণ্ডের দুটো প্রধান কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথমটি হোমেজ টু সেক্সটাস প্রপ্রারটিয়াস (১৯১৭), অন্যটি হিউ সেলউইন মবার্লি

(১৯২০)। নতুন কাব্যরীতির অগ্রণী পাউণ্ডের হিউ সেলউইন মর্বালি তাঁর দীর্ঘ পরিশ্রমের স্বাক্ষর বহন করছে। আপাত এলোমেলো, ছন্দ যত্নহীন। পাউণ্ডের প্রধান বিষয় শিল্প, কবিতা তাঁর কাছে আর্ট। মর্বালিতে অতীতের কবিতা এবং বিভিন্ন কবির উদ্ধৃতির ব্যাপক ব্যবহার, বিভিন্ন নাম আমাদের অপরিচিত বা দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। কিন্তু পাউণ্ডের কাছে তা নয়—এসব তাঁর কাছে অভিজ্ঞতার প্রতীক। একটি বিশেষ সংস্কৃতি অন্য ভাষার সংস্কৃতির সূত্রে আরও গভীর অর্থবহ ও জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। পাউণ্ডের কবিতার পাঠক যদি তাঁর কবিতা পড়ে' শিল্প ও সংস্কৃতির সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তাতেই পাউণ্ডের তৃপ্তি। পাউণ্ড জ্ঞানের সমুদ্রে পাঠককেও টেনে আনতে চান।

১৮৭০ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চার নিখুঁত দলিল পাউণ্ডের মর্বালি। তবু সে সময়ের মেজাজের সার্থক ছবি হলেও একজন কবিতা-পাঠক তাতে তৃপ্ত হতে পারেন না। মর্বালিতে কবিতা-পাঠক কবির মেজাজ ও অবস্থারও খোঁজ করবেন। মর্বালি পাউণ্ডের স্বচ্ছ ছদ্মবেশ। অসাধারণ সূক্ষ্ম এবং তা পাউণ্ডের নিজের গভীর অনুভূতির প্রকাশ। এই কবিতায় গভীরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত বেদনার চাপ অনুভব করি। শিল্পে নিবেদিত একটি প্রাণের ব্যর্থতা, দেউলিয়া শূন্যতার স্বীকৃতি কবিতায় বিধৃত। মর্বালি নিতান্ত ব্যক্তিগত, তবু মহান কবিতার মত নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তিজীবনের তীব্র অভীপ্সা, আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন প্রতিফলন লক্ষ্যহীনভাবে বিধৃত। ইংরেজী কবিতার রোমান্টিক ঐতিহ্যের কাল শেষ হয়েছে। তবু পাউণ্ড অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন কবিতার মৃত শিল্পকে পুনরায় বাঁচাতে। তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ, পুরোনো অর্থে মহৎকে বাঁচানোর জন্য তাঁর কামনা প্রারম্ভেই ভুল। তথাপি পাউণ্ডের আদর্শ ফ্লবেয়ার, প্রধান বিষয় শিল্প। কবি হিসেবে পাউণ্ড শুধু দেশজ সংস্কৃতিতে তৃপ্ত থাকতে পারেন নি, চীন ইটালি প্রভৃতি দেশের প্রগণী সব সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি সমান আগ্রহী। এ সবের থেকে যত কষ্টসাধ্য হোক না কেন তিনি শস্য আহরণে সচেষ্ট। পাউণ্ডের জীবন শিল্পে নিবেদিত। জীবন চলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে, কিন্তু তিনি কি পেলেন ? কবিতা তাঁকে কিছুই দিল না। নিজের জীবন-সীমা সংকীর্ণ হয়ে আসছে, সব কিছুই ঝরে পড়েছে। এই প্রস্থনা হতাশার, তবু একটি মহৎ কবিতা। মর্বালির

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কবিতায় আধুনিক পৃথিবীর সাথে পাউণ্ড আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। এ শতকের মনের জন্য এমন বিশেষ কিছু চাই, অবশ্যই তা এ্যাটিক সৌন্দর্য নয়। মানুষের গোপন স্বপ্ন বা অন্তর্মুখীন দৃষ্টির ফলশ্রুতি তারও প্রয়োজন নেই। সব কিছু নিয়ত পরিবর্তনশীল, গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের শিক্ষা পাউণ্ডের অবগত। কিন্তু টিঁকে থাকছে রুচিহীন সস্তা চাকচিক্য। এর বোধ করি কোন পরিবর্তন নেই। চারিদিকে রুচিহীন জগৎ পাউণ্ডের শিল্পী-সত্তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। যন্ত্র আজ সব জায়গা জুড়েছে—স্বর্গীয় ও আদিম সৌন্দর্য জীর্ণ—এ্যারিয়েল ক্যালিবানের নিকট পরাভূত। সৌন্দর্য বাজারের পণ্য। শিল্পীর সমস্ত অনুভূতি আজ বাধা পাচ্ছে, সত্য দৃষ্টি নেই। আমাদের সংবাদপত্র রয়েছে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও বর্তমান, নির্বাচন আছে। তবু নির্ভর করা যায় না, আমরা পছন্দ করে নি কোন প্রতারক অথবা নপুংসক যারা আমাদের শাসন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের ইউরোপ, যুদ্ধে বিধ্বস্ত তার চেহারা একদা যা ছিল উজ্জ্বল। তীব্র গভীর বিদ্রুপে পাউণ্ড লিখলেন, হে উজ্জ্বল এ্যাপোলো ঈশ্বর কি মানুষ অথবা বীর—তিনি কি দিতে পারেন? পাউণ্ড লিখলেন তিনি কি টিনের মালা গাঁথবেন! বিদ্রুপের পিছনে সংবেদনশীল পাঠক এক ব্যর্থ শিল্পে নিবেদিত প্রাণের প্রচ্ছন্ন বেদনা অনুভব করবেন।

যুদ্ধের অনিবার্য ফল নৈতিক সংকট। সূক্ষ্ম বোধসম্পন্ন মানুষের যন্ত্রণার তীব্রতা আরও গভীর। মর্বালির চতুর্থ ও পঞ্চম অংশের মর্মভেদী উচ্চারণ সম্ভবত পাউণ্ডের পক্ষেই সম্ভব। এই অংশের আবেদন গভীর ব্যাপক এবং সার্বিক। পূর্ববর্তী কবিতার অংশের তুলনায় এই অংশের পরিবর্তনের সুর দ্রুত। যুদ্ধে যারা লড়েছিলো তারা স্বদেশের জন্য হোক বা অন্য যে জন্য হোক্ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো। তারপর একদিন ফিরে আসে গৃহে। এই অংশে পাউণ্ডের নিজের ভাষায়

Walked eye-deep in hell/believing in old man's lies, then unbelieving/came home, home to a lie/home to many deceits/home to old and new infamy, / usuary age-old and age-thick/and liars in public places.

প্রতিটি শব্দ মাপা প্রতিটি শব্দচয়নের মধ্যে আছে বহু পরিশ্রম। মাত্র

কয়েকটি পংক্তি মধ্যে প্রতিভাবান কুশলী শিল্পীর মত সমগ্র অবস্থা সংহত করেছেন।

সভ্যতা আজ শতচ্ছিন্ন। কদর্য তালি তার কদর্যতাকে ঢাকতে পারছে না, বরং তা আরও প্রকট করছে। পঞ্চম অংশের শেষের দিকে ত্যাগ এবং লাভের দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধতা ঘনীভূত। এই কদর্য সভ্যতার জন্য সুন্দর মুখের হাসি নিভে গেল মাটির নীচে কবরে। এই অংশের শেষ দুই পংক্তিতে ধ্বংসের পর বিরতির ছবি।

For two gross of broken statues/For a few thousand battered books, ইউরোপীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির করুণ পরিণতি। যুদ্ধের পর যে শান্তি ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হল তার সম্পর্কে পাউণ্ডের তিক্ত মন্তব্য। আমরা বুঝতে পারি, আমাদের অনুভব করতে অসুবিধে হয় না পাউণ্ডের শিল্পপ্রচেষ্টা যা যুগের চাহিদার সংগে খাপ খায় না তা ইতিমধ্যেই ব্যর্থ। যুগের সংগে পাউণ্ডের শিল্প-প্রচেষ্টার কোন রকমের সাযুজ্য নেই। প্রারম্ভেই তিনি বুঝেছেন, ব্যর্থ সময়ের সংগে তাঁর কোন যোগ নেই, নিতান্তই যেন একজন বহিরাগত আগন্তুক তিনি। যুদ্ধের পর যে বিরতির ছবি—সেখান থেকেও তাঁর কিছু নেবার নেই। সময়ের থেকে পাউণ্ড সম্পূর্ণভাবে অ্যালিয়েনেটেড।

ষষ্ঠ ও সপ্তম অংশ যথাক্রমে **'Yeux Glauques'** এবং **'Siena mi fe, Disfecemi Maremma'** কবিতা দুটোতে শেষের দিকের ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্য সংস্কৃতির সংক্ষেপিত ইতিহাস দেওয়া হয়েছে।

'Yeux Glauquisএ

Thin like brook water, / with a vacant gaze. / The English Rubiayat was still born / In those days, নারী-সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রিরাফেলাইট ধারণা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে। ফিট্‌জেরাল্ড অনূদিত রুবাই তখন পর্যন্ত কারও নজরে পড়ে নি। পরের কবিতার 'নব্বই'-এর সাহিত্য এবং সাহিত্যিক সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বে সমগ্র কবিতার নায়ক আমাদের সামনে উঠে আসে মবার্লি ১৯২০) কবিতায়। এই কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে মবার্লির পতন দেখি। মবার্লি ক্রমশ নিজেকে আরও বেশী করে ব্যক্তিগত জগতে সরিয়ে নিচ্ছে।

সৌন্দর্যচিন্তায় নিমগ্ন থাকলে জীবনে সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতনার মূল্য দিতে হয়। আধুনিক পৃথিবী শিল্পীর টিঁকে থাকবার অযোগ্য। যা সকলের আনন্দ আনে অথবা বেদনা থেকে মুক্তি দেয়, সেই শুভ তিনি চেয়েছিলেন। সময় প্রতিকূল, সেই শুভ অনায়ত্ত রয়ে গেল। কবি ছিলেন একদা, এখন আর তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই—একজন সৌন্দর্যবাদী অপস্রয়মান হয়ে গেল।

I was / I no more exist/Here drifted/ An hedonist.

মবার্লি কবিতাটি একটি বিশেষ যুগে দাঁড়িয়ে কবির অভিজ্ঞতার নিখুঁত দলিল। কবিতা-পাঠক কবির অভিজ্ঞতার সার্থক শিল্পীরূপ হিসেবেই অবশ্য কবিতাকে বিবেচনা করবেন। মবার্লি কবিতার জটিল ভংগী, সূক্ষ্ম অনুভূতি, মর্মভেদী কণ্ঠ কখনও বিদ্রূপময়, কখনও করুণ, বিষয়ের দ্রুত পরিবর্তন, যা আধুনিক কবিতাকে সম্ভব করে তুললো—যার অগ্রণী নায়ক এজরা পাউণ্ড।

অনেক মহৎ কবিতা স্বল্প সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন শিল্পকর্ম শিল্পীর সমগ্র জীবনব্যাপী পরিশ্রম, সাধনা এবং ধৈর্যের ফসল। এজরা পাউণ্ডের ক্যান্টো তার অর্ধশতকের পরিশ্রমের ফল। পাউণ্ডের ক্যান্টো থেকে ক্রমে এটা স্পষ্ট হয়ে আসছিল, নান্দনিক কাঠামোয় একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে। ক্যান্টোর বিশেষ ফর্ম এবং কাহিনী আরম্ভ হয়েছে এক জায়গায়, অন্য এক জায়গায় সেটা আবার শুরু হয়েছে, হয়ত তা শেষ হল অন্যত্র। এই ধরনের স্বেচ্ছাকৃত বিযুক্তিকরণ, শিল্পকর্মের স্বেচ্ছাকৃত পরোক্ষ উল্লেখের পদ্ধতিতে সমগ্র ক্যান্টো যুক্ত। পাঠকের মন যখনি কবিতার বিষয়বস্তুর সংগে যুক্ত হয়েছে তখনি পাউণ্ড স্বেচ্ছাকৃতভাবে তা বিযুক্ত করেছেন। নতুন বিচ্ছিন্ন অসম্বদ্ধ বিষয় কিংবা পুরোনো আপাত-বিচ্ছিন্ন অসম্বদ্ধ বিষয় নিয়ে আসেন।

পাউণ্ড ক্যান্টো লিখতে শুরু করেন ১৯১৫ থেকে, ইতস্তত ছড়ানো বাক্‌প্রতিমার নুড়ি। ইতিহাস, সাহিত্য থেকে পাউণ্ড বাক্‌প্রতিমা সাজান। পিসান ক্যান্টোজএ বন্দী কবি জীবজন্তু, কীটপতংগ, ধরিত্রীর আলো প্রভৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করেছেন। ক্যান্টোজকে কেউ কেউ বলেছেন—**timelessness** এর প্রকাশ। ক্যান্টোজে এসেছে অর্থনীতি, শিল্প, ইতিহাস, ক্যান্টো কি পাণ্ডিত্যের অসার্থক চিত্র নাকি সার্থক শিল্প, ধৈর্য নিয়ে এগোলে আমরা, পাঠকরা পাউণ্ডের বক্তব্যের সামগ্রিকতা খুঁজে পাব।

রজনীকান্তের কাব্যসংগীত

স্বপ্না মজুমদার

রজনীকান্ত সেন বাংলাদেশে অতি পরিচিত একটি গৃহনাম। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। রবীন্দ্র সমকালীন গীতি কবি-গোষ্ঠির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ উল্লেখযোগ্য। নজরুল কিছু পরবর্তীকালের। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কেবলমাত্র গীতিকবি হিসেবেই নয়—বাংলা নাট্যসহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা সর্বজন-বিদিত, যদিও তার মধ্যে গীতি-প্রতিভার প্রশ্নটি নিহিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ তো বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতি জীবনে একটি বিশেষ অধ্যায়েরই জন্মদাতা। নজরুলেরও, সংগীত জগতের বাইরে, সাহিত্য জীবন ব্যাপ্ত ছিল নানাভাবে। ব্যতিক্রম অতুলপ্রসাদ এবং রজনীকান্ত। অতুলপ্রসাদের প্রতিভা কেবলমাত্র সংগীতের মাধ্যমেই বিকশিত। রজনীকান্তের গীতিকবিতার বাইরেও কিছু কবিতা আছে ঠিকই, তাঁর পরিচয় কিন্তু প্রধানত গীতিকবি হিসেবেই।

আত্মপ্রচার-বিমুখ সদাহাস্যালাপী এই মানুষটির জন্ম পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ গ্রামে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং জলধর সেন তাঁকে সাহিত্যমহলে পরিচিত করান। রজনীকান্তের কাব্য এতই সরল সহজ বর্ণ-বৈভবহীন যে অনেকের ভিড়ে সহসা চখেই পড়ে না। কবি হিসেবে বঙ্গ সমাজে তৎকালে তিনি পরিচিত হলেও, মূলত সংগীতের মাধ্যমেই তাঁর যথার্থ অন্তরঙ্গ পরিচয়।

রজনীকান্তের কাব্যসংগীতের কথা এবং সুরের বিচার বিশ্লেষণে একটি সমস্যা আছে। রজনীকান্তের কাব্যসংগীতের পরিচিতি বর্তমানকালে সীমায়িত। সংখ্যার তুলনায় তাঁর গানের স্বরলিপি এবং প্রচার নিতান্তই কম। কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত প্রমথনাথ বিশীর 'কান্ত-কবি রচনা-সম্ভার' গ্রন্থ থেকে গীতিকবিতা হিসেবে সেইগুলিকেই গ্রহণ এবং বিচার করা সঙ্গত বলে মনে হয়েছে যেগুলি গান হিসেবেও সুপরিচিত। প্রকৃতপক্ষে সুরাশ্রিত গীতিকবিতার বাইরে রজনীকান্তের যে বিপুল কাব্যভাণ্ডার সেখানে প্রবেশ করে' তাঁর কবিপ্রতিভার

মূল্যায়ন—সহজসাধ্য নয়। এবং কিয়দংশে অনাবশ্যকও বটে। বাংলাদেশের মানুষ কান্ত কবির গানকেই অন্তরে গ্রহণ করেছে। সুতরাং গীতি-সত্তার বিশ্লেষণেই রজনীকান্তের প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন—একথা মেনে নিয়েই তাঁর কাব্য-সংগীতগুলির কথা এবং সুর-ভিত্তিক আলোচনা করা হবে।

রজনীকান্তের ব্যক্তিজীবন সহজ সরল একমুখীন। তিনি বৈঠকী, সদালাপী, সংগীত রসিক, বন্ধুবৎসল এবং পরোপকারী ছিলেন। পেশা ছিল ওকালতি। কিন্তু ওকালতির জটিল আইন-কানুনের মার-প্যাঁচে তাঁর স্নিগ্ধ রসসিক্ত অন্তর কোনোদিনই বাঁধা পড়ে নি। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের একটি চিঠি উল্লেখযোগ্য। চিঠিটি দীঘাপাতিয়ার শ্রীশরৎকুমার রায়কে লেখা

'কুমার, আমি আইন ব্যবসায়ী, কিন্তু ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ওই ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম। কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম। আমার চিত্ত তাই লইয়াই জীবিত ছিল। ....'[১]

রজনীকান্ত ছিলেন আত্মসমাহিত পুরুষ। অমৃতের অন্বেষণে তাঁর প্রাণযাত্রা ছিল অফুরান। 'বাণী' (১৯০২) কল্যাণী' (১৯০৫) তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহে প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (১৩১৫, ২১শে অঘ্রাণ) কলকাতার সুধীসমাজ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রাজশাহী সাহিত্য সম্মেলন (১৮ ও ১৯শে মাঘ, ১৩১৫) রজনীকান্ত'ক সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত করে দিল। কিন্তু তাঁর জীবনদীপ অকালেই নির্বাপিত হয়। দুরারোগ্য ক্যানসার ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া, কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের 'কটেজে' জীবনের শেষ কয়েকমাস অতিবাহিত করা, বিভিন্ন গুণীজনের সান্নিধ্য, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বিখ্যাত সেই চিঠি—ইত্যাদি বহু পরিচিত তথ্যের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। এই প্রবন্ধে তাঁর কাব্যসংগীত সমূহকে কয়েকটি ভাগে বিচার করে বিশ্লেষণ করা হবে। প্রথমে কাব্যাংশের আলোচনা, পরে সুরের আলোচনা।

রজনীকান্তের কাব্যসংগীত দেশপ্রেম, হাস্যরসাত্মক এবং অধ্যাত্মচিন্তা—

মূলত এই তিন শ্রেণীতেই বিভক্ত। মানবপ্রেমগীতি তিনি প্রায় রচনা করেন নি। হাস্যরসাত্মক গান রচনার প্রেরণাও প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলালের কাছ থেকে পাওয়া। দেশপ্রেম তখন যুগজীবনে স্বতঃই প্রকাশিত। রজনীকান্ত তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

রজনীকান্তের দেশপ্রেম অতীত স্মৃতিচারণে এবং সমকালীন অধোগতি নিরীক্ষণে ব্যক্ত।

'পর পদতল লেহন পটু স্বজন বন্ধু যারা
দৈন্য-দুঃখ আনিল গৃহে এমনি লক্ষ্মীছাড়া।'

এই চিন্তাধারা থেকেই তাঁর দেশপ্রেম মূলত উৎসারিত। রজনীকান্তের পূর্ববর্তী কবিরা বাংলা কাব্যে দেশপ্রেমের বর্ণনায় যে ওজস্বিতা শৌর্য, বীর্য ইত্যাদির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, রজনীকান্তের কোমল স্নেহপ্রবণ অন্তরের তীব্র অনুভূতি ক্ষোভে ও আক্ষেপের নিরতিশয় গ্লানিতে মর্মান্তিক বেদনা বিদ্ধ না হয়ে অনুরোধ ও মিনতির সজল কারুণ্যে মর্মস্পর্শী হয়েছে। অবশ্য তাঁর কিছু কিছু গানে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশচিন্তার প্রভাব বর্তমান। যেখানে তিনি অতীত ভারতের কীর্তি, গৌরব-গাথা প্রকাশ করেছেন, সেখানে ভাষায়, চিত্রকল্প রচনায় তিনি বহুলাংশেই দ্বিজেন্দ্রলালের অনুগামী

জলধি-নীলে বক্ষো-নিমগ্না স্বর্ণোমাতা বন্দে
বিহগ ছন্দে মন্দ সমীরণ, সিঞ্চিত কুসুম-সুগন্ধে।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই বর্ণনার প্রায় সমধর্মী রজনীকান্তের গীতি-কবিতার উল্লেখ করা যায়:

১. ধূর্জটি বাঞ্ছিত হিমাদ্রীমণ্ডিত, সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য বিলম্বিত
অলিকুল গুঞ্জিত সরসিজ সঞ্চিত—

২. দক্ষিণে সুবিশাল জলধি চুম্বে চরণতল নিরবধি
মধ্যে পূত-জাহ্নবী জল-ধৌত শ্যামল ক্ষেত্র সংঘ।

৩. হে ভারত চির দুখ শয়ন বিলীন
নীতি-ধর্মময় দীপক-মন্ত্রে
জীবিত কর সঞ্জীবনী মন্ত্রে
জাগিবে রাতুল চরণতলে, যত লুপ্ত পুরাতন গরিমা।

উল্লিখিত উদ্ধৃতি দ্বিজেন্দ্রলালের বর্ণনাভঙ্গি ও চিত্রকল্পকে স্মরণ করায়। অতীত কীর্তি স্মরণ এবং বর্ণনাই এখানে কবির উদ্দেশ্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে যখন বাঙালীর স্বদেশানুরাগ নিজস্ব জীবনকেন্দ্র থেকে, স্বকীয়ভাব কল্পনার মাধ্যমে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, সেই সময়ে রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই"—গানটি আন্তরিক অনুরাগের গাঢ়তায় বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। এই গানটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যের একটি কবিতার বক্তব্যের কিছু সাধর্ম আছে মনে হয়

পুণ্য হস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটিতে তিনি বাঙালীর চিত্ত জয় করেছিলেন। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সংকল্পে বাঙালীর চিত্তের দৃঢ়তা তখন এই গানটিকে গ্রহণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য .

"কান্ত কবির 'মায়ের মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সংগীত সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে সকল গান ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুলবাগানে প্রাতঃ সূর্যের মৃদুকিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যে গান দৈববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যৎ বাণীর মত সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে, নিয়তির বিধান আছে, ...স্বদেশী যুগে বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোন গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য ও সফলতায় এমন চরিতার্থ হয় নাই—তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দেশ করি।"[২]

এই ধরণের আরও কয়েকটি গানে রজনীকান্তের কবিধর্মের প্রকাশ দেখা যায়। রজনীকান্তের সরল অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গি, অন্তরের মুগ্ধ আবেগকে কাব্যে সার্থক রূপদান করেছে। অন্তের অনুস্মৃতির বাইরে, যে সব দেশাত্ম বোধক গান—যেমন, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় এবং নিম্নলিখিত গানগুলি তাঁর কবিত্ব শক্তির যথার্থ পরিচয়, সেই গুলিতেই :

১. আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট
 তবু আজি সাত কোটি ভাই জেগে ওঠো।
২. তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত
 মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব, মার বাগানের কলার পাত।
৩. আয় ছুটে ভাই হিন্দু-মুসলমান
 ওই দেখ মার ঝরছে দু' নয়ান
৪. রে তাঁতীভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস
 ঘরে তাঁত যে কটা আছেরে তোরা স্ত্রী-পুরুষে বুনিস।
৫. আব কিসের শঙ্কা বাজাও ডঙ্কা প্রেমেরি গঙ্গা বোক্
 মায়েরি রাজ্যে মায়েরি কার্যে ফুটেছে যে আজ চোখ।
৬. ফুল্লার করলে হুকুম জারি,
 মা বলে ডাকবে রে তার শাস্তি হবে ভারি।

শেষোক্ত গানটির পটভূমি তৎকালীন বঙ্গ সমাজে সর্বজনবিদিত। নব জাগ্রত বাঙালীর দেশাত্মবোধের কণ্ঠরোধ করতে বিদেশী সরকার ছিলেন উদ্যত। 'বন্দেমাতরম্' শব্দ উচ্চারণ যেদিন আইনসম্মত অপরাধ বলে ঘোষিত হয় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

"The months that followed the 19th, October 1905, were months of great excitement and unrest. The policy of the Government especially that of East Bengal under Sri Bampfylde Fuller, added to the tension of the situation.......The partition was followed by a policy of repression which added to the difficulties of the Govern-

ment and the complexities of the situation. The cry of *Bande Mataram* as I have already observed was forbidden in the public streets and public meetings in the public places were prohibited.'[৩]

উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কবির অন্তরের আবেগ গাঢ় হয়ে উঠলো একটি গানে। বেদনায় জীর্ণ কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন তিনি :

'বন্দেমাতরম্' ত' শুধু মায়ের বন্দনাই
এতে তো ভাই সিডিসনের নাম কি গন্ধ নাই।
তবে কেন তা নিয়ে ভাই, এত মারামারি
হাজার মার, 'মা' বলা ভাই কেমন করে ছাড়ি ?

এ ছাড়া, 'তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরসা' এবং 'সেথা আমি কি গাহিব গান'—এ দুটি গানও সমকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'তব চরণ নিম্নে' গানটির জন্মবৃত্তান্ত আশ্চর্যজনক। রাজশাহীর লাইব্রেরীতে সভায় যাবার মাত্র একঘণ্টা আগে বসে কান্তকবি গানটি রচনা করেন। গানটি তাঁর অনায়াস কাব্যরচনার অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রজনীকান্তের স্বদেশ চেতনার এবং স্বদেশী সংগীতের সাহিত্যমূল্য নির্ধারণ করা যায়।

১. রজনীকান্তের স্বদেশচেতনা সমকালীন যুগপ্রভাবেই অভিব্যক্ত। কেননা তিনি যে অর্থে অধ্যাত্মমার্গের সরল সহজ অনুভবী কবি, ততোধিক গভীরতর অর্থে সম্ভবত তিনি দেশপ্রেমের কবি নন। তাঁর চিত্তে নির্মল শুদ্ধ শান্ত ভক্তিরস উৎসারিত ছিল নিয়ত, তিনি ছিলেন নিরুত্তেজিত, কোমল, মরমী। দেশপ্রেমের কিছু কিছু গান, তাঁর আবেগের শুদ্ধতায় অপূর্ব হয়েছে, মর্মস্পর্শী হয়েছে অনুভবের তীব্রতায়। কিন্তু স্বদেশচেতনা তাঁর কবিপ্রতিভার অন্যতম পরিচয় নয়।

'রজনীকান্ত স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় দেশপ্রেমের গান লিখেছিলেন। কিন্তু সেখানেও কোনো উত্তেজনার উগ্রতা ছিল না (যা সে যুগে অনেকের গানেই লক্ষ্য করা যায়)।'[৪]

২. রজনীকান্তের দেশপ্রেমের গানগুলির সাহিত্যমূল্য বিশ্লেষণ করতে

বললে একটি বৈশিষ্ট্যই উল্লেখ করা যায়, তাঁর দেশাত্মবোধক কাব্যসংগীত কিছু পরিমাণে বক্তৃতাধর্মী এবং অলংকারযুক্ত। বর্ণনাবহুল ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই সরল আবেগের প্রতিবন্ধক।

'দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানের আদর কমিয়াছে, স্বদেশীযুগের অবসান তাহার কারণ নয়, উহার বক্তৃতাত্মক ছাঁচটাই তাহার কারণ। ঐ একই কারণে রজনীকান্তের স্বদেশীগানের সে আদর আর নাই। কাল ও ছাঁচ দুই-ই চিরকালীন সমাদরের অন্তরায়।'[৫]

দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসরণে তিনি যেসব দেশাত্মবোধক কাব্যসংগীত রচনা করেছিলেন, সেগুলি সম্বন্ধে এ মন্তব্যটি প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত আর একটি মন্তব্যের উল্লেখ করা যায়:

'রজনীকান্তের স্বদেশ-বিষয়ক গানে, এমনই ব্যক্তিগত সুরের চেয়ে ফুটে উঠেছে সার্বজনীন স্বদেশানুভূতির সুর। তিনি আমাদের জীবনতন্ত্রীর ঠিক তন্ত্রীটিতে ঘা দিয়ে ঠিক সুরটিকে বাজিয়ে তুলেছিলেন। স্বদেশ কাব্যের কথা নয়, পুরাণের কথা নয়, ইতিহাসের রোমান্স নয়, সম্ভ্রমের বস্তু নয়, স্বদেশ আমাদের দীন জননীরূপে একান্ত আপনার হয়ে দেখা দিলেন। এই জন্যই রজনীকান্তের স্বাদেশিক সুরটি এত মর্মস্পর্শী।'[৬]

উল্লিখিত মন্তব্যটি, রজনীকান্তের সমস্ত দেশপ্রেমের সংগীত সম্বন্ধে বোধ করি প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রমথনাথ বিশীর সূত্র অনুসরণে, যেখানে তিনি বক্তৃতাত্মক ছাঁচে কাব্য রচনা করেছেন, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষাভঙ্গি অনুকরণে দেশমাতার ছবি এঁকেছেন, সেখানে তিনি পুরাণ, ইতিহাস, রোমান্সের অনুগামী:

> "সামগান-রত আর্য তপোবন
> শান্তি সুখান্বিত কোটি তপোবন
> রোগ শোক দুখ-পাপ বিমোচন।

এখানে তিনি স্পষ্টতই অতীতচারী। ভবতোষ দত্তের মন্তব্যের শেষাংশের অনুসরণে রজনীকান্তের কিছু দেশপ্রেমের গানকে নিশ্চিত গ্রহণ করা যায়। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' ইত্যাদি গানগুলি স্মর্তব্য (পূর্বালোচিত)। এই ধরনের গানে অবশ্যই স্বাদেশিকতার সুরটি মর্মস্পর্শী।

হাস্যরসাত্মক গানের আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের প্রভাব রজনীকান্তে অত্যন্ত স্পষ্ট। হাস্যরসের মূলে থাকে অসংগতি। ব্যক্তিজীবনের আচরণ থেকে অসংগতি আসে। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি সর্বত্র নানান্ অসংগতি রয়েছে এবং সেই অসংগতি থেকেই মূলত হাস্যরসের উদ্ভব হয়। রজনীকান্ত প্রধানত সমাজজীবনের অর্থহীন গোঁড়ামি, ভ্রান্ত সংস্কার, মিথ্যা আচার বিচারের তুচ্ছতাকে ব্যঙ্গ করেই হাসির গান রচনা করেছেন। যেমন, নব্য আধুনিকতায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের ভণ্ডামি, মদ্যপায়ী লম্পটের কাহিনী, দেশব্রতের নামে আত্মসুখের অন্বেষণ, ছদ্মবেশধারী সন্ন্যাসী, বাংলাদেশের পণপ্রথার নিষ্ঠুরতা—এই সমস্ত বিষয়কে অবলম্বন করে তিনি নিষ্ঠুর কশাঘাত করেছেন। শ্লেষের বাণে বিদ্ধ করেছেন সমাজের এই নির্মম অবিচারকে

> "সেই মহাশয়, সংগোপনে মদটা, আসটা টানে
> নিষ্ঠাবান, যে কুক্কুট্ মাংসের মধুর আস্বাদ জানে।
> রসিক সেই, যার ষাট বছরে আছে পঞ্চম পক্ষ
> সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্টা হুঁকো যার উপলক্ষ।"

কিম্বা

> "যেহেতু আমরা 'হ্যাটে' ঢাকি টিকি
> সাদা জামা রাখি শরীরে
> (আর) 'শাণ্টপো' বলি 'শান্তিপুর' কে
> 'হ্যাবি' বলে ডাকি 'হরিকে'।

এই ধরণের ব্যঙ্গ ছাড়া রজনীকান্তের কিছু বিশুদ্ধ কৌতুকের গান আছে, যেখানে ব্যঙ্গ বিদ্বেষের বিষজ্বালা অনুপস্থিত। ব্যাকরণে উদ্ভট আসক্তিকে কেন্দ্র করে' তিনি একটি নির্মল হাস্যরসের কবিতা রচনা করেন।

বিরহাকাতরা স্ত্রীকে বৈয়াকরণ স্বামীর লেখা চিঠিটি উল্লেখ করছি :

> 'অধ্যয়ন উঠেছে চাঙ্গে, রেতে যখন নিদ্রা ভঙ্গে
> লুপ্ত 'অ' কারের মত মরে থাকি জ্যান্ত
> এ যে সন্ধিবিচ্ছেদের রাজা, কবে হব কর্তৃবাচ্য
> বিরহ অসমাপিকা ক্রিয়া, পাইলে অন্ত।

প্রিয়ে, তুমি আছ কুত্র, খেয়েছি সব মূল সূত্র
পেয়ে তোমার প্রেমপত্র, কচ্ছি হাহা হুত।'

ইতিহাস অথবা পুরাণের প্রসঙ্গেও কোথাও কোথাও নির্মল হাস্যরসের অবতারণা দেখা যায় '

..... বাজা অশোকের কটা ছিল হাতি
টোডরমল্লের কটা ছিল নাতি,
কালাপাহাড়ের কটা ছিল ছাতি
এসব করিয়া বাহির
বড় বিদ্যে করেছি জাহির।"

মনে হয় কান্তকবির স্বভাবধর্মে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ঠিক মানাতো না। তাই তাঁর ব্যঙ্গরসাত্মক হাসির কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসৃতি সমধিক। কিন্তু যেখানে কোনো ক্ষোভ অথবা ব্যঙ্গ বিদ্বেষ নেই, কেবল নির্জলা কৌতুকরস পরিবেশনই কবির উদ্দেশ্য—সেখানে কারো অনুকরণ নয়, কান্তকবির স্নিগ্ধ সমবেদনা এবং সহানুভূতির অশ্রুজলে হাসি অশ্রু মিশে একাকার। সেখানে কবি স্বতন্ত্র :

'যদি কুমড়োর মত চালে ধ'রে র'ত
পানতোয়া শত শত
আর সরষের মত হত মিহিদানা
বুঁদিয়া বুটের মত।'

'তা মেয়ের বিয়ে তোমার গরজ, তোমার প্রয়োজন
... ডজন বিশেক হুইস্কি রেখো
নইলে বড় প্রমাদ, দেখো।
কি করব ভাই, দেশের আজকাল এমনি চালচলন
কেবল চক্ষু লজ্জায় বাধ বাধ ঠেকছে যে কেমন।'

এখানে আহত কবিসত্তার সহানুভূতিশীল অন্তরটি রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করতে পারবেন। রজনীকান্তের হাস্যরসের মূলে ছিল বেদনাবোধ :

'হাসির গানের ব্যপদেশে রজনীকান্ত সমাজের ক্ষত স্থানগুলি নির্দেশ করিয়া তাহাতে ঔষধ প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মুখে 'বরের দর' সংগীত শ্রবণ করিয়া এক বিবাহ সভায় বরকর্তা যৌতুকের ফর্দ সংক্ষেপ করিতে বাধ্য

হইয়াছিলেন, এইরূপ শুনিয়াছি। 'বরের দর' কবিতাটির শেষ পংক্তি এই—'দেশের দশা হেরে কাও করে অশ্রু বরিষণ'—এইখানে কবি নিজের হৃদয় প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি হাস্যরসের আবরণ দিয়া রজনীকান্ত তাঁহার মর্মবেদনাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কৌতুক হাসির সঙ্গে বেদনার অশ্রু মিশ্রিত। কমলাকান্তের ভাষা ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া রজনীকান্ত বলিতে পারিতেন 'হাসির ছলনা করিয়া কাঁদি।'[৭]

"তাঁহার হাসির গান মূলে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও, এক জায়গায় রজনীকান্তের জিৎ। তাঁহার হাসিতে করুণায় যেমন মাখামাখি, দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যদি শুষ্ক শীতের বাতাস হয়, রজনীকান্তের হাসির গান বর্ষার জলভারাক্রান্ত পূবে বাতাস।"[৮]

উল্লিখিত উক্তি দুটিই রজনীকান্তের হাসির গানের মূল বৈশিষ্ট্য।

কান্তকবির সমগ্র রচনা সম্ভার থেকে বিশুদ্ধ মানবপ্রেমের গান খুঁজে বার করা দুরূহ। তবু কয়েকটি গানকে আমরা এই পর্যায়ের বলে গ্রহণ করে থাকি:

১. প্রাণের পথ ব'য়ে গিয়েছে সে গো
চরণ চির রেখা আঁকিয়ে যে গো।

২. মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়
জমায়ে চাঁদের সুধা বিধি গড়েছিল তায়।

৩. স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি
রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া।

৪. সখি রে মরম পরশে তারি গান।

৫. নয়নের বারি নয়নে রেখেছি,
হৃদয়ে রেখেছি জ্বালা।

৬. রূপসী নগরবাসিনী
শূন্য কক্ষে কেন একাকিনী বিষাদিনী।

৭. পরশ লালসে অবশ আলসে
ঢলিয়া পড়িত আমারি অঙ্গে।

৮. এস এস কাছে, দূরে কি গো সাজে।

৯. আর কি আমাকে দিতে পারে সে মনোবেদনা।

১০ কি মধু কাকলি ওরে পাখী
তোরে হৃদয় মাঝারে ধরে রাখি।

মূলতঃ প্রাচীন বাংলার প্রেমসংগীতের বিষয়বস্তু, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব-ভাবনাকে কেন্দ্র করে তিনি বিরহ-পীড়িত নরনারীর ছবি এঁকেছেন। 'মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়'—এটি প্রসিদ্ধ একটি প্রাচীন প্রেমসংগীত। রজনীকান্ত তার পাদপূরণ করেছেন। 'সখি রে মরম পরশে তারি গান', 'পরশ লালসে, অবশ আলসে, ঢলিযা পড়িত আমারি অঙ্গে', 'জনম জনম ভরি নদী গিরি কানন', 'নয়ন মনোহারিকে'—এই গানগুলিতে বৈষ্ণবীয় প্রেমভাবনা কোথাও কোথাও ছায়া ফেলে গেছে। শুধু বক্তব্যে নয়, কথায়, ছন্দে বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব রয়েছে। প্রেমসংগীতগুলির মধ্যে 'স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি' এবং 'সখি রে মরম পরশে তারি গান' এবং 'আর কি আমাকে দিতে পারে সে মনোবেদনা' এই গান তিনটি অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য।

প্রকৃতপক্ষে রজনীকান্ত মানবীয় প্রেম ভালবাসাকে কেন্দ্র করে সার্থক কাব্যসংগীত রচনা করেন নি। দুটি নরনারীর আবেগঘন উত্তাপকে ভাষায় শুদ্ধ কাব্যের রূপ দিতে তিনি পারেন নি। রজনীকান্তের সমগ্র কবিচেতনা ছিল সেই পরমপুরুষ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিনিঃশেষ আত্মসমর্পণে স্থির অবিচল। মানবপ্রেমভাবনামূলক গান কটিতে তাঁর কবির বৈশিষ্ট্য কোথাও ধরা পড়ে নি। নিধুবাবুর টপ্পা বা শ্রীধর কথকের প্রাচীন বাংলা গানে যে প্রণয়-ভাবনা প্রকাশিত, রজনীকান্তের কাব্যসংগীতে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই। মানব-মানবীর প্রেমমুগ্ধ অন্তরের ভাবের বিলাস কখনো তাঁকে আকৃষ্ট করে নি বলেই মনে হয়। বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর শাস্ত্ররসাশ্রিত প্রেমভাবনা, তাঁর মানব-প্রেমের গান ক'টি রচনার মূল উৎস।

'আত্মকেন্দ্রিক প্রণয়লীলা নিয়ে রজনীকান্ত কাব্য লিখতে উৎসুক ছিলেন না। প্রেমমূলক কবিতা তাঁর রচনায় বিরল, যদিও আধুনিক কাব্যে প্রেমই একটি অতি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে।'[৯]

রজনীকান্তের মূল পরিচয়, তিনি ভক্তিরসের কবি। তাঁর অধ্যাত্মচিন্তার স্বরূপ-

বিশ্লেষণ করতে আমরা কিছু ভক্তিরসের গান বেছে নিয়ে বক্তব্য বিচার করবো। মনে হয়, তাতে কান্তকবির আধ্যাত্মিক ভাবনার মূল সূত্র পাওয়া যাবে :

১. ধরে তোল কোথা আছ কে আমার
এ কি বিভীষিকাময় অন্ধকার

২. তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে, মলিন মর্ম মুছায়ে।

৩. আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে
তুমিই অভাগারে চেয়েছ।

৪ ওই বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু
দেখাও তব চির আলোক লোক।

৫. আমি অকৃতী অধম বলেও তো কিছু
কম করে মোরে দাও নি।

৬ লোকে বলিত তুমি আছ
ভেবে দেখি নি আছ কিনা।

৭ ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়।

৮ এ পাতকী ডুবে যদি যায়
অন্ধকার চির মরণ স্নিগ্ধ নীরে
তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে না তায়।

৯ প্রেমে জল হয়ে যাও গলে।

১০. আমি সকল কাজের পাই হে সময়
তোমারে ডাকিতে পাই নে

১১. পাতকী বলিয়ে কিগো পায়ে ঠেলা ভাল হয়।

১২. যদি মরমে লুকায়ে রবে, হৃদয়ে শুকায়ে যাবে
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো।

১৩. কেন বঞ্চিত হব চরণে।

১৪ কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে।

১৫. এই তপ্ত মলিন চিত বহিয়া এনেছি তব
প্রেম অমৃত মন্দাকিনী তীরে।

১৬. পাপ রসনারে হরি বল।

১৭. সাধুর চিতে তুমি আনন্দ রূপে জাগ
ভীতি রূপে জাগ পাতকীর প্রাণে।

উল্লিখিত গানগুলির বক্তব্য বিষয়কে একসঙ্গে সাজালে এই রকম দাঁড়াবে: এই বিভীষিকাময় অন্ধকারে বিপন্ন পথভ্রান্ত আমি, আমাকে ঈশ্বর তুমি রক্ষা কর। আমি পাতকী, লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনকে সর্বপ্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত করে' তোমার মঙ্গল করস্পর্শে শান্তি দাও। তোমাকে আমি চাই নি, তুমিই আমাকে চেয়েছ, এ পাতকীর বোঝা তুমি হাসিমুখে বহন করেছ। বিপথগামী কলুষ সত্তাকে তুমি কখনো ত্যাগ করো নি। এই নিঃসীম অন্ধকার রাজত্ব থেকে তুমি আমাকে আলোকের পথে নিয়ে যাও। তোমার সকাশে উপনীত হওয়ার প্রতিবন্ধকতা তুমি দূর কর। তোমার কাছেই শান্তির সুখসুবিধা, তুমি আমাদের মিলনকে ত্বরান্বিত কর। আমি তো অকৃতি অধম, তবু তুমি আমার দুহাত ভরে দিয়েছ। বিনিময়ে আমি তোমায় কিছু দিই নি। তোমার আশীর্বাদকে করেছি হেলা, সুধাপান করেও আমার তৃষ্ণার নিবৃত্তি নেই, তুমি আমায় স্নেহের বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছ, আমি তা অগ্রাহ্য করেছি, তবু তুমি আমাকে ত্যাগ কর নি। সবাই বলতো তুমি আছ, আমি তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভেবে দেখি নি, এখন দেখছি, তুমি ছাড়া গতি কোথায়? তোমারই দেওয়া অন্নে, জলে, ফুলে, বাতাসে আমার জীবন ধারণ, তবু তোমার মহিমা গাই নে আমি এমনই অধম। সবাই তোমার কাছে ধন-জন-মান স্বাস্থ্য আয়ু—কত কী চায়, ওরা জানেও না। তোমার কাছে কী অসার বস্তু ওরা চাইছে, তুমি করুণার নাথ, তোমার কাছে সেই মহাসম্পদ রয়েছে যাতে মানুষের চিরতৃষ্ণা মেটে। এ হতভাগাকে তুমি তাই দিও। যদি এ পাতকী ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, তাতে তোমার গৌরব বাড়বে না। মোহের অন্ধকারে আমি ব্যাপ্ত, দিন শেষ হয়ে আসছে, যদি এ দুষ্কৃত পতিতকে তুমি চরণে স্থান না দাও—আমার কি উপায় হবে? ভালবাসার আবেগে পরিস্নাত হতে হবে, শুদ্ধ হতে হবে, বিশ্বাস দিয়ে জয় করতে হবে অবিশ্বাসকে। প্রেমের এই জলধারায় সকলের মনের ময়লা দূরীভূত হবে, সেই মহা পরিণাম সিন্ধুতে সবাই মিলবে একসঙ্গে। আমি সারাদিনের

সব কাজের মধ্যে তোমাকে ডাকার সময় পাই নে—এ আমার অকপট স্বীকারোক্তি। গরল পান করি, তবু অমৃত পান কবি নে, পথে বিপথে ঘুরে বেড়াই তবু তোমার চবণে আত্মসমর্পণ করি নে। আমি তো পাতকী, অধম, তাই বলে তুমিও আমাকে পায়ে ঠেলবে। আমি সব হারিয়ে জীবনের শেষ সময়ে তোমার পায়ে স্থান নিয়েছি, তোমাকে ডাকতে সময় পাই নি, কবে তুমি আমাকে ত্যাগ করবে? যদি তোমাব দেখা নাই মিলবে, যদি পাতকীর গতি তুমি না কববে, তাহলে তোমার নাম পতিতপাবন কেন? তোমার চরণ থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না। যদি তোমার খেয়া বন্ধ থাকে, তাহলে জীবন সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে এ পাতকীর কোন্ গতি হবে? তোমার অস্তিত্ব যদি মিথ্যে হয়, এ বেদনা রাখবো কোথায়? কবে এই তৃষিত জীবন প্রাঙ্গন থেকে তোমার আনন্দ নিকেতনে যাত্রা করবো? আমার তপ্ত আকুল চিত্ত তোমার পদতলে সমর্পিত, তুমি তাকে শুদ্ধ করে গ্রহণ করো। আমার পাপ রসনায় হরিনাম উচ্চারিত হোক্, তুমি বিপদভঞ্জন, আমাকে রক্ষা করবে। তুমি সাধুব কাছে আবদ্ধ, পাপীর চিত্তে দারুণ ভীতি, আমি এমনই নির্বোধ স্থূল আকারে তোমাকে দেখতে চাই।

এই ভক্তিচেতনার মূল কথা এইরকম সংসারেব পাপকুণ্ডে নিমজ্জিত কবি, ঈশ্বরই একমাত্র পাবেন তাঁকে উদ্ধার করতে, মালিন্য থেকে পরিশুদ্ধ কবতে। নইলে সবাই তাঁকে করুণাময় বলেছে কেন? কবি এই বিশ্বাসে অটুট।

বজনীকান্তের সমগ্র বচনা-সম্ভারের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে ভক্তি-রসের গান। উদ্ধৃত এই গানগুলির বক্তব্যেবই অনুস্মৃতি সমগ্র অধ্যাত্মগীতি সংকলনে। মনে হয়, কবি যেন কোনো দুঃসহ যন্ত্রণার ভারে ব্যথাহত। প্রচণ্ড আত্মগ্লানিতে পীড়িত। ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরেছেন স্থিব বিশ্বাসে, একমাত্র পরিত্রাতা তিনিই। তাঁর কাব্যসংগীতের মূল ভাবনাই ছিল ঈশ্বর অনুরক্তি। তাঁর সমগ্র রচনাসম্ভাবেব মধ্যে 'কল্যাণী'তে মোট ৮৬টি গানের মধ্যে ৬০টি অধ্যাত্মমূলক গান, 'বাণী'তে ৬৭টি গানের মধ্যে ৩৪টি ভক্তি সংগীত, 'অভয়া'য় ৪৪টিব মধ্যে ২৯টি ভক্তিসংগীত, 'বিবিধ' এবং 'শেষদানের' মধ্যে ১৫টি ভক্তিসংগীত—বাকি সব কবিতা। রজনীকান্ত সেনের বহু নীতিমূলক কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা আছে, যেগুলিকে কাব্যসংগীতের অন্তর্ভুক্ত

করা চলে না। রজনীকান্ত সেনের পারিবারিক জীবনে ঈশ্বর-অনুরক্তি ছিল অত্যন্ত প্রবল।

'আমাদের পরিবারের সকলেই অত্যন্ত ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ পারিবারিক সূত্রে ভগবান বিশ্বাস অত্যন্ত অল্পবয়স থেকেই পেয়েছিলেন।'[১০]

রজনীকান্তের সমগ্র কবি-চেতনার মূল ভাব হলো সবল ভগবৎ বিশ্বাস। রজনীকান্তের ভক্তিরসের অনুভূতিতে কোথাও কোনো তত্ত্ব বা বিশিষ্ট জীবনদর্শন ধরা পড়ে নি। অত্যন্ত সহজ সরল সাদামাঠা ভাষায় কান্ত কবি তাঁর জীবন-বেদনা, আনন্দ-উল্লাস, গ্লানি-ক্লান্তি সব কিছুকে অনায়াসে ঈশ্বরের কাছে নামিয়ে দিয়েছেন।

এই আত্মগ্লানি, পাপবোধ—রজনীকান্তের ভক্তি-সংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অপরিসীম গ্লানিভারে কবি কুণ্ঠিত পীড়িত। প্রত্যেকটি গানে প্রায় পাতকী, পাপ, মোহ, ভ্রান্তি শব্দগুলি ঘুরে ফিরে আসছে। শুধু শব্দ নয়, বিশেষ একটি ছবিই তাঁর গানে বারবার দেখা যায়

১ দৃঢ় পণ করি 'পাপ করিব না আর'
'করিব না' বলে পাপ করেছি আবার।

২ তাই পাপ করে হাত ধুয়ে ফেলে
আমি সাধুর পোষাক পরি
তখন সবাই বলে 'লোকটা ভাল
ওর মুখে সদাই হরি।'

৩ যবে মলিন হৃদয় তপ্ত
লয়ে ফিরিয়াছি অভিশপ্ত
বলেছি, 'মা, আমি করিয়াছি পাপ
ক্ষমা করে পায়ে রাখো।'

৪ আজন্ম পাপ-লিপ্ত, লয়ে এ তাপিত চিত্ত
দূরে রব দাঁড়াইয়া লজ্জিত কম্পিত ভীত।

৫ চিত্ত কাতর, করুণাভারে বহিতে আর নাহি পারে
দুর্বল হয়েছে পাপে এত দয়া নাহি সয়
তোমার কথা হেলা করে পাপ করিয়া ফিরি ঘরে
তুমি হেসে বস কোলে করে, দেখে কত লজ্জা হয়।

৬. যৌবনে, হরি, ছাইল ভীষণ, অবিশ্বাস ঘন মেঘে
বহিল প্রবল পাপ পবন, ডুবাইল ঘোর অন্ধতিমিরে॥

৭. তেমনি নিবিড় মোহের আঁধারে
আমার হৃদয় ডুবিয়া আছে
কত পাপ কত দুরভিসন্ধি
আঁধারে লুকায়ে বাচে।

এই পাপবোধ এবং বিবেকযন্ত্রণা,—যা হয়তো নিতান্ত জীব-জীবনসুলভ, কিন্তু কোথায় যেন এই পাপবোধের সাদৃশ্য আছে। কবি ক্যালভিনীয় ধর্মমতের অনুগামী ছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে তাঁর পাপবোধ ধর্ম-সংগীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠায় স্বতঃই খ্রীষ্টীয় চিন্তাধারার কথা মনে হয়। এ ছাড়া তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজেও এক ধরনের পাপবোধ এবং সেই বোধের থেকে উত্তরণের চিন্তা কখনো কখনো দেখা গেছে। অথচ কবির ব্যক্তি-জীবনে এমন কোনো ঘটনার উল্লেখ কোথাও নেই যা কবিকে নিদারুণ আত্মগ্লানির সম্মুখীন করতে পারে, অথবা বিবেকযন্ত্রণায় দগ্ধ করতে পারে। এই পাপবোধ কবির শৈশবকাল থেকে চেতনায় ভাবনায় জড়িত। মাত্র পনেরো বছর বয়সের কবি ১২৯৭ সালে, 'আশালতা' নামে একটি পত্রিকায় 'আশা' নামে একটি কবিতা রচনা করেন

এখন বলোগো একবার
নরকের ইতিহাস
দুষ্কৃতির চিরদাস
মলিন পঙ্কিল এই জীবন আমার
আমারো কি আশা আছে, বলো একবার।
এই শেষ আর নয়
বাঁধিয়াছি এ হৃদয়
প্রতিজ্ঞা পাপের পানে চাহিব না আর
'করিব না' বলে পাপ করেছি আবার।[১১]

ঈশ্বরে অনন্ত-নির্ভর অনেক ভক্ত-কবিই সারা জীবনের অকৃতার্থ বেদনা, দুষ্কৃতির ভার ঈশ্বর-চরণে সমর্পন করে থাকেন, কিন্তু কবির চিন্তা-

ভাবনায় সর্বত্র যদি এই ধরনের সুতীব্র পাপবোধ, আত্মগ্লানি, অনুশোচনা দেখা যায়, তাহলে এই পাপবোধকে কবির স্বভাববৈশিষ্ট্য হিসেবেই চিহ্নিত করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের শব্দ দিয়ে রজনীকান্তের গান চিনে নেওয়া যায়। কিন্তু এই ধরনের পাপবোধের কোনো সুনিশ্চিত কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

রজনীকান্তের ঈশ্বর ভাবনামূলক গানে এমন স্নিগ্ধ আত্মসমর্পণ, ঈশ্বরে অনন্যশরণ দেখা যায়,—যা তিনি ঈশ্বরাশ্রিত হতে চেয়েছিলেন। বিশুদ্ধ প্রতীতি ছিল তাঁর মূলধন, আগ্রহে ছিলেন একাগ্র, নিষ্ঠ।

'তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ', 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব, তোমারি রসাল নন্দনে', 'পাতকী বলিয়ে কিগো পায়ে ঠেলা ভাল হয়', 'যদি মরমে লুকায়ে রবে', 'কেন বঞ্চিত হব চরণে', 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে'।[১১ক]

'আমি অকৃতী অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি', 'যদি মরমে লুকায়ে রবে'—ইত্যাদি গানগুলির মধ্যে রজনীকান্তের অন্তরের নির্মল শুদ্ধ ভক্তিরসের পরিপূর্ণ ছবিটি উদ্ভাসিত। কোনো দর্শনের জটিলতা, বিজ্ঞানের বিস্ময়, পাণ্ডিত্যের অহংকার নেই। শুধু একান্তে পরম নির্ভরতায় উত্তরিত হতে চাওয়া উদ্ভাসিত সেই শান্তি এবং আনন্দ নিকেতনে। এমন অসন্দিগ্ধ আত্মবিশ্বাস, নিটোল বিশ্বাস সহজে চোখে পড়ে না। কান্তকবি আধ্যাত্মিকতার জগতে প্রবেশ করে বৈরাগ্যের গেরুয়া বসন পরেন নি। নির্বেদকে কোথাও প্রশ্রয় দেন নি। দুঃখ-সুখ, আশা-নিরাশা, বাধা-বিঘ্ন, পাপ-যন্ত্রণা সমস্তের মধ্য দিয়ে ভগবৎ ভক্তির পূর্ণ প্রতিফলন। বৈষ্ণবীয় দীনতা, খ্রীষ্টীয় চিন্তা, রামপ্রসাদী তন্ময়তা এবং কবিস্বভাবের অমল অকুণ্ঠ প্রত্যয়—সব মিলে মিশে একাকার।

'যদি কান্তকবি রজনীকান্তের জীবনকে একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করতে হয়, তবে অবধারিত সেই চিহ্ন হল ভক্তি। ভক্তি-ভাবই রজনীকান্তের জীবনের ও কবিত্বের মূল উজ্জীবন।[১২]

কান্তকবির ভক্তি-সংগীতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য—এই পাপবোধের সঙ্গে মিশে রয়েছে এক ধরণের বেদনাবোধ। এই বেদনাবোধ তাঁর কবিস্বভাবের

সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। অতুলপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রনাথেও বেদনাবোধ রয়েছে। কিন্তু রজনীকান্তের কাব্যসংগীতের বেদনাবোধের চেহারাই স্বতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে বিপুল কাব্যসম্ভারের মধ্যে ইতঃস্তত অনুশোচনা বা গ্লানিভার-পীড়িত বেদনার বিকাশ অনেক কবির কাব্যেই দেখা যায়। কিন্তু সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির মূল কথা মূল ভাব, অন্তরের তীব্র অনুশোচনাজাত অসহায় বেদনাবোধের শুদ্ধ সরল প্রকাশ—বোধ করি একমাত্র রজনীকান্তেই বর্তমান। অন্যান্য সমকালীন কবি-গোষ্ঠী থেকে কান্তকবিকে পৃথকীকরণের সম্ভবতঃ এটি একটি সুনিশ্চিত চাবিকাঠি—যা তাঁর সমস্ত কাব্য জীবনভাবনায় ব্যাপ্ত এবং গভীরে প্রসারিত

১ আর কি ভরসা আছে তোমারি চরণ বিনে
আর কোথা যাব তুমি না রাখিলে দীনহীনে

২ বেলা যে ফুরায়ে যায়—খেলা কি ভাঙে না হায়

৩. জাগাও পথিকে, ও সে ঘুমে অচেতন

৪. মন তুই ভুল করেছিস্ মূল,

৫. তুমি অরূপ স্বরূপ সগুণ-নির্গুণ দয়ালভয়াল হরি হে

৬. আমায় ডেকে ডেকে ফিরে গেছে মা

৭. ও মা, কোলের ছেলে ধুলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে।

৮. এত কোলাহলে প্রভু, ভাঙিল না ঘুম।

৯. আর কত দিন ভবে থাকিব মা,

১০. এ পাতকী ডুবে যদি যায়।

এই বেদনাবোধ এবং পাপবোধ কোথাও অভিন্ন নয়। আত্মগ্লানিভারে জর্জরিত কবির অসহায় ব্যথা সমগ্র কবিভাবনায় ব্যাপ্ত।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, রজনীকান্তের সাহিত্যমূল্য নির্দিষ্ট করা যায় :

১ সারল্য। ঈশ্বর-অনুবর্তিতে সরল অনুভব, প্রকাশে সহজ সারল্য। নিঃসংকোচ নির্দ্বিধায় মনের সমস্ত চিন্তা ভাবনা ঈশ্বরের পায়ে নামিয়ে দিতে চান। কোথায় যেন সাধক কবি রামপ্রসাদের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নিরলংকৃত ভাষায় অকৃত্রিম আবেগকে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ যেমন

সত্যকাবের কবি, রজনীকান্তের ভক্তিগীতির স্বরূপ নির্ণয় করতে বসলে ওই জাতীয় সারল্যের কথা মনে আসে। সারল্যের ঐশ্বর্যেই রজনীকান্ত রামপ্রসাদের সমগোত্রীয়, প্রমথনাথ বিশী যথার্থই বলেছেন, 'ভক্তির অকৃত্রিমতাই উঁহার প্রধান সম্পদ।'[১৩]

২. অনুশোচনা ও পাপবোধ

রজনীকান্তের কাব্যসংগীতের মধ্যে প্রায় সর্বত্র একধরনের পাপবোধ, তীব্র অনুশোচনা ধরা পড়েছে, দুঃসহ কোন এক গ্লানিভারে পীড়িত কবি-চিত্ত। ঈশ্বর সেই বোঝা নামিয়ে চরণে আশ্রয় দেবেন। তবে লক্ষ্যণীয় এই যে, এত আত্মদহন, এত যন্ত্রণার মধ্যে কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি কোথাও বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নেই, নেই সংশয়। সমস্ত শক্তি, যন্ত্রণা, চেতনার উৎস সেই পরম অনির্বচনীয়ের প্রতি প্রশান্ত নির্ভরতা। এই পাপকুণ্ড থেকে ঈশ্বর পবিত্রাণ করবেন, কেননা,

'যদি পাতকী না পায় গতি
কেন ত্রিভুবন পতি
পতিতপাবন নাম নিলে গো।'

এই বোধের সঙ্গে মধ্যযুগের কবি সার্বভৌম বিদ্যাপতির চিন্তাধারার সাদৃশ্য রয়েছে। আজীবন ভোগবাসনা কামনার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে এসে প্রৌঢ় কবি জীবনসমুদ্রের বেলাভূমে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আকুল আক্ষেপ, তীব্র আত্ম-গ্লানিতে ভেঙে পড়েছেন। আত্মসম্বিতের জাগরণ হয়েছে, কিন্তু গভীর প্রত্যয়ে তিনি অবিচল:

"দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলু
দয়া জনু ছোডবি মোয়।"

৩. বেদনাবোধ

কবির অন্তরের গ্লানি ও আক্ষেপের সঙ্গে মিশেছে তীব্র বেদনাবোধ, রজনীকান্ত সেনের পুত্র শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন বলেছেন, 'বাবা জীবনে দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করেছেন। পুত্র কন্যার বিয়োগ ব্যথা অনুভব করেছেন। সম্ভবতঃ তাই তাঁর গানে এত কারুণ্য।[১৪]

অপর একটি মন্তব্য :

"পুত্র কন্যার মৃত্যুতে শোকে ভেঙে পড়ার মত মন তাঁর ছিল না। আমার মনে হয়, যাঁরা যথার্থ ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাঁরা ভগবৎ ভক্তিতে আকুল হয়ে অন্তরে এক ধরণের অনির্দেশ্য বেদনাবোধ করে থাকেন। আমার শ্বশুর মশাই সত্যিকারের ভগবৎ প্রেমিক ছিলেন। তাঁর অন্তরের আকুল উদ্বেগ ও কান্নার অন্তরালে কোনো পারিবারিক সাংসারিক কারণ ছিল না। 'কেন বঞ্চিত হব চরণে' বা 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব' ইত্যাদি সংগীতের মধ্যে যে অসহায় আত্মসমর্পণ, তা ঈশ্বর-অনুরক্তি ছাড়া সম্ভব নয়।"[১৫]

এই বেদনাবোধের অন্তরালে সত্যিই কোনো বিশেষ কারণ নেই। ঈশ্বর-বিশ্বাস থেকেই এই যন্ত্রণার সৃষ্টি। আনন্দের উল্লাস তাঁর ঈশ্বর-অনুরক্তির প্রকাশে কোথাও নেই।

৪ সম্বোধন

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তিনি 'ঈশ্বর'কে 'হরি' বলে সম্বোধন করেছেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম, যদিও কোনো ধর্মের প্রতি গোঁড়ামি তাঁর ছিল না, তবু ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীর পক্ষে নির্দিষ্ট কোনো রূপে ঈশ্বরসাধনা, একটু বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য নয় কি? নাথ দয়াময়, প্রভু ইত্যাদি সম্বোধন আছে, কিন্তু 'হরি' সম্বোধন অধিক। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব তাঁর চিন্তায় ছায়াপাত করছে। ব্রাহ্মসমাজে অবশ্য তখন 'Neo-Vaisnavism' এর বিভাবনা ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশের কাব্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত—এঁরাও হয়ত এই সম্ভাবনার অনুগামী ছিলেন।

হয়তো রজনীকান্তের কাব্যসংগীতের একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি বৈচিত্র্যহীনতা। বিষয়বস্তুতে, প্রকাশভঙ্গিতে কোথাও বৈচিত্র্য নেই, নেই কোন কলানৈপুণ্য ভাব ও চিন্তার সূক্ষ্ম কারুকর্মের প্রকাশ তাঁর কাব্যগীতিতে নেই, তাই হয়ত আধুনিক কাব্যে তাঁর স্থান সীমায়িত। এই সময়কার বাংলা কাব্যগীতিতে বাক্যের-বিন্যাস শ্রী, রচনাপটুতা গদ্যধর্মী ভাষার সম্প্রীতি ও প্রকাশকে সহজ করতে চেয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩)। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) 'সোনার তরী' (১৮০০) থেকে বাংলা কবিতার নতুন দিক নির্দেশ করেছেন। ছন্দে-ভাষায়, সুরে-চিত্রে, বক্তব্যে পরীক্ষার পালা শেষ করে নির্দিষ্ট পথের সন্ধান

পেয়েছেন। মনে রাখতে হবে, রজনীকান্ত ছিলেন এই দুই কবি প্রতিভার সমকালীন।

"তিনি যে বাংলা কাব্যের ভাণ্ডারে কিছু মৌলিক বস্তু দিয়ে গিয়েছেন তা নয়। ভাষা নিয়ে, ছন্দ নিয়ে কিম্বা প্রকাশরীতি নিয়ে রজনীকান্ত কোনো নতুনত্ব করেন নি, কিম্বা কোনো পরীক্ষা করেন নি, তাঁর কবিতায় এক ধরণের সরলতা আছে শিল্প বৈদগ্ধ তাকে ঢেকে রাখে নি।"[১৬]

কান্তগীতি বহিরাঙ্গিক কলাকৌশলের দাবীতে শ্রোতাকে মুগ্ধ করে না। বৈদগ্ধে অথবা অনন্ত জিজ্ঞাসায় তিনি ঈশ্বরকে অনুভব করতে চাননি, শব্দ স্পর্শ বর্ণ গন্ধের এই রসাঢ্য পৃথিবীর স্রষ্টাকে তিনি নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ততার আনন্দে উপলব্ধি করেছেন।

"রজনীকান্তের কবিতায় জটিল রসবৃদ্ধি নেই, কিন্তু গানবস্তু ভাবের অসহায়ত্ব, অসহায়ত্ব ও সমর্পণের যে মিশ্র ভাবনা রয়েছে তার আবেদন অনন্য। এই দুই বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনায় ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়ে সমন্বিত একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টিকোণে পরিণত হয়েছে।"[১৭]

রজনীকান্তের কাব্যসংগীতের বিচারে আঙ্গিকের অনুপযুক্ত বিচারের প্রশ্নটি এড় বাহু। কেননা তিনি ছিলেন শুদ্ধ চিত্ত ভক্তিমার্গের পথিক। পাপ-অপাপ প্রেম-অপ্রেম, কল্যাণ-অকল্যাণ—এই সমস্তের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি একটি শুভংকর প্রতীতি অর্জন করতে পেরেছিলেন—এখানেই তাঁর স্বকীয়ত্ব।

রজনীকান্তের ভক্তিগীতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, সামগ্রিক ভাবে, তাঁর সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির মূলকথাও তাই। ঈশ্বর-অনুরক্তিই কান্তকবির জীবন-ভাবনার প্রথম এবং প্রধান কথা। হাসির গান কিম্বা দেশাত্মবোধক গান রচনার পর্যায়ে তিনি অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বেশি, সুতরাং কবি-বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন সেখানে বিরল। প্রকৃতপক্ষে রজনীকান্তের ছিল প্রকৃত কবিমন। বহিঃপ্রভাব ও জনকোলাহলকে সযত্নে এড়িয়ে তিনি ডুব দিয়েছিলেন মনের অগম লোকে। তিনি ছিলেন শান্তি অন্বেষী। তিনি সমস্ত মালিন্য অন্তরের দীনতা নামিয়ে দিয়েছিলেন ঈশ্বরের পায়ে এবং সমগ্র সত্তাকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সেই,

"আধ্যাত্মের জ্যোতির্ময়ে
যেখানে নিরস্ত কাল অন্তর প্রদীপে হবে
পরমের প্রসন্ন আরতি।"[১৮]

এবার কান্তগীতির সুরের পর্যালোচনা। রজনীকান্তের গানের জগৎ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে সংগীত শিক্ষা, কোনো বিখ্যাত সংগীতকারের প্রভাব অথবা সংগীত সম্বন্ধে শিক্ষা—ইত্যাদি প্রশ্ন রজনীকান্তের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সংগীতের নিয়ত-নিরীক্ষা, ধ্রুপদী-পরিবেশ, দেশী-বিদেশী সুরের সংগম ঘটেছিল এবং এ সমস্তের প্রভাব নিশ্চিতভাবে সুরকার রবীন্দ্রনাথের জীবনকে গড়ে তুলেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ এঁদেরও গীতিসত্তার উন্মেষ-পর্বে নানান প্রভাব, পরিবেশ ইত্যাদির প্রশ্ন দেখা যায়। রজনীকান্তের সংগীত জীবনের পটভূমি এবং পরিবেশনা তুলনায় পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই স্বতন্ত্র। রাজশাহীর গ্রাম্য পরিবেশে আত্মপ্রচার-বিমুখ, শান্ত ভক্তিরসের কবি রজনীকান্ত আপন মনে গান বেঁধেছেন। তারকেশ্বর চক্রবর্তী তাঁকে সুরের শিক্ষার প্রথম পাঠ দেন, কিন্তু সে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়। তিনি কণ্ঠে সুর এবং অন্তরে পূর্ণ-রসবোধ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রজনীকান্তের পিতার প্রভাব কিছুটা তাঁর গানের জগৎকে গড়ে তুলেছিল।

"ভাঙ্গাবাড়ি নিবাসী তারকেশ্বর চক্রবর্তী রজনীকান্তের সংগীতগুরু। বাল্যকালে তারকেশ্বরের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল, তাহার নিকটে থাকিয়া এবং তাঁহার সুমধুর গান শুনিয়া রজনীকান্তের সংগীত-লিপ্সা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।"[১৯]

"তাঁর পিতৃদেব ছিলেন একাধারে কবি ও সংগীতজ্ঞ। তিনি মৈথিলি কবিদের অনুসরণ করে' ব্রজবুলি গান, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ও শিবদুর্গা বিষয়ক অনেক গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন। পুত্রকে সংগে নিয়ে বসে নিজে গান গাইতেন এবং পুত্রকে শেখাতেন।"[২০]

রবীন্দ্রনাথ এবং কাঙ্গাল হরিনাথের প্রভাবও তাঁর পরবর্তী কালের সুরের জগৎ গড়ে তুলেছিল।

"ইনি ভক্তিরসের গানের প্রেরণা পাইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গান এবং কাঙ্গাল হরিনাথের বাউল গান হইতে (হরিনাথের প্রধান ভক্ত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রজনীকান্তের সুহৃদ ছিলেন)। রজনীকান্তের কোনো

কোনো গানে 'কান্ত' ভনিতা দেখা যায়। এই ভনিতা দেওয়ার রীতি হরিনাথের রচনাসূত্রে পাওয়া যায়।"[২১]

মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি যে গান রচনা করেন, তা নিম্নলিখিত রূপ

"নবমী দুখের নিশি দুখ দিতে আইল
হায় রাণী কাঙলিনী পাগলিনী হইল।"

রজনীকান্তের সুরবোধ কোনো বিশিষ্ট ঘরানার দ্বারা গড়ে ওঠে নি। প্রাচীন বাংলা গানের সুরের যে সহজ সাদামাঠা রূপ—সুরকার তাকেই গ্রহণ করেছিলেন। রাগ সংগীতের গ্রহণে এবং প্রকাশে কোথাও সচেতন মুনসীয়ানার পরিচয় নেই। অন্তরের পরিশুদ্ধ আবেগকে তিনি প্রচলিত রাগরাগিণী এবং প্রচলিত তাল ভঙ্গির সাহায্য ধরে রেখেছেন।

রজনীকান্ত মজলিসী মানুষ ছিলেন। সাদা প্রাণোচ্ছল, হাসিখুশি মানুষটি অনায়াসে গান বাঁধতে পারতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সরস আলাপে, গানে তিনি মানুষকে মুগ্ধ করে রাখতেন। চরিত্রে কোথাও পোষাকী কৃত্রিমতা ছিল না। ছিল না কোনো ছদ্ম আবরণ। গানের কথাতে যেমন অকৃত্রিম সাবল্য—সুরেও তেমনি অনায়াস ঝঙ্কার। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় হয় রাজশাহীতে এবং তাঁর কণ্ঠে হাসির গান শুনেই তিনি হাসির গান রচনা সুরু করেন। রজনীকান্ত ছিলেন রাজশাহীর 'উৎসবরাজ।'

"আমাদের মেসের দক্ষিণাংশে রজনীবাবুর বাসা ছিল। এজন্য সকলে অবসরকালে রজনীবাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া বন্ধুগণের আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতাম। অনেক সময়ে কোর্ট হইতে গাড়ীতে বাসায় না ফিরিয়া পদ্মাতীরস্থ বাঁধের উপর দিয়া রজনীবাবুর সহিত গল্প করিতে করিতে মেসে ফিরিতাম। রজনীবাবু সদাপ্রফুল্ল হাস্যরসিক, মজলিসী লোক ছিলেন। অপরাহ্নে কাছারির পর তাঁহার বাহিরের ঘরে গান-বাজনার বৈঠক বসিত।·· তাঁহার গল্প বলিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। তাঁহার গল্প শুনিতে শুনিতে কোনো কোনো দিন রাত্রি একটা পর্যন্ত কাটিয়া যাইত। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় গল্প শুনিতাম।"[২২]

তাঁর অনায়াসে গান বাঁধতে পারার আশ্চর্য ক্ষমতার কিছু নিদর্শন আছে। রাজশাহীর লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত কোনো এক সভায় যাবার মাত্র একঘণ্টা আগে রজনীকান্ত গান রচনা করেছিলেন। জলধর সেনের বর্ণনা থেকে জানা যায়

"আমায় বলিল, 'রজনী ভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে? একটা গান বাঁধিয়া লও না।' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, তাহা আমি জানিতাম না। আমি জানিতাম সে গান গাহিতেই পারে। আমি বলিলাম, 'এক ঘণ্টা পরে সভা হইবে, এখন কি আর গান বাঁধিবার সময় আছে?' অক্ষয় বলিল, 'রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে পারে।' রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি করিত। সে তখন একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পরেই একখানি গান লিখিয়া ফেলিল। আমি তো অবাক। গানটি চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি অতি সুন্দর হইয়াছে। গানটি এখন সর্বজনপরিচিত

'তব চরণনিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরসা।'[২৩]

আর একটি বিবরণ থেকে জানা যায় যে রজনীকান্ত কোনো বিশেষ ঘটনার সূত্রানুসরণে অনায়াসে কত অপূর্ব সংগীত রচনা করতেন।

'দাদামশাই মজলিশি লোক ছিলেন। দিদিমার কাছে শুনেছি, গান করতে বসলে মক্কেল এসে ফিরে যেত। ওর গানের মজলিশে বাড়ির লোক চট্ করে ঢুকতে পারত না। একবার ওর পরিবারের কোনো শিশুর অসুখ হয়েছিল। প্রয়োজন ছিল ডাক্তার ডাকার, কিন্তু কেউ সাহস করে ওঁকে গানের আসরে ডাকতে যায় নি। বাড়ির এক পুরোনো বৃদ্ধ জোর করে ঘরে ঢুকে তার স্বভাবসিদ্ধ বাঙাল ভাষায় বলেছিল, 'তুমি এখানে গান করছো, আর ছেলেটা যে শেষ হয়ে গেল।' তৎক্ষণাৎ উনি উঠে আসেন। দেখেছিলেন, আমার দিদিমা সেই অসুস্থ শিশুকে কোলে নিয়ে বসে। যথারীতি চিকিৎসা হয় এবং শিশু সুস্থ হয়। এই ঘটনার পরেই, দিদিমার মুখে শুনেছি, বৈঠকখানায় ফিরে গিয়ে তিনি একটি গান রচনা করেন, গানটি

"স্নেহবিহ্বল করুণাছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে।"[২৪]

তাঁর রচিত 'কল্যাণী' এবং 'বাণী' গ্রন্থেই গানের সংকলন অধিক। 'বাণী'তে ৬৭টি কবিতার মধ্যে ৫৭টি গান, 'কল্যাণী'তে ৮৬-র মধ্যে ৬৮টি গান, 'অভয়া'তে ৪০টি গান, বিবিধমতে ১৯টি এবং 'শেষদান'-এ ১৫টি। সর্বসাকুল্যে দুশত'-র মত গান আছে। তাও সবগুলি যথার্থই গান হিসেবে পরিগণিত হতে পারে

কিনা, বিচার্য। সব থেকে উল্লেখযোগ্য, এই শ' দুয়েক গানের মধ্যে ১৭০টি ভক্তিমূলক গান। 'আগমনী', 'বিজয়া'র গানগুলি আমাদের আলোচনাব অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা গান হিসেবে এগুলিব পরিচয় নেই বললেই হয়, এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য, রজনীকান্তের গানেব এই যে সংখ্যাবিচাব, সবটাই কিন্তু নির্ভব কবছে তাঁব গানেব প্রচারেব বিচাবে। অর্থাৎ বজনী-কান্তেব যে সমস্ত গানগুলি ইদানিং প্রচারিত, তাবই ভিত্তিতে এই সংখ্যাবিচাব।

বজনীকান্তেব গানেব সুব ছিল সবল। শিল্পীমন বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। অন্তবেব ভাবনাব প্রকাশ ঘটেছে সুরকার রজনীকান্তের হাতে অত্যন্ত সহজ এবং অকৃত্রিম রূপে। তাঁব গানের সুরেব আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা কিছু ভক্তিসংগীতই বেছে নিলাম। কেননা কবিব বৈশিষ্ট্য এবং সুবকারের বৈশিষ্ট্য দুইই বিকশিত হয়েছে অধ্যাত্মভাবনার অবলম্বনে :

১ তুমি নির্মল কব মঙ্গল করে—ভৈরবী
২ আমি দেখেছি জীবন ভবে চাহিযা কত—হাম্বীর
৩. ওই বধিব যবনিবা তুলিযা মোবে প্রভু—মিশ্র ইমন
৪ তোমারি দেওয়া প্রাণে—আলৈয়া
৫. পাতকী বলিযে কিগো—বেহাগ
৬ যদি মরমে লুকায়ে রবে—মিশ্র খাম্বাজ
৭ কেন বঞ্চিত হব চবণে—মিশ্র খাম্বাজ
৮. তুমি অরূপ স্বরূপ সগুণ নির্গুণ—বেহাগ
৯ কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িযা যাইব—মিশ্র বেহাগ
১০ পাপ বসনারে হবি বল—কাফি সিন্ধু
১১ জাগাও পথিকে ওযে ঘুমে অচেতন—কেদারা
১২ কেউ নয়ন মুদে দেখ আলো—বেহাগ
১৩. তপ্ত মলিন চিত্ত বহিযা এনেছি তা—মিশ্র ঝিঁঝিট
১৪. পূর্ণ জ্যোতি তুমি ঘোষে দিনপতি—ইমন
১৫ আর কি ভবসা আছে—মিশ্র খাম্বাজ
১৬ হবি, প্রেম গগনে চির রাকা—মিশ্র পূরবী
১৭. মন তুই ভুল কবেছিস মূলে—বাউল

১৮. প্রেমে জল হয়ে যাও গলে—বাউল

১৯. চাঁদে চাঁদে বদলে যাবে—বাউল

২০. যদি পার হতে তোর মন থাকে—বাউল

২১. ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়—বারোঁয়া—ঠুংরি (?)

২২. আমি অকৃতী অধম বলেও তো কিছু—বেহাগ

২৩ কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে—বেহাগ

২৪. আর কতদিন ভবে থাকিব মা—মিশ্র খাম্বাজ

২৫ কুটিল কুপথ ধরিয়া—মিশ্র খাম্বাজ

২৬. কেবে হৃদয়ে জাগে—মিশ্র খাম্বাজ

২৭. সখা তোমারে পাইলে আর—ভৈরবী

২৮. কেড়ে লহ নয়নের আলো—ভৈরবী

২৯. আমায় পাগল করবি কবে—মিশ্র খাম্বাজ

৩০. কোন্ সুন্দর নব প্রভাতে—মিশ্র খাম্বাজ

৩১ যেখানে সে দয়াল আমার—মিশ্র ঝিঁঝিট

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত 'কান্তকবি রচনা সম্ভারে' নির্দেশিত সুরের সঙ্গে প্রচলিত গানের সুর অনেক ক্ষেত্রেই মেলে না। যেমন, 'তোমারি দেওয়া প্রাণে' গানটি গ্রন্থে নির্দেশিত 'আলৈয়া' বলে। অথচ যে সুরে গানটি শোনা যায়—সেটি 'ইমন'। কিম্বা, 'ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়'—গানটি 'বারোঁয়া—ঠুংরী' কোথায়? গানটির সুর মনে হয় ভূপালী এবং কল্যান মিলিয়ে রচিত [এই গানগুলির সুরের প্রসঙ্গে সাহায্য করেছেন রজনীকান্তের দৌহিত্র শ্রীদিলীপকুমার রায়।]

বাউলের সুরে তিনি অনেক গান বেঁধেছেন। নিঃসন্দেহে এটি বঙালীর চিরকালীন লোকসংস্কৃতির ধারাকে লক্ষ্য করেছে। তাছাড়া যেসব রাগরাগিণী-র উল্লেখ বা অনুসরণ দেখা যায়, তা প্রধানতই প্রচলিত সুরগুলিকে অবলম্বন করেছে। যেমন বেহাগ, ভৈরবী, খাম্বাজ, ইমন ইত্যাদি। ঠুংরী, গজল, টপ্পা—কিম্বা বিশুদ্ধ ধ্রুপদ তিনি রচনা করেন নি। সুরের সহজ নিরলঙ্কৃত রূপটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। রাগ-রাগিণীকে কেন্দ্র করে সচেতনপটুত্ব কোথাও দেখান নি। অর্থাৎ কিনা বেহাগের সঙ্গে ইমন, কিম্বা ভূপালীর সঙ্গে

বাগেশ্রী ইত্যাদির মিশ্রণ, তাঁর গানের সুরে নেই। ইমনের সরল কাঠামো খাম্বাজের সহজ ভঙ্গি তিনি গ্রহণ করেছেন। যদি কোথাও কোনো সুরের বৈচিত্র্য দেখা যায়, মনে রাখতে হবে, সচেতনভাবে সুরকে অভিনব করে তুলতে বা বৈচিত্র্যমণ্ডিত করতে তিনি বিভিন্ন স্বর (Notes) ব্যবহার করেন নি। তাঁর সমগ্র অন্তর ছিল অমৃতের অন্বেষণে সতত নিয়োজিত। সেখানে আত্মসচেতন শিল্পীসত্তার প্রকাশ ছিল না। গান তিনি শোনাবার জন্যে এবং প্রশংসাধন্য হবার জন্য কখনই রচনা করেন নি।

গানের সুরের চালে, কল্যাণ ও ভূপালীর কয়েকটি স্বরের (Notes) (সা-ধ্‌-সা-রা-গা) প্রয়োগ বারবার দেখা যায়। সচেতনভাবে ভূপালী বা কল্যাণ-রূপ সৃষ্টি করার মানসিকতায় তিনি এই স্বরগুলি ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না। তবে এই স্বরগুলির ব্যবহার বহু গানে। যেমন, 'ইমনে' রচিত 'ওই বধির যবনিকা' গানটির 'এ পারে সবই ভালো', অংশটি স্মরণীয়। ঠিক এই ধরণের স্বরপ্রয়োগ 'ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়' অংশে। 'আমি সকল কাজের পাই হে সময়' গানটির 'তোমারে ডাকিতে পাইনে' অংশে, 'যদি মরমে লুকায়ে রবে' গানটির 'কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো' অংশে, 'তোমারি দেওয়া প্রাণে' গানটির 'তোমারি নিরজনে' অংশে, 'সখিরে 'মরম পরশে তারি গান' অংশে, 'আর কি ভরসা আছে' গানটির 'আর কোথা যাবে তুমি' অংশে, 'সাধুর চিত্তে তুমি' গানটির 'ভীতি রূপে জাগ' অংশে—এই একই স্বর-প্রয়োগ পদ্ধতি। সুর হয়তো কোনটি খাম্বাজ, কোনটি ইমন, কোনটি বেহাগ, কিন্তু এই সা ধ্‌ সা রা গা স্বরের প্রয়োগটি লক্ষ্যণীয়। এবং নিঃসন্দেহে দেখা যাচ্ছে এই স্বর ক'টির প্রয়োগে সুর অত্যন্ত সরল হয়েছে।

গানের সুরে বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রসঙ্গে সঞ্চারীর বিশেষ ভূমিকা আছে। রজনীকান্ত যে সুর এবং কথা—দুই ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্যসৃষ্টির চেষ্টা করেন নি, তার উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, অনেক গানেই সঞ্চারী অনুপস্থিত।

"কবে তৃষিত এ মরু," "আর কি ভরসা আছে," "হরি প্রেম গগনে," "জাগাও পথিকে", "লোকে বলিত তুমি আছ," "আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে," "তুমি নির্মল কর", "কেন বঞ্চিত হব চরণে," "যদি মরমে লুকায়ে

রবে," "আর কতদিন ভবে", "সাধুর চিতে তুমি," "ওমা এই যে নিয়েছ কোলে"—প্রভৃতি আরও অনেক গানেই সঞ্চারীর প্রশ্ন অনুপস্থিত। তালের প্রশ্নেও দেখা যায়, তিনি সুরারোপের ক্ষেত্রেও যেমন সহজ সরল, তাল-গ্রহণের ক্ষেত্রেও তেমনি সরল, সাদামাঠা রূপকে নিয়েছেন। বড় বড় তাল, লয়ের বৈচিত্র্য তাঁর গানে নেই।

তাছাড়া, অনেকগুলি গানের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরীদের পাদপূরণ করেছেন এবং 'অমুক গানের সুরে গীত হবে' বলে উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের সুর-প্রয়োগ পদ্ধতি (অতি পরিচিত গানকে কেন্দ্র করে অবশ্যই) তখনকার দিনে ছিল। 'ডি. এল রায়ের' সুরে গাইলেন, বললে তখনকার শ্রোতারা 'ভারত আমার', 'বঙ্গ আমার' এই সব গানের সুরকে ঠিক বুঝে নিত। রজনীকান্তেও এ রকম দৃষ্টান্ত

"ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে"—সুরে—"দুটো একটা নয় রে ও ভাই",

"সোনার কমল ভাসালে জলে"—সুরে—"যদি পার হতে তোর,"

"নিপট কপট তুঁহু শ্যাম"—সুরে—"সাঁঝে একি এ হরষ" এবং "তিমির নাশিনী মা আমার" ও "যে পথে মরা চ'লে"।

রবীন্দ্রনাথের 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে' এই সুরে "শুনাও তোমার অমৃত বাণী" এবং অতুলপ্রসাদের "উঠো গো ভারত লক্ষ্মী" এই সুরে "আকুল কাতর কণ্ঠে" এই গান দুটি রচনা করেন। "মধুর সে মুখখানি" এই প্রাচীন গানটির তিনি পাদপূরণ করেছিলেন।

রজনীকান্তের গানের সুরে বাংলার জল, মাটি, আকাশ-বাতাসের স্পর্শ অনুভব করা যায়। কোথাও কোনো বৈচিত্র্য নেই, সুরকারের সচেতন দক্ষতা অনুপস্থিত। হয়ত স্নিগ্ধ রসরসিকের দরবারে কান্তকবির গান একঘেয়ে, বড্ড সরল মনে হবে, কিন্তু সভাস্থলে উচ্চপ্রশংসিত না হলেও একান্ত নির্জনে আপন মনের শুদ্ধ শান্ত আবেগে সহজ অকৃত্রিমতায় রজনীকান্তের গান শান্তির সম্পদ।

"লক্ষ্ণৌ ঠুংরী সম্বন্ধে ভাল কাণ্ডজ্ঞান না থাকলে—" 'কি আর চাহিব বল,' কিম্বা 'চাঁদিনী রাতে কেগো আসিলে'—ইত্যাদি গান, কেউ গাইতে পারবে না। কিন্তু 'কেন বঞ্চিত হব চরণে' গানটি গাইতে বিশেষ মুন্সীয়ানার প্রয়োজন নেই। অন্তরের বিশুদ্ধ আবেগেই রজনীকান্তের গান গাওয়া যায়।"[২৫]

কান্তকবির গানের সুরের আলোচনা থেকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা যায় .

ক. সারল্য। তাঁর গানের সুর, কথার মতই অত্যন্ত সহজ সরল সাদামাঠা। একটি রাগের সঙ্গে অন্য অন্য রাগ মিশ্রিত করে অভিনবত্ব বা বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তিনি আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। রাগের উল্লেখে 'মিশ্র' কথাটির উল্লেখ থাকলেও দু'তিনটি সুর সেখানে যে মিশ্রিত হয় নি, সুরজ্ঞ শ্রোতা মাত্রেই স্বীকার করবেন। হয়তো ইমন কি বেহাগ তাদের চিরাচরিত চলন-পদ্ধতি থেকে সামান্য একটু এদিক-ওদিক যাতায়াত করেছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সুরকারের সচেতনতা কার্যকরী নয়। তাঁর সমস্ত গানের সুরে আশ্চর্য মাধুর্যের নিটোল পূর্ণতা। অন্তরের গভীরে তার প্রশান্ত ব্যাপ্তি।

খ কারুণ্য। এক্ষেত্রেও সেই একই কথা। গানের বাক্যাংশে যেমন বেদনার বিকাশ, সুরেও সেই বিষণ্ণতার অনুরণন। কথা অংশের আলোচনাতে যেমন এই বেদনার কোনো সঙ্গত কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি, এ ক্ষেত্রেও কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। শিল্পীর অন্তরের শুদ্ধ আবেগের অনুভব থেকে হয়ত বেদনার সৃষ্টি। তাই তাঁর খাম্বাজ, ভৈরবী, ইমন সর্বত্রই নিরবচ্ছিন্ন কারুণ্য। রজনীকান্তের অধ্যাত্ম চিন্তায়, ভগবানের রূপৈশ্বর্য বর্ণনায় যেমন কোথাও উল্লাস বা আনন্দের তীব্র উপলব্ধি রসরূপ লাভ করে নি, সুরের ক্ষেত্রেও এমন কোনো সুরের প্রয়োগ পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেন নি, যা অন্তরে আনন্দের সঞ্চার করে।

গ স্বাতন্ত্র্যহীনতা।

কান্তকবির গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যেমন সারল্য, তেমনি কাব্যসংগীতের উৎকর্ষের প্রতিবন্ধক স্বরূপও এই বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ কথায় এবং সুরে অনন্য সরলতা কাব্যসংগীতকে কখনো কখনও একঘেয়ে করে তুলেছে। বক্তব্যের দিক থেকে যেমন সেই একই পাপবোধ, বেদনাবোধ, বিবেকযন্ত্রণা-বিদ্ধ আত্মসমীক্ষার ছবি, সুরের দিক থেকেও সেই সরল সহজ স্বরের যাতায়াতে একই অনুরণন। কিন্তু এই স্বরপ্রয়োগ পদ্ধতি এমন কোনো বিশিষ্ট একটি **pattern** গড়ে তোলে নি, যা কানে শোনামাত্র 'রজনীকান্তের গান' বলে শ্রোতাকে চিনে নিতে সাহায্য করে, গানের বিষয়বস্তুতে বরং পরিচিত কিছু

শব্দ এবং চিত্র কান্তকবিকে চিনতে সাহায্য করে, কিন্তু কান্তগীতি কথার বাইরে সুরের ক্ষেত্রে কোনো স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বহন করছে না—যা রবীন্দ্রসংগীতে বর্তমান।

রজনীকান্তের সমগ্র কাব্যসংগীতের, কথা ও সুরের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ করে' একথা বোধ করি বলা যেতে পারে, আত্মভাব-বিশিষ্ট শুদ্ধ সরল ভক্তিরসের নির্মল রূপ তাঁর সমগ্র কাব্যসংগীতে বর্তমান। প্রচার বিমুখ শিল্পীমন আপন অন্তরের পাপ-অপাপ, প্রেম-অপ্রেম, আলো-অন্ধকার সবকিছুই ঈশ্বরের পায়ে সুরে নিবেদিত করেছেন। কথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে যদি সুরের আবেদনে কান্তগীতির বিচার করি, সেও যেমন নির্দিষ্ট কোনো সুরের স্পষ্ট মূর্চ্ছনায় অন্তরকে রসায়িত করবে না, তেমনি সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু কাব্যের বিচারে যদি কান্তকবির বিশ্লেষণ করা হয়, সেখানে তিনি কবি হিসেবে খুব সমাদৃত হবেন না। তাঁর রচনার মধ্যে বহু গান আছে, সুরহীন অবয়বে যা নিতান্তই মূল্যহীন। 'পূর্ণ জ্যোতি তুমি ঘোষে দিনপতি,' 'কে রে হৃদয়ে জাগে', 'কত ভাবে বিরাজিছ বিশ্ব মাঝারে' 'যদি প্রলোভন মাঝে ফেলে রাখ', 'চাঁদে চাঁদে বদলে যাবে' 'তুমি আমার অন্তস্থলের খবর জানো'—ইত্যাদি বহু গান আছে—সুরহীন অবয়বে যা একান্তই মামুলি।

সুতরাং রজনীকান্তের গান কথা এবং সুরের সামগ্রিক মিলনেই সার্থক এবং অপূর্ব। এই অপূর্বতা পারস্পরিক সাবল্যের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত, এই যে blending—যা, কথা এবং সুরের অনায়াস অকৃত্রিমতায় সৃষ্ট, তা অনেকগুলি গানেই প্রকাশিত :

১. তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে, ২. আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে, ৩ কেন বঞ্চিত হব চরণে ৪ পাতকী বলিয়ে কিগো ৫. ওই বধির যবনিকা ৬. কবে তৃষিত এ মরু ৭. আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ ৮. তুমি অরূপ স্বরূপ ৯ আমি সকল কাজে পাই হে সময় ১০. যদি মরমে লুকায়ে রবে ১১, তোমারি দেওয়া প্রাণে ১২. আমি অকৃতী অধম বলেও তো কিছু ১৩. কোলের ছেলে ধুলো ঝেড়ে ১৪. জাগাও পথিকে ১৫. কেউ নয়ন মুদে দেখে আলো।

বলা বাহুল্য, এই ধরণের গানগুলির প্রসঙ্গে কোথায় কোন্ সুরের ব্যবহার হয়েছে, কি ধরনের চিত্র প্রকাশিত—ইত্যাদি কোনো প্রশ্ন মনে জাগে না

কথা এবং সুরের নিবিড় অবিচ্ছেদ্য মিলনে, সরল অনাস্বাদিত মাধুর্যে এই গানগুলি একান্তভাবেই বাঙালী শ্রোতার অন্তরে অনুরণিত হতে থাকে। দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ এবং নজরুল এঁদের কারো সঙ্গেই এক সারিতে কান্তকবির গান বিচার্য নয়। বাংলাদেশের জলবায়ু মাটি আকাশ—এ সমস্তের মধ্যে অবগাহিত হযে নিরাভরণ সিক্ত-রূপে কান্তকবির ভক্তিগীতি-গুলি নিটোল মুক্তার মত আমাদের অনুভবের সমুদ্রে টলমল করছে—তার মর্যাদা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পাদটীকা

১ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—কান্তকবি রজনীকান্ত। পৃষ্ঠা ৬১।

২ ঐ — ঐ । „ ৭৩-৭৪

৩ Surendranath Banerjee—A Nation in Making (P P 302-203) 1963 Edition

৪ রথীন্দ্রনাথ রায়—কবি রজনীকান্ত সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭২, কার্তিক-পৌষ। পৃঃ ১০৪।

৫ প্রমথনাথ বিশী—কান্তকবি রচনা-সম্ভার। ভূমিকা অংশ, পৃঃ ১৩।

৬ ভবতোষ দত্ত—কবি রজনীকান্ত সেন, তত্ত্বকৌমুদী ১৩৭২, ভাদ্র-কার্তিক। পৃঃ ১১৩

৭. রমণীমোহন ঘোষ—কবি রজনীকান্ত, আর্যাবর্ত, ১৩১৭, কার্তিক।

৮. প্রমথনাথ বিশী—কান্তকবি রচনা-সম্ভার। ভূমিকা অংশ। পৃঃ ১৪।

৯ ভবতোষ দত্ত—কবি রজনীকান্ত সেন, তত্ত্বকৌমুদী, ১৩৭২, ভাদ্র-কার্তিক। পৃঃ ১১৪।

১০. শচীন্দ্রনাথ সেন (রজনীকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র)—ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০।

১১. নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—কান্তকবি রজনীকান্ত। পৃঃ ৩৪-৩৫
১১ক. ঐ ঐ
১২ নারায়ণ চৌধুরী—রজনীকান্ত সেনের ভক্তিসংগীত, তত্ত্বকৌমুদী, ১৩৭২, ভাদ্র-কার্তিক। পৃঃ ১১০।
১৩. প্রমথনাথ বিশী—কান্তকবি রচনা সম্ভার। ভূমিকা অংশ।
১৪ শচীন্দ্রনাথ সেন—ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০।
১৫. গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী (রজনীকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০।
১৬. ভবতোষ দত্ত—রজনীকান্ত সেন, তত্ত্বকৌমুদী, ১৩৭২, ভাদ্র-কার্তিক। পৃঃ ১১২-১১৩।
১৭. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—উত্তরণের কবিতা, তত্ত্বকৌমুদী, ১৩৭২, ভাদ্র-কার্তিক। পৃঃ ১১৭।
১৮ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—উত্তরায়ণ (জীবনের অন্যনাম নিয়ত প্রার্থনা) পৃঃ ৪৮।
১৯. নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—কান্তকবি রজনীকান্ত। পৃঃ ২৬।
২০. শান্তি দেবী (রজনীকান্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা)—ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৯৭৬, ৩রা মার্চ।
২১. সুকুমার সেন—বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ৭৩।
২২. দিনেন্দ্র কুমার রায়—আত্মকথা, মাসিক বসুমতী, ১৩৪০, শ্রাবণ।
২৩. নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—কান্তকবি রজনীকান্ত। পৃঃ ৩৯।
২৪. দিলীপকুমার রায় (রজনীকান্তের দৌহিত্র)—ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৯৭০, ১৩ই মার্চ।
২৫ ঐ ঐ ঐ

অরুণ ভট্টাচার্য

অসমাপ্ত কবিতাগুচ্ছ

১ তিনি আমার সামনে দাঁড়ালেন
আমি তাঁর সামনে।
অকস্মাৎ
আমরা উভয়েই দাঁড়িয়ে পড়লুম, এক মুহূর্ত কেবল।
আবার দুজনে
যেমন যাচ্ছিলাম তেমনি
দুদিকে চলতে থাকলাম।

আমরা বোধহয় কেউ কাউকে চিনতে পারি নি।

২. তিনি চলে গেলেন,
ফিরে তাকালেন না কারো দিকে। শত চিৎকারেও না
শত মিনতিতেও চোখের তারা তাকালো না
মুখ খুললো না।

তবু কেমন মনে হলো
তিনি যেন বলছেন সবাইকে
সারা জীবন তোমরা আমাকে চেনো নি
চিনতে চাও নি।
এবার থেকে প্রতি মুহূর্তে
আমাকে চিনতে পারবে। যাবার সময় রইলো
এই আমার আশীর্বাদ।

৩. যুদ্ধ করাই শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হ'ল।

কাগজ কালি কলমের সঙ্গে একপ্রস্থ
সংসার স্ত্রী-পুত্র পবিবার দুই প্রস্থ
ডিবেক্টব বাহাদুব অর্থাৎ বড কেবানীর সঙ্গে তিনপ্রস্থ
অবশেষে কবিতাব আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ক জটিল প্রশ্নগুলির সঙ্গে
শেষতম যুদ্ধ।

এই যুদ্ধ এবং যুদ্ধশেষে বাত্রিবেলা
অনন্ত নক্ষত্রমালাব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
আমাব মনে হয়
প্রতিটি বণক্ষেত্র থেকে আমি এক একটি গোলাপ ফুল
উপহার পেয়েছি।

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

পূর্বলেখ

চাঁদের বুড়ির স্বপ্ন তন্ময় তামাকে।
দিন পাংশু আপিসে, দোকানে,
অনূর্দ্ধ-চল্লিশ ঘোরে জটিল ধাঁধায়
সহজে মেলে না অঙ্ক। বার্লিন, টোকিও,
মস্কোর মন্দির ঘোরে মাথায় মাথায়,
তবু
আকাশের ছেঁড়া-কাঁথা দিয়ে নাবে অঘ্রাণে আষাঢ়ে
রাম-রহিমের ভিত মাঠে কাঁপে,
যুবক বাতাস মাপে চিম্‌নির ঘামে ভেজা ভাঁজ,
বিকলাঙ্গ রাস্তা, তবু ট্র্যাফিক্ তটিনী,
আর
3x বোতল হাতে বিবিক্ত মিছিল।

কেন ভুলে পেতে চাও রোদ্দুরের শোক?
বিপন্ন বাব্‌লা চেনে কাঠুরেকে
বেলে-মাটি-পথে
কোথাও সবুজ নেই   অরণ্যের বিবেকী শাসন,
গাছের অভীষ্ট পঞ্চভূতের প্রসারা।
পদলেহী সমৃদ্ধি মৃণ্ময়।
সমুদ্রের সাঁকো নেই, অভিজ্ঞতা বলে।
কিন্তু জৈব স্বাদুতার স্রোতে
শেষ হবে মন্দার-মন্থন॥

সময়ের শতদলে

এখনো ভোরের মাঠে নীল স্বাতী তারার সুরভি।
কুয়াশা কাটে নি, দেখো স্থলপদ্মের স্বাহুতা,
সন্ত্রান্ত বৃক্ষের ছায়া অন্ধকারে আলোকিত সুতো
ছুঁড়ে দেয়। শব্দের বিনুনী বাঁধে একজন কবি
পেলব প্রেমিক নয়, বুকে তার দৃঢ় বজ্রমণি,
তৃতীয় নয়নে ফোটে প্রজ্ঞার পবিত্র কথকতা
চন্দ্রলোক-অভিযাত্রীদল খোঁজে রহস্য নবনী
পক্ষ প্রাণে যা দেবে পুলকিত সমুদ্র-বারতা।

কী কথা পাখীর রবে হিরণ্ময় সাহসী সকালে?
কেউ হয়তো খুঁজে পায় আবির মেঘের মৃদু মনে
এখনি মাঘের রোদে মুছে যাবে তৃণের শিশির
সাম্প্রত জল্পনা-কণা দানা বাঁধে মাকড়ের জালে,
পদ্মরাগ বসন্তের স্বপ্ন শুধু সেই কথা বোনে
সময়ের শতদলে, দেখে কার নম্র অশ্রুনীর।

পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

চারটি রূপদর্শী

মকরধ্বজী

ঢেউ-তোলা খোলা চুল আঙুলে জড়িয়ে
মুখ রেখে মুখে হাওয়া তার ডোবা চোখে
চুপি চুপি বলে : দাও সময় ছড়িয়ে
অস্থির খোয়াই রক্তে অতৃপ্ত পুলকে।
দূরে কাঁপা হলুদ রেখার তীরে বন,
জ্যৈষ্ঠ জয়ে মেলে না শিরোপা, হীরে মন
মাটির দর্পণে পড়ে না কো কারও ছায়া।
চলো যাই ওর কাছে চাইবো সুবাহা,
পাবো বীজ মকরধ্বজী। তারপর
চোখ ডোবে চোখে, খোলে মনের চাদর॥

সমর্পণ

উঠোনে আকাশ তার নিচু গলা খুলে
ঋজু ছায়া প্যাঁচায় আঙুলে : তুলতুলে
জামতলা নেভানো আরামী অফুরান
মেখেচুখে থর ঘাম গড়ালে শয়ান।
চুল ঘষে বুনো মোষ দু শিঙ উচিয়ে
খাড়া কান, মাটি খাবলে নিলে। জোড়া ফিঙে
মিশকালো উড়ে গ্যালো শিস্ টেনে টেনে।
একটি ফড়িং তার, সামলা পিরেনে
সন্ধ গলে নিচু গলা আরও নিচু করে
ডুবে গ্যালো গাল-ফোলা ব্যাঙের কামড়ে॥

যে যেমন

যে যেমন এই সংসারেতে চলচে
কেউ কারো না মানা। হলদে খামটা
ছিঁড়ে ফেললেই দাগ মুছে দেয় কলঙ্কে।
রাত নামে না। জরুরি আর খামখা
ধুলো রোদ্দুর এটা ওটার মুখে
ছাই দিয়ে এই সংসারটা তো চলচে,
অজন্মা হোক, ভরুক না হিংসুটে
রাজার প্রজার, ধরুক যতই মরচে
তীক্ষ্ণ আশার ফলায়, যে যেমন ইচ্ছেতে
ধান আগাছা বুনুক জীবনক্ষেতে।

যা ভেবেছি

যা ভেবেছি তাই, আসি যাই
ছুঁয়ে দেখি পৃথিবী একটাই।
চাই, পাই জল, পাই রোদ,
শর ফুলে দোলানো শারদ।
তারা চুমকি বালির আকাশে
কিংবা নক্ষত্র টাঙানো ঘাসে
চাষ-চষা বুক—এই সুখ
মাটির তিমিরে ফোটা মুখ
গন্ধজয়ী : একে বলে সোনা
বলো ধুলো, পৃথিবী স্বপ্ন না॥

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

১. ব্যক্তিত্ব

যে যে-ভাবনায় ছিল
একে একে আমাব কাছে আসতেই
কেউ স্থলপদ্ম
কেউ জলপদ্ম
কেউবা ঘুমে-ডোবা পাতিহাঁস হয়ে গেল
এবা যে যা-বাখতে পারে বাখে না
হয়তো থাকতে পারে থাকে না
কেমন যেন হয়ে যায়
এই হয়ে যাওয়া বা কমে যাওয়াব
অচল আযতনে ধরে বাখে চিবকাল

২ ঘুম

জেগে উঠতেই
জানালা দিয়ে লাফিয়ে
পড়ল ঘুম
অমনি সাতটি সূর্যমুখী
ফুটে গেল।
জাগরণেব গ্লানি
পাতায় শাখায়
লেগে নেই

মানস রায়চৌধুরী

তবু সুসময় কিছু

তবু সুসময় কিছু রান্নাঘরে, স্নানাগারে উজ্জ্বল পাপোষে
শব্দহীন পদচিহ্নে জেগে হয় স্বপ্নের সোদর
জীর্ণ দরজা শব্দ করে ঘুম ভাঙে কথা না বলার অনুজ্ঞায়।

আমাদের জন্ম মৃত্যু যেন বা বইয়ের ভাঁজে
নিমগ্ন পোকার মত সান্ত সনাতন
বিছানায় সেই ছায়া অতি চেনা তবু নামহীন
'অসম্ভব অসম্ভব'—এই বলে আলো আছড়ে পড়ে
ছায়ার ভিতরে বাড়ে পৃথিবীর ধাবমানতার বহ্নিরেখা
পিঠ বেয়ে নেমে আসে কেশবদামের মত অনিদ্র আবহ
তারপর ছায়া পড়ে নগ্নতার শয্যার চাদরে
খুব বড়ো পানের পাতাটি ঘিরে দাঁত আর রসনা নেমেছে
যেমন বন্দরে নামে জাহাজের নির্মল নোঙর।

বোমের দৃশ্য থেকে

যথার্থ সময়টিকে বেছে নিতে গিয়ে
তুমি যাও আলো আর আঁধারে জড়িয়ে—
এখন গভীর রাত্রি, বাইরে অঝোর বৃষ্টি ঝরে
এতদূরে এসে তবু খুঁজে পাও স্বদেশী অক্ষরে
প্রকৃতির বর্ণনাও—ওই ছাখো বৃষ্টিতে মালগাড়ি চলে যায়।
অশ্বক্ষুরে কেঁপে ওঠে পথের এ্যাসফল্ট, প্রতীক্ষায়
যেসব জানলার আলো মদির মুখশ্রী ধরে রাখে
সেখানে, কেবলই মনে হয় দুঃখ যেন গুঁড়ি মেরে থাকে
বিছানার একটু দূরে গ্যাসস্টোভ, রেফ্রিজেরেটার
শূন্য বুক, শুধুই বরফে ভরা শীতল ভাঁড়ার
বুদ্ধের পায়ের শব্দে কেঁপে ওঠে যথার্থ সময়।

দিব্যেন্দু পালিত

দুটি কবিতা

১ চাদর

হাওয়ায় এমন শীত। তুমি যাও,
ওকে গিয়ে বলো,—
একটিই চাদর, আমি ভুলে ফেলে এসেছি সেখানে।
কাঁপছি দাঁড়িয়ে ঐ শীতেরই মতন, নয দৃশ্যমান, একা।

সে যেন নিজেই এসে দিয়ে যায়—
যেন
ভাঁজ ভেঙে ফলে ওই তুষের আগুনে পুরো জড়ায় নিজেকে

রাস্তা অনেকটা, তবু সে যখন পৌছুবে এখানে
যেন বুঝে নিই আমি ওই তপ্ত অলৌকিক চাদরে আমার
শীতের শরীর ভেঙে উড়ে যাচ্ছে আগুনের ডানা।

২. শব্দ চাই, দাও

মধ্যরাত পার হতে আরো কিছু শব্দ চাই, দাও।
তুমি সুখ চিনেছিলে, আমিও চিনেছি সুখ, এভাবে গোপনে
খেলা হলো। রক্তপাত পর্দার আড়াল দিযে চলে গেল সম্মতি জানাতে।

যোদ্ধার পোষাক থেকে নামছে অস্ত্রের জটা যেরকম ম্লান শবদেহ
সবান্ধব হেঁটে এসে একা-একা নেমে পড়ে ক্রিমেটোরিয়ামে—
এখানে আগুন জলে, ওখানে জন্তুর মাংস ঝলসায় আর-এক আগুনে।

বর্ণহীন বর্ণনায় এসব উপমা জলে, শুধু আমাদের
সফল সময় থেকে সময় হরণ করে টেনে নেয় পিছনের দিকে।

বটকৃষ্ণ দে

কণ্ঠস্বর

এই আমি বেশ আছি। গোপনে, গভীরে
মর্মবিত একাকীত্বে, একক সভার সভাপতি।
আমি বলি, আমি শুনি,
শব্দের বিস্তারে জাল বুনি—
প্রিয়তম কণ্ঠস্বরে নিজেই জড়িয়ে যাই, অজান্তেই
মন মেলি দক্ষিণ সমীরে।

চন্দ্রাহত

সাজিয়ে রেখেছি আমি, এসো
পূবের বারান্দাটুকু, ছোটো যদিও—
জানি না কী পাবে, কিংবা কী চাওয়া তোমার,
সূর্যদিন, নাকি কোনো নক্ষত্রের রাত ?
দিন তো আমার নয়, রাত্রি কার ?
চন্দ্রাহত আমি দেবো
চন্দ্রমল্লিকার একগুচ্ছ, প্রিয়।

কল্যাণেষু

পা' পা' ক'রে পথ চলে গেছে—
বল তো কোথায় ?
ওই আকাশটা থামলো কোথায় ?
এই তারাগুলো খ'সে গিয়ে বন্যো
মিশলো কোথায় ?
তিথি গুণে গুণে পূর্ণিমা নামে
অঙ্গনে কার ?
বন্ধু আমার, থাকে পূর্ণিয়া
দূর কাটিহার॥

কালীকৃষ্ণ গুহ

গণ্ডার

[ইউজেন আইওনেস্কোর রাইনোসেরাস নাটকটি মনে রেখে]

আমরা কেউ গণ্ডার হ'তে চাই নি।
আমরা সবকিছু বুঝতে চেষ্টা করেছি—ব্যবহার করেছি পরিচ্ছন্ন যুক্তি এবং জ্ঞান।
মানুষের সভ্যতা-কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা মেধা এবং
সৌন্দর্য-বোধ ব্যবহার করেছি।
আমরা পার হ'য়ে এসেছি হিমযুগ, প্রস্তর যুগ,

অথচ আমাদের মধ্য থেকে একজন হঠাৎ গণ্ডার হ'য়ে গেলো এক সকালে
ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর'তে ক'রতে আরও একজন অবিশ্বাস্যভাবে
গণ্ডার হ'য়ে গেলো।
তারপর আরও একজন, আরও আরও আরও একজন, তারপর অসংখ্য
আমাদের পরিচিত মাষ্টারমশাই, অধিকর্তা, নেতা, সম্পাদক, দার্শনিক, কবি,
বেশ্যা, উকিল গণ্ডার হ'য়ে গেলো।

আমরা হাহাকার ক'রে উঠলুম, আর হাহাকার ক'রতে ক'রতে লক্ষ্য করলুম,
আমাদের গলার স্বর দ্রুত কর্কশ ও জান্তব হ'য়ে উঠেছে, আর ক্রমশই
অসম্ভব ভারী হ'য়ে উঠছে শরীর ....

উৎসব

আজ বিকেলবেলা একদিনের মতোই ছায়া এসে পড়ছিলো এই বাড়ির উপর,
যার ভিতরে জন্মদিনের উৎসব পালিত হয়েছে।
আজ এই বাড়িতে অনেক লোকজন এসেছিলো, অজস্র বেলুন এবং খাবার-
দাবার এসেছিলো।

তুমি সারাদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে রাত্রিবেলা ফিরে এসে দেখেছো
উৎসবের পরিত্যক্ত অন্ধকারে শুয়ে রয়েছে
একটি বিড়াল।

ফিরে এসে একটিও কথা বলো নি তুমি, শুধু অনুভব ক'রেছো একটি উদ্দেশ্যহীন বিরাম, যা তোমাকে বারবার উৎসবের ম্লানতা, আর কবিতার কাছে নিয়ে যায়।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

দুটি কবিতা

১. মাটি নয়, অন্বিষ্ট মানুষ

মাটি নয়, অন্বিষ্ট মানুষ , মানুষের
নিশ্বাসে নৈরাশ্য দেখে দুঃখ পাই শাস্তি তো অনড়
পাথর এমন নয় পেতে হয় তাকে চড়াদামে

কানাকড়ি দামে সে বিকায় যদি যদি প্রাণ গড়ায় ফুটপাতে
নিত্যদিন যদি সীমিত আয়ুর সাধ ঝড়ে ও তাণ্ডবে তার
শিকড় উপড়ে দিয়ে চলে যায় ফলন্ত হবার স্বপ্ন
অকালবৈশাখী যদি আছড়ে ফেলে দিয়ে যায়
তার নিষ্ফলতা জানি বোঝাবার ভাষা নেই কোনো

এদেশে চারার স্বপ্ন ছাগলে মুড়িয়ে দেয় বুনো হাতি এসে
ভাঙে ঘর অরক্ষিত জীবনের ঊর্দ্ধমুখি সকল প্রার্থনা
ভেঙে চুড়ে শ্মশানের শাস্তি আনে
মৃত্যু যেনো বহুরূপী পায়ে পায়ে ঘোরে ভয় দেখায়
নিজে কি পেযেছে ভয় কোনোদিন জীবিতের প্রতিবোধ ?

তবুতো জোনাকি হয়ে জ্বলে অন্ধকারে প্রাণ জ্বালাতেও চায়
মড়কে কাদায় ডোবা শরীরের ইচ্ছা দেখি মরেও মরে না
এদেশের মাঠে ঘাটে প্রতিদিন দধীচিরা বজ্র নড়ে, তুলে দিয়ে যায়
দেবতার হাতে আর কানাকড়ি দামে তার সন্তানের শরীর বিকায়

২ দুঃখ যে বুদ্‌বুদ্‌ তোলে

দুঃখ যে বুদ্‌বুদ্‌ তোলে মিশে যায় স্রোতের শরীরে ,—
তাই বাঁচি অস্তিত্বের উপরিতলের কোলাহল
রক্তপাত রক্তক্ষরণের হিম কান্তি ও বিষাদ ধীরে ধীরে
হয়ে যায় উষ্ণ নীল জল

ডুবে থাকি ওই জলে   আমরণ এ অবগাহন
ভেসে থাকা   শিখে নিই ডোবা ও ভাসার রীতিনীতি
এ দেশে দৈনিকে ঘটে অবেলায় উদ্‌বাহুবন্ধন
আমাদের সত্তা বুঝি বুদ্‌বুদেরই নিজস্ব প্রকৃতি

দুঃখে নেই চোরা স্রোত   কৌতুক বা রঙ্গপরিহাসে
নিরাশ্রয় নির্বান্ধব মানুষকে নিয়ে সে মাতে না
আঘাতে চৈতন্যে দিতে প্রখর আগুন ভালোবাসে
ঘুমের নির্বোধ সুখে ঠেলে দিতে সে ভালেবাসে না

তার খেলা বালকের   ভাঙে চোড়ে   কষে লাথি মারে
বিড়ালছানাকে নিয়ে খেলাচ্ছলে ঠেলে দেয় জলে
হিংস্রতা শেখায়   সমাদরে তুলে লয় ঘাড়ে
বাঁচার সহজপাঠ বলে ফেব ডোবে সে অতলে

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

স্বপ্নবিষয়ক

এই মাত্র স্বপ্নগুলিকে কবর দিয়ে আসতে না আসতেই
আবার স্বপ্নের মুখোমুখি ,

অথচ কিছুক্ষণ আগেই মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে
একের পর এক বুক হাল্কা করেছি ,
দু' পকেট বোঝাই স্বপ্নের রঙিন চিরকুট
টুকরো টুকরো করে হাওযায় উড়িয়েছি ,
আরো যা কিছু মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল
সমস্ত ঝেড়ে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে
ফিরতে না ফিরতেই আবার স্বপ্নের মুখোমুখি !
যাকে নির্বাসন দেবো বলে সবুজ-নির্জনে

মন তৈরী করলাম
ইতোমধ্যে পাযে পায়ে সে কখন এসে
মনকে আবার সাজাতে বসেছে ।

বাঘ

অন্ধকারে কিছু স্পষ্ট নয় ,
শুধু অন্ধকারে অন্ধকার নড়ে চড়ে ওঠে ,
গূঢ় বিস্ময়ে বাতাস থমকে দাঁড়ায় ।

ভেবেছিলাম জানালা খোলা রাখলে
নক্ষত্রপুঞ্জ হয়তো থমকে দাঁড়াবে,
উদ্ভাসিত বাতায়নে মনে পড়বে ব্যতিক্রম দিনের কথা ।

কিন্তু কেমন যেন কংক্রিট চারপাশ ঘিরে রাখে ,
নিয়মের শৃঙ্খল ভারী হয়ে ওঠে টেবিলে ,
ছড়ানো ফাইলপত্তর বিশুষ্ক দোয়াতদানি
ভিড় করে' অন্ধকারে মিশে যায়

অন্ধকারে কোনও কিছু স্পষ্ট নয়।
মানুষের সংসার কেমন ক্রমশ নিস্তব্ধ,
অন্ধকারে অন্ধকার নড়ে উঠলে
চতুর্দিকে কেমন তৎপরিত উদ্যত শিকার
আমাদের চতুর্দিকে নিজেরাই ডোরাকাটা
যেন নিজেদেরই দু'চোখ জ্বলে ওঠে
অন্ধকারে।

চতুর্দিকে বড়ো বেশি অন্ধকার॥

স্বপ্নের মধ্যে জলপিপি

এক এক দিন স্বপ্নের মধ্যে
জলপিপি উড়ে আসে।

এক এক দিন অলস ভ্রমণে
বেলা বহে যায়।
দূর থেকে মাদলের শব্দ শুনে
চাঁদ ওঠে;
মহুয়ার পরাগ মাখবে বলে
কার পায়ের নূপুর বেজে ওঠে
মধ্যরাত্রে?
গীর্জায় মধুর সংকেত মধ্যযামের.

এক এক দিন স্বপ্নের মধ্যে
জলপিপি উড়ে এলে
বুক জুড়ে শৈশব
স্মৃতি খোঁজে,
আমলকির ছায়ায়
মনের মধ্যে মন
কেমন যেন নিজেকে খুঁজে বেড়ায়

সুনীথ মজুমদার

কয়েকটি কবিতা

১. যা মনে রাখতে চাই মনে থাকে না
যা ভুলতে চাই, ভুলতে পারি না
যা মনে-মনে বুঝতে পেরেছি ঠিক বলে
তা প্রকাশ করতে পারি না
কঠিন-সহজ, যন্ত্রণা-সুখ, এই রকম অনুভব

২. কালো আকাশ দীর্ণ করে পাগল আনন্দে
ধমকাচ্ছিলো বিদ্যুতের শিখা
ধমক খেতে ভালোই লাগছিল
এ সব বহুকাল থেকে হচ্ছে আরো কতকাল হবে।

৩. আমি সব কিছু দিয়েই দিতে চাই
পরিবর্তে কিছুই চাই না তোমাদের কাছে
আমি যেন আমার সবটুকুই দিয়ে যেতে পারি
একটি কণাও সঞ্চয় যেন না থাকে আমার

দেবার মধ্যে যে আনন্দ, সেই আনন্দটুকু পাব বলে
নিজের চুরাশি লক্ষ স্নায়ুকোষে
আমার সব কিছু দিয়ে যাবার বাসনা।

আর যেদিন
আনন্দ টসটস করে বুকের মধ্যে
জমতে থাকবে
সেদিনও এই এক আনন্দই নিঃশেষে দিয়ে যেতে চাইব

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কবিতাবলী

শৈশব-সংক্রান্ত

ক ঠাকুমা তাঁর ছেলেবেলার বয়সটাকে ফিরিয়ে যখন আনেন,
কাঁচা আমের গন্ধ থাকে সঙ্গে।
আমি আমার ছেলেবেলার বয়সটাকে তখন ফিরে দেখি,
কাঁলসিটে দাগ পড়েছে তার সোনালি ম্লান অঙ্গে।

খ. একদা পথের ধারে
কাগজের লাল ফুল কুড়িয়ে সে পেয়ে গিয়েছিল,
সিঙ্গির বাগান থেকে চুরি করে এনেছিল কামরাঙ্গার ফল।
সমস্ত কলকাতা ঘুরে বালক বয়সী কাউকে না পেয়ে হঠাৎ,
ভিখিরী বুড়িকে বলল, চল্ বুড়ি, গাঁয়ে যাবি, চল্।

গ. রঙ্গিন বলটা কুড়োতে যাই যখন আমি মাঠের মধ্যে
তখন শুধু চোখের সামনে অন্ধকারের পাহাড় দেখি,
তখন আমি ফিরে আসি কঠিন গন্ধে।

অন্য কবির প্রভাব, য়েট্‌স্‌ ও প্রসঙ্গত

"In the critics' vocabulary, the word 'precursor' is indispensable, but it should be cleansed of all connotation of polemics or rivalry The fact is that every writer creates his own precursors. His work modifies our conception of the past, as it will modify the future. In this correlation the identity or plurality of the men involved is unimportant" (Jorge Luis Borges "Kafka and his Precursors" : Labyrinths.)

একজন কবি, তিনি যতই তাঁব আত্মজ শব্দ এবং রূপকল্পে ও কবিত্বে আস্থাশীল হোন্ না কেন, অবচেতনে বা সচেতনে অন্য আব একজন কবিব দ্বারা নিশ্চিত প্রভাবিত এবং সেই কবি স্বভাবতই তাঁর পূর্বগামী ও অগ্রজ। একজন কবির ওপর অন্য কবির প্রভাবের তত্ত্বকে তর্কাতীত ও বিরোধহীন বলা সমীচীন নয়, যেমন বলেছেন বর্গস্‌, কাবণ, কবি ও তাঁর অগ্রজের প্রভাব, এই দুরূহ সম্পর্কের মধ্যে স্বচ্ছতা নেই, আছে সর্পিল এবং জটিল কিছু মননের গোলকধাঁধাঁ যার অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কারে সন্ধিৎসু সমালোচক এবং পাঠকের প্রত্যয় অনেকসময় বিচূর্ণ হয়। অনেকের ম'ত, কাব্যপ্রভাব ব্যাপারটা এমন কিছু নয় যার জন্য এত উদ্বেগ, এটা আসলে ঘটে যায়, খানিকটা থিওরি অফ্‌ ইনহেরিটেন্সের মত, পূর্বসূরির প্রোথিত কিছু ধ্যান-ধারণা ও শব্দরূপপ্রকল্প যুগের অন্তবর্তী সময়টুকু কাটিযে সময়োচিত যাথার্থ্যে ন্যস্ত হয় উত্তরসূরির হাতে। এতে শেষোক্তের যতটা না উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হওযার লজ্জা তার চেয়ে বেশী উদ্বেগ ঐ প্রাপ্ত সম্পত্তিকে যুগোপযোগী করে তোলা। এটা খুব সত্য যে কোনো নতুন কবিই কোনো এক নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যূষে কাব্যের উদ্যানে জন্মগ্রহণ করে না অথবা দাবী করে না প্রথম মানব বলে, কারণ সে জানে কেউ না কেউ অথবা প্রত্যেকেই এক একটি

প্রজন্মের পিতা। নতুন কবি ঐ অনেক পূর্বপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধরত হয়, বুঝে নেয় সে তার প্রথম প্রচ্ছায়ায় মননের সঙ্গে বহু-সৃষ্ট মননের সাদৃশ্য, এবং যুদ্ধ চলে। একদিকে আত্মগত বিষাদ ও অন্যদিকে উদ্বেগ থেকে পৃথক কোন কবির প্রভাব এসে পড়ে। এর মধ্যে থাকে অগ্রজ কবি সম্পর্কে অনুজ কবির বোধ এবং অনুজ কবির নিজস্ব কবি-কীর্তির সঙ্গে অগ্রজের সম্পর্ক-চেতনা। প্রশ্ন জাগে পূর্বস্মৃরি কি তাঁর শিল্পে অনেকাংশে শূন্য, যা পূর্ণ হতে পারে অথবা তাঁর শিল্প-প্রাধান্য কি অনুজের কাব্যচিন্তাকে ব্যাহত করছে? কিম্বা অগ্রজ যে অর্থে ত্রুটিপূর্ণ তাকে ত্রুটিমুক্ত করতে অনুজের অনুসন্ধান তীব্র হয়? এইরকম পবিশোধন-বাদী অর্থে নতুন কবি, হয়তো বা ভুল ব্যাখ্যা করে, অগ্রজকে নিজের মত করে গডে নেয় এবং নিজের উন্মেষ ঘটে উত্তবোত্তব ও কাব্যিক বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায়। আবার এব বিরুদ্ধমতের পোষক বলেন, যেমন ফ্রাই তাঁর মিথ অফ্ কনসার্ণ-এ . We belong to something before we are anything, এক্ষেত্রে কবিব খ্যাতি ও প্রভাব উভয়ই তাঁর নিজস্ব। ফ্রয়েডের মতে, প্রতিটি মানুষেরই অবচেতনে নিজেই নিজের পিতা হবার সুপ্ত এষণা থাকে এবং সে অর্থে মাতাকে অধোগমন থেকে উদ্ধার করাব। সব মানুষের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব সত্য না হলেও কবির ক্ষেত্রে সত্য। কবি অনেকাংশেই নিজেই তার পূর্বস্মৃরির ভূমিকা নেয় ও মাতৃস্বরূপা মননকে অধোগমন থেকে উদ্ধার করে।

এই ব্যাখ্যায় অন্য কবির প্রভাব ও রোমান্টিক প্রেম প্রায় সমার্থক কারণ, ন্যাটমোরের ভাষায় What a lover sees in the beloved is the projected shadow of his own potentiel beauty in the eyes of God , নিশ্চিতভাবে নতুন কবি এমন দর্শনেই সন্দর্শন করেন পূর্বস্মৃরিকে এবং যার আর একটি সমাধান পল ভ্যালেরির অন্য এক মন্তব্যের কাছাকাছি · One only reads well when one reads with some quite personal goal in mind It may be to acquire some power· It can be out of hatred for the author.

এযাবৎ আলোচনার বিধৃতি একজন মুখ্য পুরুষকে কেন্দ্র করে, তিনি উইলিয়াম বাটলার য়েট্স্, কারণ উনবিংশ বিংশ শতাব্দীতে বোধ হয় একমাত্র য়েট্স্ই কোনো একক ঐতিহ্যের অন্তর্গত কবি না হয়েও, বহু কবির ধারাবাহিক

ঐতিহ্য উদ্বুদ্ধ। উইলিয়াম ব্লেকের মত উত্তুঙ্গ কবিরও পূর্বসূরির বোধির প্রভাব ছিল। এটা আপাতত অবিশ্বাস্য হলেও স্পষ্ট। ব্লেকের 'মিল্টন' একজন নিশ্চিত এবং সম্পূর্ণ কবি এবং মিল্টনের অস্তিত্ব ব্লেকের কাছে প্রায় শাস্ত্র-সিদ্ধ। ব্লেকের 'ম্যারেজ অফ্ হেভেন এণ্ড হেল' যে ব্যাপকভাবে মিল্টন-ব্যাখ্যাত এটা সমালোচকের স্বর্থ্যপ্রীতির উর্দ্ধে। প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচনার সমর্থনে ব্লেকও বিশ্বাস করতেন যে পূর্বগামীর অনুভাব এবং প্রভাব ত্যাগ করা অনুবর্তীর পথে কঠিন। এবং ঠিক একই কারণে য়েট্‌স্ কিছুটা রোমান্টিক ঐতিহ্যে কিছুটা বা পরিত্যাজ্য বলে শেলী এবং ব্লেকের অবচেতন উত্তরসূরি। ব্লেকের 'মিল্টন' এর একটি স্তবকের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গত স্মরণ করি :

All these are seen in Milton's shadow who is the Covering cherub

The Spectre of Albion in which the spectre of Luvah inhabits

In the Newtonian voids between the Substances of creation

কবির আত্মক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধ হয় যে শুধু নিজেকেই পাঠ করা যায় এবং তখন কবি তার সৃষ্টিশীলতায় ক্রমাগত অনুপ্রবেশকারী প্রতিবন্ধককে সজোরে বাধা দেয়। এই প্রতিবন্ধক, ব্লেকের সংজ্ঞায়, 'Covering Cherub' এবং উপরোক্ত উদ্ধৃতির Milton's shadow হল সেই ছায়া যা অনুবর্তীর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে' তার উন্মেষকে ব্যাহত করে। Covering Cherub ও Miltons shadow এখানে প্রায় সমার্থক।

স্বল্প পরিসরে য়েট্‌স এর ওপর শেলী ও ব্লেকের প্রভাব আলোচনা করা যায়। য়েট্‌স্ এর যৌন জাগৃতি ঘটেছিল বিলম্বে একথা তাঁর নিজের স্বীকার এবং প্রথম উন্মেষ, যখন বয়স তাঁর সতেরো, তিনি আকৃষ্ট হয়েছিল শেলীর আলাষ্টার এবং প্রিন্স আথানেস-এ। তাঁর প্রথম কাব্য দুর্বল বিবেচিত হয়, কারণ তিনি সরাসরি গলাধঃকরণ করেন শেলী ও স্পেন্সার এবং ঐ কারণেই কবিতাটি তাঁর কালেক্টেড পোয়েমস এ স্থান পায় নি (পরে অবশ্য ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিভিউতে প্রকাশিত হয়)। এটি হ'ল দীর্ঘ অবয়বের রূপকাশ্রিত কাব্যনাটক,

দি আইল্যাণ্ড অফ ষ্টাচুস্। দুটি মেষপালক, নম্র কিন্তু উদ্দীপিত, এক গর্বিতা মেষপালিকার প্রেমে পড়ে, যে ঐ মেষপালকদ্বয়ের ভীরুতাকে ঘৃণা করে। এক শিকারী, ঐ পালিকার ভালবাসা-প্রার্থী, প্রবেশ করে যাদুময় এক প্রস্তরমূর্তির দ্বীপে, একটি রহস্যঘন ফুলের সন্ধানে, যে ফুলকে আবৃত করেছে এক ভয়ঙ্কর যাদুকারী। আগে এই দ্বীপে ফুলের অনুসন্ধানীর নির্ঘাত পরিণাম হয়েছে প্রস্তরমূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়া। শিকারীর বরাতেও তাই। এদিকে মেষপালিকা তাঁব প্রেমাকাঙ্ক্ষী দুই মেষপালককে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত করে খুঁজতে চলে শিকারীকে। বালকের বেশে প্রবেশ করে সেই মায়াময় দ্বীপে, যাদুকারীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে দেয় ও পেয়ে যায় সেই নিষিদ্ধ ফুল যার স্পর্শে সে প্রস্তর মূর্তিগুলিকে রক্তমাংসের জীবন দান করে এবং এইভাবে দ্বীপেব যাদুকরী ধ্বংস হয়। এই নাটকের শেষ মেষ মেষপালিকা তার শিকাবী প্রেমিক ও অন্যান্য প্রাণপ্রাপ্ত প্রস্তর মূর্তিরা সিদ্ধান্ত নেয় তারা ঐ দ্বীপেরই বাসিন্দা হবে। শেষে দেখি, উদিত চাঁদের আলোয শিকাবী ও অন্যান্য প্রাণপ্রাপ্ত মূর্তির দীর্ঘাযত ছায়া পড়ে দ্বীপের ঘাসে ঘাসে, কিন্তু মেষপালিকা ছায়াহীন, তার আত্মা ইতিমধ্যে মৃত, এটা তাঁরই সঙ্কেত। য়েট্স্-এব ফ্যাণ্টাসি-প্রসূত এই কাব্যে শেলীব অ্যালাষ্টর নিঃসন্দেহে ক্রিয়াশীল, যেমন শেলীর অ্যালাষ্টর এবং প্রমিথিউস আনবাউণ্ড অবচেতনে উপস্থিত য়েট্স্-এর দি টু টাইটানস্ এ। য়েট্স্-এর দুই টাইটানস্-এব একজন শেলীর অ্যালাষ্টর-এর সেই বিষণ্ণকবির প্রতিচ্ছায়া এবং প্রমিথিউসের মত সেও পাথরে বাঁধা, যদিও তাঁর স্বপ্ন একজন সিবিলকে ঘিরে। অ্যালাষ্টর য়েট্স্কে তার সতেরো বছর বয়সে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং তাঁর যৌন জাগৃতির প্রথম বিকাশের কথা পরে অটোবায়োগ্রাফিতে

"As I climbed along the narrow ledge, I was now Manfred on his glacier, and now Prince Athanese with his solitary lamp, but I soon chose Alastor for my chief of men and longed to share his melancholy, and may be at last to disappear from everybody's sight as he disappeared, drifting in a boat along some slow-moving

river between great trees. When I thought of women, they were modelled on those in my favourite poets and loved in brief tragedy or like the girl in the Revolt of Islam, accompanied their lovers through all manner of wild places, lawless women without homes and without children."

এইভাবে অ্যালাষ্টর-এ শেলীর এন্টিথেটিক্যাল নির্জনতার প্রভাব যুবক য়েট্‌স্‌কে ভাবায়, টাওয়ার এর নির্জনে একক প্রিন্স অ্যাথানেস য়েটস্-এর কাব্যকে আবৃত করে এবং দি রিভোল্ট অফ ইসলাম্ এর বিদ্রোহী সিথনা য়েট্‌স-পরবর্তী-কালে মড্‌গন্ প্রকল্প গড়ে তোলে নিঃশব্দে। শেলীর রূপকল্প য়েট্‌স এর প্রাথমিক ভাবধারা গঠনে কতটা ক্রিয়াশীল তার আরও একটি উদাহরণ য়েট্‌স্ এর একটি বিশিষ্ট উক্তিতে . In later years my mind gave itself to gregarious Shelley's dream of young man his hair, blanched with sorrow studying philosophy in some lonely tower ···বর্জিত যুবকটি প্রিন্স অ্যাথানেস এ বোধগম্য।

যুবকের মনোগত উৎকাঙ্খা ও অপরিণত মননে গ্রহণ বর্জনের মাঝদরিয়ায় এমন অভাবি কারণেই য়েটসের কবিতা কখনো বা ব্লেক-দর্শনে আপ্লুত। দি টু টাইটান্‌স্-এর মুখ্য প্রভাব যেমন শেলীর অ্যালাষ্টর বা প্রমিথিউস আনবাউণ্ড, তেমনি সেখানেও পাঠকের অন্তর্দ্বন্দ্ব হয় কোথাও যেন ব্লেকও সুপ্ত। মনে পড়ে যায় শেষোক্তের দি মেণ্টাল ট্রাভেলার-এর জটিল মনন। তাই অনেকের জিজ্ঞাসা, তবে কি শেলী আর ব্লেকের রোমান্টিক মোহানায় ভাসমান যুবক য়েট্‌স্ ও তার দি টু টাইটানস। য়েট্‌স্-এর ওপর ব্লেকের প্রভাব কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। উইলিয়াম বাটলারের বাবা জন বাটলার য়েট্‌স্ যৌবনে শিল্পী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন একটি ছোটখাটো প্রাক্-র‍্যাফেলীয় দলে, সঙ্গে ছিলেন এডুইন, জে, এলিস যাঁর সাহিত্য পরিচিতি গণ্ডীবদ্ধ, একজন গরীব, ছবি-আঁকিয়ে, অল্পখ্যাত কবি ও ব্লেক-সমালোচক। দলটির নাম, ব্রাদারহুড, লক্ষ্য, কবিতা ও ছবির সমন্বয় এবং মুখ্য বিষয়বস্তু ব্লেক ও ডি, জি, রসেটি। জন বাটলারের কাছে ব্লেক ছিলেন 'মাইটি পোয়েট', এবং শেলী

খুব একটা জাগ্রত নয় তখনও। ১৯১৬য় যখন উইলিয়াম বাটলার উত্তর-যৌবন, জন বাটলার তাঁকে লেখেন · With a single line Blake or Shelley can fill my vision with a wealth of fine things—তাই য়েট্‌স-এর প্রথম জীবনে ব্লেকের সঙ্গে রসেটিই বেশী সম্পৃক্ত, শেলী বা নীৎসের মত বিদ্রোহীদের আগমন অনেক পরে—When I was fifteen or sixteen my father had told about Rossetti and Blake and given me their poetry to read , এইভাবে প্রাক-র‍্যাফেলীয় ব্লেকের প্রভাব য়েটস্‌কে ভাবিত করেছে। ব্লেকের মিষ্টিসিজম্‌-এর প্রতি য়েটসের আনুগত্য খুবই স্পষ্ট : The chief difference between the metaphors of poetry and the symbols of mysticism is that the latter are woven together into a complete system. অন্যান্য নানা দর্শনের ক্ষেত্রে য়েটস্‌-ব্লেক সাদৃশ্য ছাড়াও ছোট্ট একটি ঐক্য থেকে সমগ্র কাব্যদর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত, যখন দেখি রোমাণ্টিক কবিদের ধারাবাহিকতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ কীটস বা শেলীর মত কবির কাল্পনিক শীর্ষে অবস্থানের আত্মোপলব্ধিকে ব্লেক যেমন বিবৃত করেছেন টায়ার অফ লস এ, য়েটস্‌ও তাঁর 'পোয়েট ইন দি টাওয়ার' রূপকল্পে সেই একই ঐতিহ্যে প্রণোদিত। ব্লেকের খ্রীষ্টেরা সঙ্গে লস-এর একাত্মকরণ, য়েটস এর খ্রীষ্টের সঙ্গে উপনিষদের আত্মার সমীকরণ। ইত্যাদি নানা প্রভাব সত্ত্বেও এটা কিন্তু স্বীকার্য যে বয়স্ক য়েটস্ গড়েছিলেন ভিন্নতর এক অভিনব কাব্যদর্শন, নিজস্ব স্বজ্ঞায়। পরে তাঁর আত্মোপলব্ধি ও বিশ্বোপলব্ধির মধ্যে ব্যবধান অবলুপ্ত হয়, এবং উপলব্ধ হন যে শান্ত আর অনন্ত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ, আত্মা আর অনাত্মার সালোক্যই পুরুষসিদ্ধির পন্থা, এবং সমস্ত য়েট্‌স-অবয়বকে নিপুণ পরিদর্শনে বোঝা যায়, তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাবনী ও অনুপম।

য়েটস্ সম্পর্কিত এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার সমাপ্তিতে মন্তব্য করা যায়, যে কোনো বড় কবি আত্মজ ভাবধারার পরাভব মেনে নেন না , তাই, যৌবনে অন্য অনেকের মতই, য়েটস্ এর রঙীন চেতনায় শেলী বা ব্লেক বা আরও দূরান্তে স্পেন্সার এবং নীৎসে কিছু লাল, হলদে, সবুজ রঙ মাখিয়ে দিলেও চরম উৎকর্ষের নিকষে তিনি বিশুদ্ধ এবং সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় 'প্লেটো, প্লোটাইনাস ও শঙ্করাচার্য্য,

ভিকো, সোরেল ও মার্কস, ব্লেক, শেলী ও কেলটিক সাহিত্যের" সমন্বয়ে য়েটস্ এক সর্বতোভদ্র বিশ্ববীক্ষার নির্মাতা।[১]

অনুপ মতিলাল

তন্ত্রে শব্দ

শাস্ত্রে শব্দকে বলা হয়েছে 'বাগেব ব্রহ্ম'। শব্দ বলতে ধ্বনি মাত্রকেই বোঝায়। শব্দের দুরকম বিভাগ—বর্ণাত্মক ও ধন্যাত্মক। দুটী বস্তুতে ধ্বনির উৎপত্তি।

বর্ণাত্মক শব্দ হল অকারাদি ক্ষ-কারান্ত বর্ণমালায় যার অভিব্যক্তি, আর যাতে অক্ষরমাত্রা অভিব্যক্ত হয় না তার নাম ধ্বনি। মূলে ধ্বনিই আসল, শব্দ তার পরিণাম। এই ধ্বনিই জীবের চৈতন্যময়ী সঞ্জীবনীশক্তির অসাধারণ সূক্ষ্মস্বরূপ, ধ্বনিরূপেই জীবদেহে তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব .

ব্রহ্মাণ্ডং গ্রন্থমেতেন ব্যাপ্তং স্থাবরজঙ্গমম্।
নাদঃ প্রাণশ্চ জীবশ্চ ঘোষশ্চেত্যাদি কথ্যতে॥

অর্থাৎ ধ্বনিময়ী শক্তি দ্বারাই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড রচিত এবং ব্যাপ্ত, সেই শক্তির নাম নাদ, প্রাণ, জীব, ঘোষ ইত্যাদি বলা হয়।

জীবদেহের সঞ্জীবনী শক্তি হচ্ছে শব্দ। দেহধারী জীব সর্বদাই শব্দে বা জপমন্ত্রে যোগসাধনায় রত আছে, এতেই তার অস্তিত্ব—এর নাম অজপা জপ বা হংসমন্ত্র। প্রকৃতির নিয়মে শ্বাস-প্রশ্বাসের আগমন-নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে জীব এই

---

[১] যে বইগুলি সাহায্য করেছে .

১. Yeats : Harold Bloom.

২. The Poetry and Prose of William Blake, ed. David V. Erdman.

৩. Modern Tendencies in English Literature : Amiya Chakravarty.

৪. ডবলু. বি. য়েট্স ও কলাকৈবল্য (১৯৩৬), স্বগত : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

জপ করে চলেছে অবিরাম—ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন প্রশ্ন এতে নেই—স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই জীবদেহে এটা চলছে বলে এর নাম অজপা জপ। এই অজপাই হচ্ছে জীবের পূর্ণ পরমায়ু।

আমরা যে কথা বলি সেই বাক্‌ই হচ্ছে শব্দের নিম্নতম ভিত্তি। এর সঙ্গে আমাদের মনোভাব নিহিত থাকে। কথা বলার আগের অবস্থা ভাবনা, সেই ভাবনা ভাষার মাধ্যম ছাড়া হয় না। আমাদের ফুসফুসের বায়ুই আত্মার আবেগে ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠকে আঘাত করে এবং ধ্বনিরূপে মুখগহ্বরের আকাশকে কম্পিত করে, বাইরের আকাশে তাই শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। তন্ত্রমতে এই মৌলিক শব্দগুলিই হচ্ছে বর্ণমালা বা অক্ষর। এই পঞ্চাশৎ বর্ণমালাকে বলে অক্ষরমাতৃকা। এরাই বাগ্‌বেদীর অক্ষমালা এবং দেবী কালিকার গলদেশের মুণ্ডমালা।

শব্দের চারিটি অবস্থা : পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরী। যে শব্দ খর বা স্পষ্টরূপে কানে লাগে তাই হল বৈখরী। এই ব্যবহারিক শব্দ পঞ্চভৌতিক দেহস্থিত প্রাণশক্তির এবং দেহীর প্রকৃতিগত আত্মিক ইচ্ছাশক্তি বলে স্ফুরিত হয়ে বিশ্বব্যাপী আকাশে মিশে যায়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবরূপ বাক্‌কণিকা দ্বারাই অন্তরে বাহিরে আমরা জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে থাকি। এই বিরাট স্থূল জগৎ বৈখরী বাক্ বা শব্দ অবলম্বন করে আছে। তাই 'বৈখরী বিশ্ববিগ্রহা'।

'মধ্যমা' শব্দ বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত। কোন বিষয় বুঝতে গেলে শব্দ ও তার অর্থ বুঝতে হয়। মনের এখানে দু' রকম বৃত্তির কাজ, গ্রাহক এবং গ্রাহ্য, দুইই সূক্ষ্মশরীরের কাজ। 'মধ্যমা' অবস্থা হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধীয় অবস্থা, স্থূল বিষয়ের মানসিক ধারণা। এই 'বাকের' মধ্যে অপ্রকাশিত চিত্তের সন্ধান পাওয়া যায়। বৈখরীর প্রকাশ কণ্ঠে এবং দৃষ্টি মূলাধারের দিকে। এই দৃষ্টিকে নিয়ে স্থূলাশক্তিশূন্য শুদ্ধচিত্তকে সহস্রধারে প্রকৃতি পুরুষের আবাস অব্যক্ত কারণ-ভূমির দিকে প্রসারিত করতে হয়। মধ্যমার মাতৃকাবর্ণগুলি চিৎকিরণরশ্মি মালাময়। 'মধ্যমা' হল 'পশ্যন্তী' ও 'বৈখরী' বাকের সংযোগ সেতুস্বরূপ।

'পশ্যন্তী' বাক দিব্য বা দৈবত ভূমি থেকে আগত। এই বাক্ চৈতন্যের আধাররূপ বিশ্বকার্যে নিরত দেবতাবর্গের প্রকাশক। তাই একে দিব্যবাক্‌ও বলা হয়ে থাকে।

'পরা' বাক্—পরা অবস্থা। স্পন্দনহীন কারণ শব্দ।

প্রত্যেকটা বর্ণ এক একটি মন্ত্র। মন্ত্র হচ্ছে ধ্বনির আকাবে শক্তি বিশেষ শব্দব্রহ্মণের প্রকাশময় অবস্থা। মন্ত্র জপ করলে দেবতার উপস্থিতি প্রার্থনা করা হয়। ঠোঁট ছুটি হচ্ছে শিব এবং শক্তি, ঠোঁট নাড়াচাড়া হচ্ছে শিবশক্তির মিথুন। এখান থেকে যে শব্দ হচ্ছে তা বীজ বা বিন্দুস্বরূপ। তাই মন্ত্র জপে' যে দেবতার সৃষ্টি হল তা সাধকের পুত্রস্বরূপ। মূল দেবতা বা পরমেশ্বর কিন্তু নিষ্ক্রিয়। সাধকেব জপের দ্বারা যে দেবতার সৃষ্টি হল তা মূল দেবতার কিছুটা অংশ মাত্র। একে বাল-দেবতাও বলা যায়। সাধকের ক্ষমতা অনুযায়ী দেবতার ক্ষমতা নির্ভর করে। চিন্তা ও ইচ্ছা-শক্তিকে কতখানি কেন্দ্রীভূত করে' শক্তি সমন্বিত করা, সেইটে হল সার কথা।

লয় অবস্থায় তত্ত্বের কোন প্রকাশ থাকে না। আকাশের ধারণা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ শব্দ আছে। নিঃশব্দ হচ্ছে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা।

শব্দব্রহ্ম হচ্ছে জীবদেহে চৈতন্য। কুণ্ডলিনীরূপে জীবদেহে অবস্থিত অব্যক্ত পরাশব্দ। মহাকাল ও মহাকালের বিপরীত রতির ফলে 'বিন্দু' উৎপন্ন হয়। ঐ 'বিন্দু' বা বীজ প্রকৃতিব গর্ভাধানে পরিপক্ক হয়ে 'কুণ্ডলী' সৃষ্টি হয অক্ষরের রূপে। মহামাতৃকা সুন্দরী কুণ্ডলীর ৫০টি পাকই হল ৫০টি মাতৃকা, ৫০টি অক্ষব। প্রত্যেকটি অক্ষব এক একটি দেবতার শরীর। সংস্কৃত বর্ণমালায় যেমন ৫০টি বর্ণ, ষট্‌চক্রের পদ্ম পাপড়ির মোট সংখ্যাও ৫০, নাড়ীর অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন চক্রের পদ্ম পাপড়ির সংখ্যা স্থিরীকৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি পাপড়িতে এক একটি বর্ণ আছে, সংস্কৃত বর্ণ ল, ক্ষ বাদ, প্রত্যেকটি বর্ণের স্বতন্ত্র রং আছে। কুলকুণ্ডলিনী মূলাধাব চক্রে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ বেষ্টন করে আছেন। এক পাকে কুণ্ডলী বিন্দুস্বরূপ। ছুই পাকে প্রকৃতি পুরুষ, তিন পাকে ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া এই ত্রিশক্তি এবং সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণ। সাড়ে তিন পাকে কুণ্ডলী বিকৃতিযুক্ত হয়ে সৃজনরতা। শক্তি যখন প্রথম ঈক্ষণ করেন তখন তিনি পরমা কলা অম্বিকারূপা মাতৃশক্তি। ঐ অবস্থায়ই পরা-বাক্ এবং পরমা শান্তা। তিনি ঈক্ষণ করলেন পশ্যন্তি থেকে বৈখরী পর্যন্ত ব্যক্ত শব্দ। রূপ বা আকৃতি এবং রং এই তিনের সামঞ্জস্য আছে। ধ্বনি বা শব্দ রূপ গঠন করে। রূপ রং এর সঙ্গে যুক্তভাবে অবস্থিত। কুণ্ডলী পরাশক্তির রূপ, তিনি

সমস্ত প্রাণী ধারণ করে আছেন। তিনিই যাবতীয় ধ্বনি, শক্তি, ধারণা ইত্যাদির আধার .

কূজন্তী কুলকুণ্ডলিনী চ মধুরং মত্তালি-মালা-স্ফুটং,
বাচঃ কোমল-কাব্যবন্ধ-রচনাভেদাতিভেদক্রমৈঃ।
শ্বাসোচ্ছ্বাসবিবর্ত্তনেন জগতাং জীবো যথা ধার্য্যতে,
সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দামদীপ্তাবলী ॥
তন্মধ্যে পরমা কলাতিকুশলা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাপরা,
নিত্যানন্দপরম্পরাতি চপলা মালালসদ্দীধিতিঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহমেব সকলং সম্ভাসয়া ভাসতে,
সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যপ্রবোধোদয়া।

ষট্‌চক্রনিরূপণম্ নামক গ্রন্থে কুণ্ডলিনীর উপরোক্ত বর্ণনা আছে। কুলকুণ্ডলিনীর দ্বিবিধ স্বরূপ স্থূলমূর্তি, সগুণা ভ্রমদ্‌ভ্রমরঝঙ্কারবৎ অস্ফুট পঞ্চাশদ্বর্ণনিনাদিনী এবং ইনিই শ্বাসোচ্ছ্বাস বিবর্তন দ্বারা জীবের জীবন রক্ষণ করেন। দ্বিতীয় স্বরূপে, স্থূলরূপের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী পরমজ্ঞানপ্রদা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা, নিত্যসুখস্বরূপিণী, বিদ্যুন্মালাবৎ দেদীপ্যমানা পরম শ্রেষ্ঠ কলা (ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি) রূপে বিরাজিতা। তাঁর প্রদীপ্ত তেজে ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহ সমুদ্‌ভাসিত। তিনিই নিত্যজ্ঞানের উদয়স্বরূপিণী পরমেশ্বরীরূপে জয়যুক্তা।

মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অমিয় চক্রবর্তী : গাড়ির দরোজায়

তোমারো এ শেষ নয় যদি দৃষ্টিশেষে
কেউ না দাঁড়ায় কাছে, রুমাল ওড়ায়
হাল্কা হাসিতে গেঁথে, ফুলের তোড়ায়
দ্রুত দেয় বিস্মরণ, স্তব্ধ নিমেষে
ট্রেন চ'লে যায় দূরে আকাশে মাটিতে
দেবোত্তর গ্রামান্তরে বাজে এক ওঁ—
তোমার নতুন দিন জাগে চারিভিতে
চষা খেতে, কুঠি ঘরে, বনের নিভৃতে
শাদা টগরের পাড, শাক-সব্‌জি কল্‌মি পালঙ্‌,
পুকুরেব ধাবে ধারে, ঐ কাছে সাঁকো-পারে
কম্‌লা-হল্‌দে পাযে হাঁটে ছুটো বুনো হাঁস,—
হয়তো এই মতো যাবে আবো বারো মাস
অন্তর শাস্তি নিয়ে,
জাগে দূর্বা ঘাস
শ্যামল ডোবানো চোখে, এক জীবনেই
একান্ত আপন যারা তারা কাছে নেই,
যে-ট্রেন গিযেছে চ'লে তারি শূন্য ভবা
দেখ আজ ভ'বে আছে প্রাণের পসরা।
বিশ্বদিনে চলি যাত্রী, যা-কিছু হারাই—
সংসাবেব পারে তবু দুজনে দাঁড়াই ॥

অলুবানি
আগষ্ট, ১৯৭৭

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সেই পক্ককেশ নির্বোধ বালক

সেই পক্ককেশ নির্বোধ বালক
সারা জীবন
গাধাকে সিংহ আর সিংহকে গাধা হতে দেখে
শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌচেছে
মানুষের বেঁচেবর্তে থাকার পৃথিবীতে
গাধা অথবা সিংহ
একজনও আদর্শ নয়।

সে আরও জেনেছে
গাধা আর সিংহ ছাড়াও তার চতুষ্কোণ পৃথিবীতে
নানা বিচিত্র জন্তুজানোয়ার আছে
বিশেষ ক রে শৃগালের চতুরতা আর কুকুরের মহৎ অমায়িক ব্যবহারে
সে মাঝেমধ্যেই অভিভূত এবং মুগ্ধ হয়।
কিন্তু যেহেতু তার জীবনের তিনকাল কেটে গেছে
এবং একদিন শেয়ালকে দেখেছে কুকুরেব খাদ্য হতে
আর কুকুরকে চোরের চাবুকে দু আধখানা হয়ে যেতে,
সে আজ তাদের দূর থেকেই নমস্কার জানায়।

আজকাল
তার জীবনের ওপর মৃত্যুব অন্ধকার ছায়া ঘনিয়ে আসছে,
সে
মানবসমাজে শেষবার
তার বাল্যশিক্ষার আদর্শ উপমানকে আবিষ্কার করার তাড়নায়
অন্নজল ত্যাগ ক'বে
দুচোখের পাতা এক ক'রে
দারুণ ধ্যানস্থ হবার সংকল্প নিয়েছে।

কিন্তু, যেহেতু সে নির্বোধ বালক
এবং কোনোদিনই অঙ্কের পরীক্ষায় তার পাশ নম্বর জোটে নি,
তার ধ্যান বারবার ভঙ্গ হয়েছে
ইচ্ছেশক্তির সমস্ত শাসন ও পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে
সে আড়চোখে দেখেছে,
আর, যতবার চোখ খুলেছে, ততবারই দেখেছে—
ডাস্টার হাতে তার দিকে ছুটে আসছে,
তাকে কান ধ'রে নীলডাউন হতে বলছে
মনুষ্যরূপী সিংহ
গাধা
শেয়াল
আব কুকুরেরা।

তারা তাকে আরও জ্ঞান দিচ্ছে
মন্ত্রীর বদল হয়
পার্লামেণ্ট অথবা এ্যাসেম্ব্রীতে কুলীন ও আধাকুলীন অভিনেতাদের
রংবেরং এব পোষাক এবং প্রসাধনের পরিবর্তন ঘটে,
কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতার কোনও পরিবর্তন হয় না।
জন্ম থেকে তার চারদিকে
যে নরক
তাকে নির্বোধ, বোবা বেঞ্চের ওপর একপায়ে দাঁড়ানো
একটি মানুষের জড়পিণ্ডে পরিণত করেছে
আর, তাকে বাধ্য করেছে
তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক এবং চতুর্থশ্রেণীর নেতাদের
ভাষণ শুনতে,
ঐ নরক তার মৃত্যু পর্যন্ত শাশ্বত সত্য—
যার কোনো বিকল্প নেই।

[৫ জুলাই, ১৯৭৭

রাম বসু : ভাবনা

বিষাদের কালো ভিজে মাটিতে, অবাক
ফুলগুলি ফুটেছে সহসা
সুগন্ধির জটিলতা কুঞ্জ হল হৃদয়ের ধারে
তৃষ্ণার ভৃঙ্গার আমি পেতে রাখি নিচে।
কিছুক্ষণ আগেও ভাঙা চিত্রকল্প ছিল
শিকড়ের ধারে ছিল সাপ , গিরগিটি
খোপে খোপে ভয় আর বিচিত্র সংশয়
পথের নিচের মাটি ক্ষয়ে গিয়ে ক্রমে ক্রমে ফাঁকা
দিকচিহ্ন লুপ্ত করে ছিল এক অন্ধকার ঝাড়
তার গ্রাস থেকে বুঝি কারো আর পরিত্রাণ নেই।

জলের চেয়েও মৃদু আর কিছু নেই
কিছু নেই হৃদয়ের চেয়েও কোমল
অথচ অবাক, ত্মাখো, তারা সব নীচে থাকে, স্থির
আপন স্বভাবে কিন্তু পূর্ণ করে যতটুকু যার প্রয়োজন :

যে ভয় আমরা গড়ি তার মূলে আছে ভয় , ভয়
ভিতরে যাবার, কেন্দ্রে, কোরকের ঠিক মাঝখানে
বিন্দুর পাহাড়ে, যার চার পাশে কেবল স্তব্ধতা।
অবশ্য সেখানে আমি কখনো যাই নি
এ সব লোকের মুখে শোনা কথা, কিছুটা পড়াও
কিন্তু যা বুঝেছি এতদিনে তার সার কথা :
চক্রাকারে ঘুরেছি কেবল, ঘুরেই চলেছি
নিজেই নিজের চারপাশে।
তার জ্ঞান নেই, অনুভব নেই
খোয়া বন্ধ করে নিজেকে দিয়েছি ছেড়ে জলের ভিতরে

ছেড়ে দেওয়া চাই, সব অঙ্গ শিরা উপশিরা, সব
গানের আসরে যেন পাতা তানপুরা, সার সাব
প্রতিধ্বনি সুসঙ্গত তবে হবে স্বরের শাসনে।

যা কঠিন তাই দিয়ে অস্ত্র তৈরি হয়
যত শক্ত করবে মুঠো তত শূন্য মুঠোর ভেতব
যা সহজ তার আলো দাহহীন উজ্জ্বলতা, আব
স্বভাবের স্বাভাবিক ক্রিয়া ভূমি সে-ই।

বুঝি বা না বুঝি ক্ষতি নেই
মানুষেব ইতিহাস সেই দিকে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে
আবার উদ্ধার করে নিতে হবে আমাদের সেই
স্ব-ভাবের স্বাভাবিক ক্রিযাভূমি, তাই
ভাঙা ভাঙা চিত্রকল্প পাখি হল সূর্যেব ভিতব।

লোকনাথ ভট্টাচার্য : নিশ্বাস অদ্বিতীয় বাঁশির ফুঁ

প্রথমে ধারণা ছিল—বা জানি না, বলতে পারব না—সবসুদ্ধ কতগুলো সিঁড়ি, অন্তত আন্দাজ, চূড়ার ঘরটা আনুমানিক কত উচ্চতে য়, সেই যেদিন হঠাৎ কোন্ রোখ চাপে, গোধূলির গোলাপি আলোয় স্নান করতে-করতে এসে দাঁড়াই সর্বনিম্ন ধাপের সামনে, ধুলো ও পাঁক টপকে, পাশে রেখে তখনো কাকলী-মুখরিত অরণ্য, বিরাট-বিরাট ছায়া মহীরুহের, ময়ূরের শেষ কিছু নাচে সূর্য-প্রণাম, এবং মাথায় ও ঘাড়ে জ্যামিতির প্রায় সমকোণ হয়ে তাকাই সোজা উঠে-যাওয়া খাড়াই-এর দিকে, হয়তো গুণতেও সুরু করি সিঁড়ি এক-দুই-তিন-চার-বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ।

তারপর সে-গোধূলি তো গেছেই, গোধূলিব পরে রাত্রিও, সে-রাত্রির পরে দিন, সে-দিনের পরে রাত্রির পরে দিনের পরে রাত্রি। সময়ের আর হুঁশ নেই,

বরং যত উঠি, মনে হয় সিঁড়িও তত বেড়ে যায় সংখ্যায়, যা খুব-সম্ভব ভ্রমই অথবা ভ্রম নয়, অথবা ভ্রম হলেও যাচাই করতে বসার ফুরসৎ নেই। তবু বারে-বারেই ভাবুক হয়েছি, কল্পনায় আবেশ এসেছে, চোখকে সজীব করতে তাকিয়েছি দূরের সবুজের দিকে—যদিও ক্ষণেকই মাত্র, যেহেতু মইয়ের চেতনা ফিরেছে কি শিরায় আগুন লেগেছে, অমনি আবার হাঁটুর মাংসপেশীতে টান, পা বাড়ানো।

প্রায়ই, নিজেকে আশ্বাস দিতে তলার দিকেও তাকিয়েছি, গুণতে কতটা উঠলাম, শেষে কখনো-কখনো উপরটা মন থেকে মুছে গেছে, যখন ভেবেছি এই যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেইটেই শিখর, আমি যেন আকাশেরই অঙ্গ, অন্ধ করেছে তখন নিজের অর্জনের জ্ঞানটাই, তজ্জনিত আত্মপ্রসাদটাই, শেষে হয়তো এক আধবার মুখ ফিরিয়েছি উল্টো দিকেই, ঐ যেখানে একটার-পর-একটা নেমে গেছে ধাপ, যারা ক্রীতদাসের মতো অধোবদন বা রজ্জু বেঁধে টেনে-আনা পরাজিত সৈনিক, ও তা দেখে এতই গদগদ যে ভুলে গেছি পিছু হেঁটে খাড়াই ভাঙা কী-আশ্চর্য কসরত, এবং তখন সে-পিছুটাও আমি হেঁটেছি, যে কসরতটাও করেছি।

এসবই আগের কথা, কারণ আজ ক্রমশই উপর নেই তলা নেই অরণ্য নেই, শুধু রয়েছি যে-সিঁড়িটায় সেটাই আছে, বরং সিঁড়িটাও নয়, তার দেয়াল বা মেঝেও নয়, শুধু তার যে-বিন্দুটায় আঁকড়ে রয়েছে পা সেইটাই আছে, আর আছে পরের পদক্ষেপের ঠিক উপরের বিন্দুটি—এমন কি ক্রমশই একমাত্র সেই দ্বিতীয় বিন্দুটিই আছে যেটায় পা পড়তে চলেছে, আর আছে চেতনা ওঠার, এমন-কি এই শ্রম ও ঐ অর্জন ধীরে-ধীরে অর্ধনারীশ্বর, এক মিশে গেছে অন্তে, ডমরু আলাদা করা দুষ্কর ডম্বরুর ধ্বনি হতে। আগে মানুষ ছিলাম, এখন হয়তো অমানুষ, হয়তো পিপীলিকাই কি কে জানে কোন্ বিচিত্র সরীসৃপ বা সম্ভবত সার্কাসেরই ভাঁড়, তাই কখনো উঠছি গড়িয়ে-গড়িয়ে, কখনো ডিগ্‌বাজী খেতে-খেতে, কখনো হয়তো ডানপিটের মতো সোজাসুজি পা ফেলেও—আসলে উঠছি কী করে, তার জ্ঞান নিজেকে নিঃশেষে হারিয়েছে ওঠারই প্রচেষ্টায়।

মিথ্যা হবে বলা ক্লান্তি নেই বা তাকাতে একেবারেই সাধ যায় না আর অরণ্যের দিকে অথবা দেখতে এখন গোধূলি কিনা, বা গোধূলি হলে প্রথম দিন যে-ময়ূরটা নেচেছিল আজ সে নাচ ভুলে এদিকে তাকিয়ে আছে কিনা। তবু প্রশ্রয় দিযেছি কি হয়েছি সাধারণ এবং যে সাধারণ আমি কিছুতে হচ্ছি না আজ, কখনো হব না আর, অন্তত বিন্দুর পর এখনো অনেক বিন্দু ধরে সিঁড়ির পর সিঁড়িতে, কারণ লোভ জাগলেই হলাম সাধারণ, ভয় মানেও সাধারণ, সাধ মানে সাধারণ, স্বপ্ন মানে সাধারণ—এরা সব আজ আবছা স্মৃতিতে কুয়াশার মতো কৈশোরের কত না ধুলো মাখা সঙ্গী, যাদের নিযে শুধু ডাংগুলি খেলাই চলে, যা খেলেছি মাঠে একদিন—যে-হাওয়াকে বিদায় দিযেছি, তাতে ভেসে গেছে তাদের নাম।

খুব সাবধান তাই অতিরঞ্জন কোথাও হচ্ছে কিনা কোনো অনাবশ্যক রঙ কোনোখানে, এমন কি শত হস্তের দূরত্ব চাই যে কোনো রঙ হতেই, কারণ এ সবই পিছলে দেওয়ার হড়হড়ে তেল, যখন সারা শরীর আমার ন্যাংটো সংকল্প বই নয়, নিশ্বাস একটি অদ্বিতীয় বাঁশিবই ফুঁ, যখন ঘরেব কল্পনা তো নযই ঘবটাও আর বড় নয়।

আলোক সরকার : বিকেল

তার হাত ভুরুর উপব, তার চোখ
ছোট হয়ে এসেছে—আব একটা ভ্রমর
উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে দূরে।

তার চোখ আরো ছোট, দুটো ভুরুই
কুঁচকে এক হয়েছে মাঝখানে , কালো ভ্রমর
ঘুরলো এক চক্কর খামখেযাল।

আর তারপর দ্রুত কতো দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে
ছুটতে গেলে মচকে যায় পা, বুক
ধড়পড় করে। ছোট্ট আলপিনের মতো চোখ।

ঐ ঐ উড়ে যাচ্ছে ঐ দেখা যাচ্ছে না আর।
ভুরুর উপর কঠিন আর অসহায় একটা প্রয়াস।
স্থবির আর নিরপেক্ষ এই বিকেল

মুছে যাচ্ছে, অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে ক্রমশ।
নিরপেক্ষ দুটো চোখ নিরপেক্ষ দুটো হাত
কালো গলির পথে হারিয়ে যাচ্ছে, অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে অসংযোগ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : পুরুষসূক্ত

চরিত্র শরীর লভে একা-একা, আমি চেয়ে দেখি,
তাঁবু থেকে মাঝরাত্রে ছিট্‌কে চলে যায়
ঈশ্বরের অভিমুখে, অক্ষমেরা অক্লেশে রটায়
'ঈশ্বরীর কাছে গিছে'—ঈশ্বরী মেয়েমানুষ তাই
সকলের গা জ্বালা করে কি ?

শত্রুরের সারা মুখে ছাই
দিতে থাকে সারারাত চরিত্রের পুরনো খুড়িমা,
চাঁদের পিলসুজ ফাটে, আবিষ্ট পূর্ণিমা
ক্লিষ্ট হয় যার-পর-নাই
'আবাগীরা মর্' বলে রাগান্ধ খুড়িমা
উদ্যত খাড়াই। আর এরইমধ্যে সীমা পরিসীমা

পার হয়ে চরিত্র দাঁড়িয়ে পড়ে, বিশ্বচরাচরে
আমি চরিত্রের মত চরিত্র দেখি নি, শ্রদ্ধাভরে
পা থেকে মৃত্যুর চেয়ে ভারি বোঝা খুলে নিয়ে শেষে
ঈশ্বরীর দল তার নগ্ন পায়ে আদিখ্যেতা করে।

আনন্দ বাগচী : খেলা

মোমের আলোর নিচে সারারাত আমি আর আমার কলম
নশ্বর ছায়ার মধ্যে ঠাঁই বদলের খেলা খেলি,
নিকট নিশ্বাস এসে বুকে লাগে চোখ বাঁধা বিষণ্ণ রুমালে

নিরন্তর এ খেলায় বেলা যায়, কলস ডোবে না
চোখের সামান্য জলে, আকাশ উপুর হয়ে থাকে
শব্দহীন প্রতিপক্ষ চেয়ে আছে সব পথ ঘুরে আসবে বলে
ফাটা আয়নার মধ্যে রক্তাক্ত রোদ্দুর বিঁধে যায়
এ খেলায় হেরে যাচ্ছি, হাতের লুকানো তাস টেনে
ছুঁড়ে দিচ্ছি, সব ছবি লোকচক্ষে প্রকাশ্য রাস্তায়
উদাসীন জনস্রোত কিছুই দেখে না শুধু দ্রুত ব্যস্ত পা য় ঘরে ফেরে

শিল্প ও কলার খোসা পড়ে থাকে উদাসীন জুতোর তলায়।

স্নেহাকর ভট্টাচার্য : আদেশ হলেই

আদেশ হলেই অন্ধ মালিকের হাতে নিজে তুলে দিই পুরনো চাবুক
আমার শরীরে নিয়মিত
অকারণ চাবুক না চালালে তার প্রভুত্বের প্রমাণ থাকে না!
আমারও জীবনে হয়তো তীক্ষ্ণ সেই স্পর্শ ছাড়া কোনো
ব্যথা ও ঘটনা নেই। অতশত বুঝি নি কখনো।
মাংস-মেদ-রক্তমাখা চাবুক যখন
মালিকের হাত থেকে খসে যায়, দুজনই অবশ
শরীরে হেলান দিয়ে জড়ের মতোন পড়ে থাকি। আমাদের
সময় কুয়াশা হয়ে গেছে, তবে ঘোর কেটে গেলে
রুটিনমাফিক আমি আদেশ হলেই ··

শান্তিকুমার ঘোষ : মুহূর্তের জন্য

পড়ন্ত আলোয়
বৃষ্টি আর উড়ো মেঘের ফাঁকে
জেগে উঠলো অভ্রর সৌধ
সম্রাটের নয়—আমাদের মুগ্ধ চোখে।
মুহূর্তের জন্য তুমি সুখী বোধ করলে
তোমার কয়েকটা রঙিন ভাবনাকে
রূপ দিতে পেরেছ ব'লে।
পরক্ষণে অন্ধকার ছুটে এল নিয়তির মতো-
নক্ষত্র খ'সে পড়ে গম্বুজ শিখরে,
প্রাবৃট নিশীথে শুনি বজ্রপাখির বেদনা।

নৃপেন্দ্র সান্যাল : জয়ন্তীর জন্য

একটু আলো আর কিছুটা ছায়া
মনে হল, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তোমাকে এইবার পাওয়া যাবে।

অনেক কমলা রোদ, অনেকখানি আলো
দিনের রঙ এমনই জমকালো—
তখন তুমি শিরিষ চূড়ে উধাও হয়ে যাও।

কোথাও আকাশ নেই, সীমানা নেই। সহসা তবু
ছায়া দিয়ে তৈরি কর ঘর।

তাৎক্ষণিক নীরব অবসব।

স্বদেশরঞ্জন দত্ত : দেশবন্ধুদের শ্রদ্ধাসহ

ঘরে যখন বাতাস তখন ঘুঙুর বাসে
চরণ সন্ধানে দশ অ.ঙুল কাঁপে
বাতাস যদি থমকে, এ ঘর নির্বান্ধব।
ভয় ছড়িয়ে পয়সা তোলে ছেঁদাব মাপে

কোটো আমি ফাঁসিয়ে দিতে পাবি, সেটা
বিশ্রী হয়ে লোকেব মাঝে, (গণ্যমান্য),
নাকের থেকে চশমা, ভ্রুব শীর্ণ ও ভাঁজ
সরিয়ে দিতে পারি, তবে সেটা কি কাজ ?

ঘরে যখন সোফা তখন বন্ধু আসে
ওরা শুধু সুদ নিয়ে যায—আসল যে কি
সারাজীবন দেশোদ্ধারের তহবিলের বাক্স হাতে
বন্যা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রেডক্রশের
সারাজীবন কেমন তেজী পুরুষ ওরা

দেশ যে কখন কোথায় ভৌগোলিক রেখায়
দেশ বোঝালেন দেশবন্ধু নায়করা সব
ঘর বোঝাবে কে যে কবে, ঘরে
কয়টি দুঃখী ইঁদুর পোকা মাকড়, তবু।
হঠাৎ যখন দেয়াল জুড়ে ঘুঙুর বাজে
চরণ সন্ধানে দশ আঙুল কাঁপে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত : বৃষ্টির পরে

জল পড়ে আছে
বৃষ্টি ভেজা পথে পথে প্রকাণ্ড আষাঢ়
টুকরো টুকরো আকাশও রয়েছে।
এইতো সময়
ভাত খাওয়া হাত ধুয়ে ঐ প্রতিবিম্বের ওপরে
ঝুকে পড়ে
নিবিড় পরীক্ষা করা আকাশের স্বাস্থ্য ও কুশল
এই একভাগ স্থল পৃথিবীতে
একমাত্র জলই তো সফল,
তাই মানুষের চোখে অস্ত্রে, মৌলিক আত্মায়
ভরে থাকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের জল।

তবু কেউ গহন গ্রন্থের পাশে
স্থির বসে থাকে, কেউ উঠে যায়
দূরে উপবনে, গম্ভীর বাতাস ভরা পার্বত্য উদ্ধারে
ওখানেই ধ্যান হবে, এতকাল যেমন হয়েছে নীলাকাশে

পৃথিবীর পথে পথে জল পড়ে আছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদার

অমিয়ভূষণ বোধ হয় সেই রকম লোক, যাঁর রচনায় ঘরে ঘরে পাঠ্য হ'বার মত যেমন উপকবণ নেই, তেমনি যে-উপকরণ তিনি প্রযোগ করতে চান তা অস্বীকার করার মত ব্যবস্থা নেই। উপকবণ বলতে আমি তাই ধারণা করছি, যার ভিতব আবেগ ও যৌন প্রয়োগ মুক্ত হোযে একটি প্রলোভন তৈরী করে। এইসব ব্যবস্থা তিনি সেই ভাবেই ব্যবহার কবেন, যা কেবল যৌন সংস্থাপনের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন। অতি সাধাবণ ভাবে বল্লে বলা যায় তা কথকতার মেজাজ, সামান্য যে মেজাজের ভিতর নির্বিকারের ভাব যেমন আছে তেমনি আছে সামান্য কৌতুক-মিশ্রিত কিছুটা আনন্দ। আরও সহজ ভাবে বল্লে বলা যায়, কথকতাব, যা প্রমথ চৌধুবী আরম্ভ করেছিলেন. পার্থক্য প্রমথ চৌধুরীর মেজাজ ছিলো ফরাসীয় রীতিপ্রকরণে, আর অমিয়ভূষণ লণ্ডনীয়। এই আলোচনায় খুলে বলার সুযোগ নেই, সেজন্যে আমি শুধু চুম্বকটুকুই রক্ষা কবতে চেষ্টা করবো।

চল্লিশের দশকের শেষদিকে তিনি লেখা আবম্ভ করেছিলেন। স্মৃতিতে যতটুকু আছে, 'মধুছন্দাব কযেকদিন'ই বোধ হয় তার প্রথম গল্প যা 'পূর্বাশা'য় বেরিয়েছিলো এবং এই গল্পে ছিলো সেইরকম গল্প যা চমক সৃষ্টি করে' এই প্রশ্ন তৈরী করেছিলো, এই লোক কে? যুদ্ধ শেষ হোয়েছিল, যে ওয়াক-আই শ্রেণীকে তখন পথে-ঘাটে চলতে দেখেছি, বাইরে থেকে ধারণা কবে যার একটি বিসদৃশ আলেখ্য ছিলো, যে বিসদৃশ-রূপের একটি অন্তরক্ষেত্রও যে ছিলো তারই কথা ছিলো এই গল্পে। তাব পবের গল্প ঐ পূর্বাশায় প্রকাশিত হোয়েছিলো 'সুনন্দার সংসার'। পুরোপুরি ভিন্ন, সাদামাঠা, শরৎচন্দ্র-ধর্মীয়। কিন্তু পররর্তী গল্প 'তাঁতী বৌ'—যেই গল্পও 'পূর্বাশা'য ছিলো, তার আন্তরচরিত্রে না-ছিলো 'মধুছন্দার কযেকদিন' না 'সুনন্দার সংসার'এ-গ্রাম্য প্রকৃতি নিয়ে নতুন ধবণের সংবাদ, যে সংবাদের ভিতর গ্রামের বিকারের দিকটাই ছিলো না, অতি

প্রচ্ছন্নরূপে আকারের দিকটাও রক্ষা করেছিলেন। তাঁর দুই উপন্যাস 'নীল ভুঁইয়া' (পরবর্তী সংস্করণে এই বই এর নাম কেন 'নয়নতারা' রাখলেন তা আমি বুঝি নি, কারণ নয়নতারা এই বই-এ পার্শ্বচরিত্র ছাড়া অন্য কিছু না) এবং 'গড়-শ্রীখণ্ড'-ঐ দুই গল্পের ক্রমবিকাশ লাভ করে' একটি বিশেষ আলেখ্য হয়েছে।

অমিয়ভূষণের লেখা পড়তে গিয়ে আমার একটি কথা মনে হয়েছে, ড্যানিয়েল ডিফো কি তাঁর অতি প্রিয় লেখক? ডিফো সম্বন্ধে আলোচনায় বলা হয় প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি অভিজ্ঞ—যার জন্য এক কথায় বলা হয়েছে 'experiencing nature'—অমিয়ভূষণ প্রায় সেইভাবে না গেলেও তাঁর বিশেষ বইতে 'নীল ভুঁইয়া'-র এবং পরবর্তী উপন্যাস—'ফ্রাইডে আইল্যাণ্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ' এখনও কোন বই আকারে প্রকাশিত হয় নি, এই উপন্যাসে এই ডিফোর নাম বারবার স্মরণ করা হয়েছে, এবং আখ্যায়িকাটি যেভাবে রক্ষা করা হয়েছে তা 'রবিনসন ক্রুশো'র নাম স্মরণ করায়।

এটাও মনে রাখা দরকার, এই ভাবে কোন লেখককে নির্দিষ্ট করা যায় না, লেখা নামক কর্মকেন্দ্রের ভিতরে কোন্ লেখা ক্রিয়া করতে পারে—তার মানে তাই নয়, সেই লেখকই তাঁর মনে সমস্তজীবন ক্রিয়া করেছে। যেমন ডিফো না, এই লেখকের সঙ্গে হার্ডির নামও স্মরণ করা যায় না। যেমন হার্ডি সম্বন্ধে বলা হয়—'The most impressive character in his novels is not person, but a place'—অমিয়ভূষণের-ও 'নীল ভুঁইয়া' ও 'গড় শ্রীখণ্ড'-ও বিভিন্ন চরিত্র ব্যাপক আকারে থাকলেও এমনভাবে দুই সময়ের বাংলাদেশকে তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে, এ সব ব্যক্তি না—একটি বিশেষ কালই চরিত্র রূপে বর্ণিত। এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প 'অ্যাভলনের সরাই'—এক জায়গায় উল্লেখ দেখলুম ছোট উপন্যাস বলে—সেইরকম সৃষ্ট, যেখানে চরিত্র শুধু এই জন্যেই আছে 'সংগ্রাম' নামক বিশেষ চরিত্রকে রক্ষা করবার জন্যে, সেজন্যে 'এ্যাভলনের সরাই' এখানে একটি বিশেষ রূপক—অন্ততঃ আমার তাই মনে হোয়েছে।

সেইজন্যই বলেছিলাম, কোন মানসিক কারণে একটি লেখকের কোন কর্ম অন্য লেখকের মানে ক্রিয়া করতে পারে, তার মান তাই না সেই লেখকের দ্বারা পুরোপুরি আক্রান্ত, তাহলে সেক্সপীয়র থেকে জয়েস-পর্যন্ত বহু লেখকই এই দোষে দুষ্ট বলে ভাবা যেতে পারে। যেমন অমিয়ভূষণের সাথে প্রমথ চৌধুরীর

সহমিলনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বক্তব্য স্থাপনের ব্যাপারে দু'জনের মানসশৈলী পুরোপুরি ভিন্ন, শুধু মিল একদিকে—দু'জনেই বর্ণনার ব্যাপারে পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক, এবং বাংলা সাহিত্যে নৈর্ব্যক্তিক মানসিকতার প্রথম পুরোহিত বোধহয় প্রমথ চৌধুরী।

তবু একটি প্রশ্ন ওঠে, যে-প্রশ্ন ইংরেজী সাহিত্যেও এসেছে। যে-ফ্যান্সি শব্দ নিয়ে ড্রাইডেন থেকে এলিয়ট পর্যন্ত বহু শব্দ ব্যয় হয়েছে সেই 'ফ্যান্সি' শব্দ সরে গিয়ে 'ফ্যান্টাসি' শব্দ প্রবেশ করছে বলে। ওঁদের বর্ণনা : 'The modern writer, frightened by techno'ogy and (in England) abandoned by philosophy and (in France) presented with simplified dramatic theories, attempts to console us with myths or stories. On the whole· · his imagination is fantasy ? বাংলা সাহিত্যে এই প্ররোচনা এসেছে কিনা, বর্তমান আলোচনা সেই অর্থে না-রেখে, অমিয়ভূষণের কাছে একটি প্রশ্ন করবো—তাঁর 'ফ্রাইডে আইল্যাণ্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ' উপন্যাসে সেই আঙ্গিকেই ব্যবহার করেছেন যা উনবিংশ শতকে আমাদের দেশের মিশনারীরা ব্যবহার করতেন, মনে হয় এটা ইচ্ছাকৃত কারণ? জয়েস তাঁর ইউলিসিস. গ্রন্থের ব্লুম ও মলি প্রসঙ্গ নিয়ে জিজ্ঞাসার উত্তরে এই মন্তব্য করেছিলেন—The book is meant "to make you laugh"—অমিয়ভূষণেরও উত্তর কী সেইরকম? যদিও জানি, জয়েস-এর ঐ মতের সাথে সমালোচকেরা একমত নন।

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রফুল্ল গুপ্ত

প্রফুল্ল গুপ্ত গল্প লিখেছেন ষাটের দশকেই বেশি, লিখেছেন আবার বেশির ভাগই একটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকাতে। আমরা যারা পাঠক হিসেবে আজ প্রবীণ হয়ে পড়েছি, সেই আমাদের কাছে তাঁর পরিচয় এমন এক সরস রম্যতার আস্বাদ যা আজকের গল্পে দুর্লভ। নবীন পাঠক যদি প্রফুল্ল গুপ্তকে না

চিনে থাকেন সে দোষ তাঁর নিজের বা গল্পকারের নয়। আমাদের সাহিত্যব্যবসায়ী পত্রিকাগুলো ও তাদের গোষ্ঠী-তোষণনীতিই সে অকালবিস্মৃতির জন্ম দায়ী।

অথচ একমাত্র একটি পত্রিকার পাতারই সেই ১৩৭২-র 'বমডিলা' থেকে একের পর এক অনেক চমক-লাগানো গল্প, 'তারা দুজন', 'মনের ছায়া', 'লেট কামার', 'স্লুইস' 'বাবার বিয়ের মাসে' গত দশকের পাঠক পড়েছেন, পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন। প্রফুল্লবাবু এই সত্তরের পাঠকের কাছে অথচ প্রায় অপরিচিত। বলতে গেলে ঠিক তখনই যখন সরস ব্যঙ্গ, তীক্ষ্ণ শাণিত দৃষ্টি আর লঘুটান ভাষার অভাবে গল্পকাহিনী প্রায়ই আত্মরতিবিলাপের মত অবসাদজনক হয়ে পড়ছে। একটি শক্তিধর লেখনীর এই অপস্মৃতির কারণ কি লেখক নিজেই, না অন্যত্র কোথাও রয়েছে? অনীহা না অসমাদর, অবসাদ না তোষণ-অপারগতা—এ জিজ্ঞাসা যে কোনও সৎ সচেতন পাঠকের মনেই উঠতে পারে। উত্তরের একটা দিক আমাদের জানা—অন্য অনেক স্ব-মতনিষ্ঠ আত্মমর্যাদাপরায়ণ লেখকেরই মত প্রফুল্ল গুপ্তও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন একটা তোষণলোভী সাহিত্য-সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার বিপক্ষে। ভেতরের অন্য দিকটা সাহিত্য-গোষ্ঠী বা পত্রিকা সম্পাদকদের দেয়—তবে সাহিত্যবিবেক বস্তুটি আজকের স্মার্টযুগে একটা বেতালা **anachronism** তো।

প্রফুল্ল গুপ্তর গল্পের প্রথম চরিত্রলক্ষণ তার সরসতা। একটা লঘু মৃদু শ্লেষার্দ্র ভঙ্গিতে তিনি কথা বলেন যার ফলে বড় বড় সিদ্ধান্তগুলোও তাঁর গল্পে তাদের ট্রাজিক নিষ্ঠুরতা অনেকটা ঝরিয়ে ফেলে আমাদের জীবনে এসে দাঁড়ায়। যেমন, 'বমডিলা'য় সতীনাথের লোধ্রার কানে কানে সেই স্পষ্ট উচ্চারণ: আমি তোমাকে ভালবাসি না। আবার, 'বমডিলা' থেকে 'স্লুইস' সবকটি গল্পেই দেখা গল্পকারের গল্পের কাঠামো সম্পর্কে একটা নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাস আছে, যার ফলে আঙ্গিক কৌলীন্যে তাঁর গল্প প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। একটি নিটোল অবয়ব, তার মধ্যেই ঘটনার শীর্ষবিন্দুগুলি স্পষ্ট চেহারায় দেখা দিয়ে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়েছে তার ইঙ্গিত অন্তিমে। কাহিনীর এই সুবলয়িত বিন্যাস পাঠককে দেয় এমন নান্দনিক তৃপ্তি যা ক্রমশই দুর্লভ্য হয়ে যাচ্ছে এ কালের গল্পে।

মনুষ্যচরিত্রের দুজ্ঞের্য় গভীরে প্রফুল্লবাবু প্রবেশ করতে চান না, শুধু

উঁকি দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দেন তাব নানা অসম্ভব অসঙ্গতির সম্ভার। তাঁর আগ্রহ বাইরের জাগ্রত জীবনের ওপর এ সবের প্রতিক্রিয়ায়। এক একজন লেখক থাকেন যাঁরা নিজস্বভাবেব প্রবণতাগুলি চিনে নিতে পারেন এবং সে দিকেই লেখনী চালনা করেন। প্রফুল্ল গুপ্ত সে জাতেরই লেখক। তাঁর গল্পের ভূগোল ছড়িয়ে আছে এগারো হাজাবী পাহাড়ী গিরিখাত পার হওয়া 'সেলা' থেকে অগাধ নীল সমুদ্র বেলায। বিচিত্র সব নবনারীব ভিড সে জগতে—কবরেজ পিসী—লীলাবতী-বউপাখি-লোধ্রা-পেমা-ডিংলু—ক্ষীরমোহন-পটলচাঁদ-ফচ্কে-উজ্জ্বলকুমার-রাজাগোপাল—সতীনাথ প্রমুখেরা। অল্প আঁচড়ে-আঁকা, ঘটনার মধ্য থেকে উঠে-আসা, আত্মরোমন্থনে নয়। তাই চেতন-অবচেতনের বিষমানুপাতিক টানের বিড়ম্বিত ভারসাম্যে তাঁর গল্প গল্পত্ব হারিয়ে ফেলে না। আসলে মন নয, মনস্কতাও নয, ঘটনা এবং তাঁর বিচিত্র অদ্ভুত সব ক্রিয়াকাণ্ডই প্রফুল্ল গুপ্তকে কলম ধরায়—তাব ভেতব থেকেই তিনি তুলে আনতে পারেন, নানা ছাঁচের মানুষ যাদেব মুখবেখায় ফুটে ওঠে চেতনার অন্তর্চাপ।

এই আবযবিক প্রযত্ন ছাড়াও প্রফুল্লবাবুর গল্পের মেজাজটি চমৎকার। একটা টানটান ভঙ্গিমায় লঘুকথনের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এক-একটা গোটা জীবনেব এদিক ওদিক। ভাষার নাটকীয়তা, সজীবতা ও সরসতা যে জিনিসটি দিতে পারে আজকের পাঠকেব তা অনাস্বাদিতই থাকছে। প্রফুল্ল গুপ্ত সচেতন স্টাইলে বিশ্বাসী, তবে স্টাইল-সর্বস্বতায় নয়। পরিণতিতে তাঁর গল্প নিয়ে আসে এমন একটা শ্লেষার্দ্র নাটকীযতা যা **ironic under-statement**-এর মত।

প্রফুল্ল গুপ্ত আবার লিখুন এই আমরা চাইবো। কারণ, পরিহাসপ্রবণ সরস মেজাজ জীবনের দিকে চোখ-ফেরানো আজকের গল্পে দুর্লভ হয়ে গেছে। অথচ নিজের দিকে চোখ-ফেরানোই জীবননিষ্ঠ সাহিত্যের একমাত্র বা শেষ কথা হতে পারে না কখনো।

প্রফুল্ল গুপ্ত-র একটি সংকলিত গল্পগ্রন্থও নেই, এটা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে শোচনীয় ঘটনা। সম্ভবত, গল্প-উপন্যাসের হালচাল ঘুরেফিরে বটতলার দিকেই মোড ঘুরছে, এবং সেকারণেই তাঁর মত সংযমী সৎ মজলিশী লেখককে 'সাহিত্যের বাজার' থেকে বিদায নিতে হচ্ছে।

প্রদ্যুম্ন মিত্র

কেতকী কুশারী ডাইসন : আশ্চর্য আপনি

আশ্চর্য আপনি।
বলছেন তারের আলো ছিলো না,
আকাশ ছিলো একটা দানবীয় ক্যারমবোর্ড,—
চাঁদটা স্ট্রাইকার,
আর তারাগুলো এদিক ওদিক ছিটকে যাওয়া
জলজ্বলে ঘুঁটি।

বলছেন বাটি-উল্টানো দুধের মত
জ্যোৎস্না আকাশময় গড়িয়ে পড়েছিলো,
আর জলের কিনারা ধরে সাঁতরে যেতে যেতে
চাঁদের ঐ ভ্রান্তিজনক আলোয়
একটা রূপালী ইলিশ দেখে ফেলেছিলেন।
জ্যোৎস্নায় চকচক করছিলো তার পিছল আঁশগুলো,
আর থেকে থেকে ঝাপট মারছিলো তেজী লেজটা।
সে দৃশ্যটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না।

বিশ্বাস করুন,
খাঁটি খবর দিচ্ছি,
সেজন্য উল্টে আমাকে দোষী করবেন না।

যারা ক্যারম খেলছিল
তারা সবকটা জলজ্বলে ঘুঁটি কুড়িয়ে নিয়েছে—
একটাও কাউকে বখশিশ দেয় নি,

দৈব বিড়ালশিশুরা আপনার বাটি-উল্‌টানো দুধ
চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছে—
এক চামচ বাকি রাখে নি'

আব মাঝরাতের জালর সে খেলুড়ে মাছ
শেষরাতের জলে শিকার হয়েছে,
জিত'ত পাবে নি।

প্রদীপ মুন্সী : যাওয়া

যাই
বুকেব গভীরে শব্দের ঢেউ
শব্দের ঢেউ
বুকের ভিতরে বুকের মতন
বুকের গভীরে বক্তের স্রোত
রক্তের স্রোত
বুকের ভিতবে জলের মতন
বুকের গভীরে গুহার আলো
গুহার আলো
বুকের ভিতরে বিদ্যুতের মতন
আমি যাই

বাসুদেব দেব : ক্ষয়

কেবল ঘড়ির কাঁটা ক্রমশ রক্তাক্ত হয়
কেবল নিজেকে সাবানের মত ক্ষয় করে
যেতে চাওয়া বস্তুর আত্মায়
শব্দে ও সম্ভোগে আমি ক্ষয়ে যাই রোজ
তোমার হয় না কোন ক্ষতি
টুং টাং ঢাকা-রিক্সা বৃষ্টিব ভিতর
কতদূর যাও দেবারতি

মানসী দাশগুপ্ত : বৃষ্টি

শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি অশান্ত অবোধ
বৃষ্টি ফুটো ছাদে
বৃষ্টি ও আগুন খুব কাছাকাছি
বিদ্যুৎ প্রবাহে।
কখন সার্কিট খাটো হয়ে যাবে।
জ্বলে যাবে বাড়িঘর, আতাগাছ
ইউক্যালিপটাস মাথা কুটে ছন্নছাড়া
প্রবোধ মানবে না।

ভয় করে হঠাৎ কখন ডাক পড়ে,
তখনি যাওয়ার মতো তৈরি থাকা প্রয়োজন, ঘরে।

পরেশ মণ্ডল : সবার কিছু অভিমান থাকে

সবার কিছু অভিমান থাকে
যা তার নিজস্ব
সবার কিছু দুঃখ থাকে
যা তার নিজস্ব
সবার কিছু সুখ থাকে
যা তার নিজস্ব

এই নিয়ে গড়ে ওঠে একটি জগৎ
যা তারই
সেখানে একটা আকাশ
আকাশে হলুদ সূর্য
সেখানে একটি নদী
নদীতে লাল নৌকা
এই নিয়ে গড়ে ওঠে একটা জগৎ
যা তারই

সবার কিছু অভিমান থাকে
যা তাব নিজস্ব

বিজয়া মুখোপাধ্যায় : শব্দ নিয়ে

শব্দ নিয়ে খেলা না লুণ্ঠন ?
আমি কি জিঘাংসু না স্নাতক না বক্তা না
আমি এলেবেলে কিংবা আদিবাসীদের মতো ক্ষিপ্র তীরন্দাজ
অহংকারী না মেধাবী না পৃষ্ঠপোষক
এ সাম্রাজ্যে শূদ্র বা পামর
ছদ্মবেশে অধিকারী কি অনধিকারী—
আজ আমার শব্দ ছুঁতে ভয়,
একি পাপ—শব্দ নিয়ে খেলা না লুণ্ঠন ?

আশিস সেনগুপ্ত : কে, আমি আছি

এখন তোমার ছুটিছাটার ডানাকাটা
বেরুবার আগে দরজায় হুকটুকের ব্যাপার
ঘরের খরচ বাইরের কেনাকাটা
মোটামুটি একটা সাপ্তাহিক হিসেব
ঘড়ি কিম্বা আকাশের দিকে তাকিয়ে
বৃষ্টি বাদল আসবে কিনা
আসবে কিনা শহর থেকে গাড়ী ...
হাঁটা পথে তোমার আর তত গরজ নেই
তুমি আর আগের মতো কড়া নাড়লেই
ভেতর থেকে বলে ওঠো না
'কে',—'আমি আছি।'

শিশিরকুমার দাশ : দুটি রঙিন ফুল

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি দুটি রঙিন ফুল
হঠাৎ ভোরে সুগন্ধে আকুল
দুটি ফুলের প্রাণের পাশে আলোর অবসর
এই বুঝি যায় ভাসিয়ে নিয়ে
অদৃশ্য কোন্ জীবন-সহচর

দুটি চোখেই একটি রং-এর আলো, গহন লাল
দুই নৌকো এক কাছিতে বাঁধা
একটুখানি জলের অন্তরাল

একটি সুরের গুন্‌গুনানি দুটি ফুলের পাশে
হঠাৎ ভোরে জান্‌লাতলীর ঘাসে

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় : কেমন সহজে

কেমন সহজে ছেড়ে দিলেন থাম-ওলা বাড়ি
ঐ ঘুরানো সিঁড়িটা।
সামনে কি পপ্‌লার ছিল, নাকি পাম্‌সারি
লোহার গেটের পাশে দারোয়ান
কিন্তু সেই সাহেবসুবোর সাদা স্ট্যাচুর আড়ালে
একটা যুগই পড়ে রইল
বিক্ষুব্ধ নিশ্চয়
সেই কাঠের আড়ালে চেয়ার
চেয়ারের সামনে সেই সবুজ ভেলভেট-মোড়া টেবিল
যার চারদিক পিনবদ্ধ
জানালার গঙ্গায় হাওয়া ভেসে আসছে
পিনবদ্ধ একটি মানুষ নামছে
নীচে নীচে
সর্বাঙ্গে রক্তের চুমকি চুমকি চুনিপান্না
নামছে আর মিশে যাচ্ছে
ফুটপাতে যেখানে মানুষ
হঠাৎ কে যেন এল বুকে এঁটে দিতে ছোট ফ্ল্যাগ
সেই পিন ধরে রাখছে মানুষকেই
মানুষের জন্যেই
প্রার্থী ও প্রার্থিত ঐ হাঁটছে পাশাপাশি।

পরিমল চক্রবর্তী : স্মৃতিচারণায় শৈশব

আমাকে ফিরিয়ে দাও শৈশবের সেই দিনগুলি,
যখন ভোরের বেলা ফুটে উঠতো অজস্র রঙ্গন
অথবা শাপ্‌লার ফুল আলোয় আকর্ণ খালে বিলে
সূর্যের সস্নেহ স্পর্শে, যখন ধূসর মমতায়
চরাচর ব্যপ্ত করে নেমে আসতো উদাস গোধূলি,
এবং জ্যোৎস্নায় রাত্রি ভেসে যেতো স্বপ্নভারাতুর।

বেণু দত্তরায় ঃ না, কেউ ডাকে নি

না, কেউ ডাকে নি—
শুধু
　　হাওয়া তাকে ডেকেছিলো
সেই থেকে
সে বিহ্বল সমুদ্রে গিয়ে
　　বসে আছে .
জেটিব উপরে
সারারাত

সমুদ্র-পাখিব ডাক
বাত জাগা ..
তাব রেশমের মতো কালো চুলে
সারারাত
　　হাত বুলিয়েছে
　　হাওয়া
তার ফস্ফরাসেব মতো
　　সাদা বুকে

হায়, সে যদি জানতো।
কেউ তাকে ডাকে নি
শুধু
　　হাওয়া তাকে ডেকেছিলো

অবিনাশী হাওয়া

ক্ষিতীশ দেব শিকদার . ক্ষতির বোঝা

পথের পাশে গাছগুলো আর দেখছি না
কাটল কে ?

অজ্ঞাতবাসে থেকে গভীর নির্জনতা আমি দেখে এলাম
প্রতিভার ভেতর ঘুমিয়ে থাকা চিন্তাকে জাগিয়ে দেখলাম কতোভাবে
হঠাৎ কে যেন ধাক্কা দিল পিঠের দিকে
বুঝলাম, আত্মগোপন করে থাকার সময় এখন ফুরিয়ে গেছে
আমি সেই একই পথ ধরে আবার ফিরে আসছি
কিন্তু এবার পথের পাশের গাছগুলোকে আর দেখছি না
কাটল কে ?

সোমেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : কিছু

আগে লক্ষ্য ছিল প্রস্তুতি
সংগঠন অনুষ্ঠান বা আলোচনা, ব্যাপক কর্মকাণ্ডে
ক্রান্তির নায়ক সেজে রঙ্গমঞ্চে প্রধান ছিলাম।

তথাপি পৃথিবী থেকে
ঘোচে নি আঁধার কিংবা মানুষের মনের অসুখ,
লুকোচুরি খেলতে খেলতে দেখছি নিজেকে
স্বয়ং-লালিত-বৃত্তে আত্মমগ্ন,

এখন বয়স বাড়ছে, সূর্য আজ আরেক দিগন্তে
ঈশ্বর, আমি আজো বাঁধা আছি অভ্যাসের কাছে।

এখন তোমার কাছে যেতে হবে
হিরণ্ময় পাত্র ফেলে,
মাটির গভীরে।

প্রণব মিত্র : এখন

এখনো দেবার ইচ্ছে প্রায়ই হয়, কিন্তু কি যে পছন্দ তোমার
সহজে সেসব যেন ঠিক আর বুঝতে পারি না।
অনেক সংশয় নিয়ে কিছুটা বা ভয়ে ভয়ে দোকানে আমার
তোমার জুতোর শব্দ শুনতে পেলেও আর বেশী প্রত্যাশা করি না॥

অথচ সেদিন ভাবো, বেশী নয়, এক দুই দশক আগেও
রুটিন পালিয়ে যদি এসে গেলে এখানে দুপুরে
কোনকিছু ঠিকমত না খুঁজেও পেয়ে যেতে এবং তাতেও
তোমার গালের রং অনায়াসে লাল হোতো,

অথচ সবই ছিল, নিতে পাবতে সব তুমি যে-কোন সর্তই।
'কি আছে দেখান দেখি' বললেই আমিও তখনই
শো-কেসেব থেকে এনে দেখাতে পারতাম কোনো নতুন খেলনা।

কিন্তু তা' হ'বার নয়, কারণ নিজেই হয়ত জানো না কি দরকাব তোমার
এখনও দেবার ইচ্ছে প্রায়ই হয কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি না
কিছুটা সংশয় নিয়ে, কিছুটা বা ভয়ে ভয়ে দোকানে আমার
তোমার জুতোব শব্দ শুনতে পেলেও আর প্রত্যাশা করিনা॥

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী ধূলি পায়ে

পুরনো বই-এর পাতা ধূলি মুছে রাখা
প্রতিদিন পবিত্র কাজের কিছু দায়িত্বের মত
যেমন সকালে উঠে স্নান। বই, শব্দ, অসংখ্য অক্ষব
আমার বুকের মধ্যে আনাগোনা, যেন স্নিগ্ধপাখির পালক।
কখনো পাথব রুক্ষ উষ্ণ বা শীতল স্বপ্ন,
অসংখ্য অনন্ত রূপে, ধূলি পায়ে বই, আসে যাব
অবিকল সাত বছরের দুষ্টু ছেলের মতন
ধূলোকাদা মাখামাখি বিকেলে ফিরছে স্কুল থেকে
কিছুই ভ্রূক্ষেপ নেই, ভাবে, মা কোলে তুলবে কখন।

জীবেন্দ্র সিংহ রায় : এক সুরভিত মুখ

কষ্টগুলি সেয়ানা বাদুড়,
ওৎ পেতে থাকে
খোয়া-ওঠা পথে, শ্রাবণের শশব্যস্ত মেঘে,
ছেড়ে-যাওযা এক্সপ্রেসের কঠিন হাতলে।
ওরা জলডাকাতের মতো
রক্তাক্ত গভীরে
সহসা লাফিযে পড়ে
নোটিশ ছাড়াই।

কষ্টগুলি শরীরের থেকে
কিছুটা উষ্ণতা কাড়ে,
মুছে দেয় বৃষ্টি-ভেজা স্বর্ণাভ দুপুর
রাত্রিচর সচ্ছল জোনাকি।
জীবন তখন শুধু
সুন্দরীর কক্ষচ্যুত নিঃসঙ্গ কলস।

কাল ভোরে চলে গেছে রাণু,
সব আছে ঠিকঠাক-ছিমছাম বেড্‌শীট,
দেয়ালে যামিনী রায়,
চিরুনির নম্র হাতে একগুচ্ছ চুল।
পিতামহ ঘড়ি শুধু
ধরে আছে পলাতক আটটি প্রহর।
রমণীয় দিনগুলি সরে গেছে
অস্থির কপাট খুলে
খলবলে মাছের মতন,
এই তিক্ত প্রহর ধরে
কে তুমি প্রবাসী
ঘনীভূত শ্রাবণের মতো বসে আছো
আমার দরজার পাশে!

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় : মূর্তির বদলে

চারদিক থেকে আজ আলো এসে পড়েছে তার মুখে
চারদিক থেকে ঝুঁকে পড়েছে আজ মেঘলা
তার দিকে।
সে কি দেখছে আলো কিংবা মেঘ?
সে কি জানে তাকে ঘিরে কারা সব
কারা চলে গেল?
সে কি জানে প্রত্যেকেই তার
প্রাপ্য বুঝে নিল একে একে?
নিল অগ্নি, নিল জল, নীল মাটি, বাতাস, চণ্ডাল।

মূর্তির বদলে তার বুক জুড়ে রেখে গেল শুধু
স্মৃতি একতাল
যা দিয়ে নতুন মূর্তি গড়ে নিতে হবে তাকে ফের
নিজস্ব আদলে।

আশিস সান্যাল : ভুল

সব কিছু মনে হয় ভুল।
হলুদ বনের থেকে
উড়ে এসে অন্ধকারে সাতটি জোনাকি
যখন শুধায় ডেকে :
কতদূর গেলে আর পাবে সেই বাড়ি?

দু'চোখে বেদনা জমে,
তারপরে শুরু হয় প্রখর বর্ষণ।
মনে হয় শূন্য সব—
ধূসর-প্লাবিত রোদে ধু-ধু বালিয়াড়ি।

ভাবি নি সুখের কথা,
চেয়েছি কেবল
সুখের চেয়েও দামী স্বস্তি কিম্বা শান্তি
নিজস্ব রঙীন বাড়ি
কলাবতী ফুল,
হলুদ বনের থেকে উড়ে এসে সাতটি জোনাকি
অমোঘ বিশ্বাসে বলে ঃ
ভুল—সব কিছু হয়ে গেছে ভুল।

দেবপ্রসাদ ঘোষ   কিশোর ও নীলকণ্ঠ পাখির পালক

বন্ধুর সংখ্যা ক্রমশই স্বল্প হয়ে এল।

নির্বিঘ্ন নিভৃতি
নিরাপদ ওমে মাখামাখি।
শরীরের ঘেঁষাঘেঁষি
নির্ভাজ আমেজ
আপাতত প্রতিদ্বন্দ্বীহীন।
মেয়েলি হাতের সযত্নে গোছানো আলনা
কেউ আর এলোমেলো করে দেবেনাকো।

রাস্তা উঠে গেছে বহুক্ষণ গাছের ডগায়
রৌদ্র নুন কিম্বা বাতাসের বালি
মুছবে না ওদের মুখের প্রসাধন
না-বলা না-কওয়া কোনো কিশোর
উঠে আসবে না বারান্দায়। ভাঙাবে না
দুটো শরীরের ঘেঁষাঘেঁষি বাড়তি ঘুম।
আপাতত এইসব জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞায় আমার বন্ধুরা।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত
ওদের সান্নিধ্য
অনেক মৌরশী সত্ত্ব ছিল।
আমি নেমে আসি সামনের
রাস্তায়। যে রাস্তা
রাগে গবগর। চল্লিশেও।
দগ্ধ চল্লিশেও রাস্তা পার হয়ে আসি
নিঃসঙ্গ বকুলের মতো
বেয়াদপ কিশোরের পাশে দাঁড়াই।
যে আমাকে দেখাবে বুনো-আশশেওড়ার ফল
বঁইচি বন। নদীর জলে তে-চোখা মাছ।
তাকে বলব আমি ভীষণ ক্লান্ত ভীষণ রিক্ত
আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি
আমার হাত ধর। নিয়ে চল তোমার সবুজ,
গলায় পরিয়ে দেবো নীলকণ্ঠ পাখির পালক
তুমি বেয়াদপ কিশোর তোমার সঙ্গে নীলকণ্ঠ পাখির পালক
চলো আমরা খুঁজবো।

রবীন সুর শর্তহীন সমর্পণ

আশ্চর্য সকাল তুমি আমন্ত্রণে সাজাতে পারো নি।
যার মুখ কোনোদিন স্বপ্নেও দেখি না
তার গুপ্ত ভালোবাসা প্রজাপতি ডানার দোলায়
ঠোঁটের অসাড় তৃষ্ণা অতর্কিতে নিঃশব্দে ভিজিয়ে
অবচেতনায় দ্রুত সংঘর্ষ ঘটায়।

তুমি স্বীকার করো না।
ধমনীর রক্তস্রোতে গরল প্রবাহ,
আমূল ছুরিকাবিদ্ধ হৃৎপিণ্ডের নীরক্ত মাংসকে
যখন যেদিকে খুশী নির্বিকার দুহাত ছড়িয়ে
কোনোদিকে মানুষ ছাখে না—
বঞ্চনার বিষচোখে অবিশ্বাস ঘৃণা
একটিও মানুষ নেই পূর্বমহিমায়
তুমি জাগো—
যে-কোনো মানুষই জাল—ভিখিরি অথবা কাঠ।

আশ্চর্য সকাল তুমি আমন্ত্রণে সাজাতে পারো নি।
একজন না একজন নিষ্ঠায় ক্ষমায় প্রেমে
দরোজায় দাঁড়িয়েছে বিনাশর্তে মুগ্ধ সমর্পণে।

গোকুলেশ্বর ঘোষ বোধিবৃক্ষ

তোমার বোধিবৃক্ষে একটিমাত্র পাতা
উত্তপ্ত দুপুরে পথিকের পায়ের পাতায়
চূর্ণ হবে আশঙ্কায় ধরে রেখেছ বৃন্তে,
ঝড়ে চ্যুত হয় নি সে।

পাতার আড়ালে খেলা করে রৌদ্রছায়া
মাটির আতপ্ত নিঃশ্বাস বুকে নিয়ে
তৃষ্ণার্ত কুঁড়ি মেলে ধরে তোমার দিকে
বহু প্রযত্নে তুমি স্মৃতি ধরে রাখ।
আকাশের দিকে সব ডালপালা স্পর্ধিত হাত বাড়ায়,
ভেঙে পড়ে,
তোমার বোধিবৃক্ষে একটিমাত্র পাতা।

রবীন আদক : সাঁকো

আমাকে একটা বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে ওপারে যেতে হয়,
নদীর ভেতর থেকেই ঘণ্টা শুনি . সময় হলো।
সময় কি উজানে বয় ?
কতকালের ভ্রমর
পথের পাশের আকন্দ ফুলে,
নামাল্ জমিতে পুরনো বকুল,
শাদা ধ্বজা উড়িয়ে কারা যেন মিছিল নিয়ে নদীতে এলো—
চরের বালিতে শুরু কোলাহলময় কাশফুল।

এ-পথেই আমার আসা-যাওয়া,
সাঁকোর বাঁশে মাঝে-মাঝেই টান পড়ে,
কারা নিয়ে যায় ওসব ভাবি—
পায়ের তলার পথটুকুতেও লোভ
তখনই শুধু ক্ষমা করা, জলে নামা।
হাটুরে লোকজন গামছায় মুখের রোদ মুছে এপারে আসে
এপারেই তাদের কাজ, বেচাকেনা—
আমার কাজ সাঁকো পেরিয়ে ওপারে . নিত্যসেবা, পূজা—
ওপারেই সেই মন্দির যেখানে মন্ত্র পড়ি, ঘণ্টা বাজে,
বর্ষায় শুধু পুঁথিপত্তর ভিজে যায়, সাঁকো ভাঙে
শুকনো বটপাতায় আমার মন্ত্রগুলি ভেসে যায়—
তখন শুধু নদীর ভেতর জল এবং জলের ভেতর নদী
নদীতে সাঁকোর একটা কঙ্কাল
জলের দিকে হাত তুলে বলে : আসছি॥

সামসুল হক · পাপপুণ্য ৮০

জ্যান্ত গাছের চূড়োয় শুকনো ডালের হাড়চামড়ার আদিম
তার ভিতরে কুড়োয় দুটো আস্ত আত্মা তাদের খুচরো রক্তডেলা
আর ঐ রক্তডেলায় দিনের গুটি ফুটতে-ফুটতে একদিন সে ধ্রুব
নামে বনের খেলায় লোক-উৎসবে বাঘের সঙ্গে বস্ত্র-বিনিময়

মরা ঘরের চূড়োয় জ্যান্ত গাছের অশ্বমেধের ঘোড়া
আদিম ধুলো উড়োয়
লোক-উৎসবে ঘুমোয় ঘরের দ্বন্দ্ব বাসী ছোঁড়া

দিনের শেষে, ঘুমের দেশে · দেবী রায়

ঐখানে, ঠিক ঐখানে গোধূলি ও সন্ধ্যার গৃহ
কোথাও, কোনও—খিন্ন—গোলমাল অব্দি নেই
পারতপক্ষে, দেখা যায় না—কোনো, মানুষের ছায়া—
চারদিকে অপার মাঠ
এক, দিগন্তব্যাপী ধু-ধু মাঠ
সন্ধ্যা, কি নির্ভয় ? সেকি, খুলে রাখে
অর্গল—বন্ধ কবাট ?

ঐখানে, কারা কেটে নিযে যায়
শ্রমের ফসল
ফলে একবার, অপরূপ ঐ মাঠে—একা একা—
বেড়াতে বেরিয়েছিলাম—
আর লক্ষ্যে এসেছিলো · এক সুদূরব্যাপী বিষাদ
ও নিস্তব্ধতা

খোলা তানপ্রধান আকাশ, আর তার
গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস
জগৎ-সংসার একবার ঝাপসা হয়ে গিয়েছিলো।
কী প্রশান্তি, সে সময় ...
সে শুধু, স্তব্ধ হয়ে মুখোমুখি একান্তভাবে, অনুভবের বিস্ময় ॥

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় · বোতাম

সারাদিন ধরে বোতামটা সেলাই করি,
আর জামাটা পরতে গেলেই
বোতামটা ছিঁড়ে যায়।
বোতামটা আবার সেলাই করি।
জামাটা হাতে রাখি,
হাত থেকে ধুলোয় পড়ে যায়।
কুড়িয়ে নিয়ে গায়ে পড়ি,
আর বোতামটা—
কোথায় বোতামটা ?
জামাটা খুলে রেখে খুঁজতে থাকি—
সুইচে হাত দিয়ে আলো জ্বালি,
বাসের হাতল ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ি,
ময়দানের ঘাসের ওপর চোখ রাখি,
শহরে-শহরে পথে ঘাটে জামা-ব্লাউজ-পকেট
আর বোতামটা নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে—
আমার জামার বোতামটা—
সেই ছোট্ট বোতামটা—
সেলাই করেও হারিয়ে যাওয়া শাদা বোতামটা—

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় : বর্ষার দুপুর

এখন সরব দুপুর .

অনেকেই বর্ষাস্নিগ্ধ দুপুরে

মেঝেয় মাদুর পেতে ঘুমুচ্ছে,

মেয়েদের কথা বলছি

যে সব মেয়েরা ঘরকন্নাকেই আঁকড়ে ধরে আছে

তারা নিস্তব্ধ

কোনো কারণে বর্ষার দুপুরে যদি ঘরে থাকতে হয়

এবং ঘরে মেয়েরা যদি তাদের যে যার ঘরে

ঘুমের আশ্রয় নিয়ে থাকে

তাহ'লে এরকম একটি দুপুর আপনার পক্ষে পরম লাভ।

কোথায় একটি ভিজে কাক পালক থেকে

বৃষ্টি ঝরিয়ে ডাকতে সুরু করেছে

অনেকক্ষণ কা কা করতে না পেরে যেন হাঁফিয়ে উঠেছিলো

তখনও বৃষ্টি ঝরার শব্দ শেষ হয় নি

ছাদের নর্দমা দিয়ে অথবা কার্ণিশ বেয়ে

জল পড়ছে

দু'একটি ছেলে মেয়ে পায়ে টিপ দিয়ে

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে

অকারণ উল্লাসে চিৎকার করে ডাকছে

খেলার দু'একজন সাথীকে

কি খেলবে ? খেলা নয় ?

বোধ হয়, এতক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল

আমি কান পেতে প্রত্যেকটি শব্দ শুনি

আমি শব্দ শুনতে ভালোবাসি

দূর দূর থেকে আগত শব্দ

কাছের শব্দ

বালক, মানুষ, পশুর শব্দ পাখীর চিৎকার

সব শুনি

জল পড়ার শব্দ থেকে
আলাদা করে নিয়ে শুনি
আবার কেবল জল পড়ার শব্দ শুনতে চেষ্টা করি
সেই সব শব্দ বাদ দিয়ে
জল পড়ার শব্দ
বুকের খুব কাছে মনে হয়
যদি নিজেকে খুব কাছে পাওয়া যায়
তখন সেই শব্দে একটি জলতরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়
—তখন অভিনব এক ঐকতানবাদন
রচনা হতে থাকে মনের মধ্যে।

হেনা হালদার : হৃদয় এখন

হৃদয় এখন আর ফুলের বাগান নয়,
রক্-গার্ডেন
ফুল লতা পাতা বৃথা গুল্ম ছাডাই
মনোরম কাঁটা ক্যাকটাসে,
ঘাস নয় কঙ্কর-মোরগ

সময় নির্দয় বড।
চীৎকারই সহজে সহনীয় ··

গোপাল ভৌমিক : কবিতা ফেরারী ফৌজ

কবিতা ফেরারী ফৌজ
মাঝে মাঝে রণাঙ্গন ছেড়ে চলে যায়
তখন বিপন্ন
বোধ করে যদি তৃতীয় পাণ্ডব
এবং বিপদে তার মন ভরে ওঠে
কাকে দোষ দেব।
কখন সে কোন ফাঁকে
ফিরে এসে তোলপাড় করে দেবে সব।
আপাতত যে দিকে তাকাই
সব শূন্য, মরুভূমি।
যে রাতে প্লাবন নামে আমি ভেসে যাই
পরিকীর্ণ কবিতার বিবস্ত্র উল্লাসে
হয়তো বা রণোন্মাদে
মেতে-ওঠা শরীরী শিবিরে
নামে না ক্লান্তির ছায়া মাঝ রাতে, ভোরের আলোকে
এবং বিজয়ী হয় তৃতীয় পাণ্ডব।

অমিতাভ দাশগুপ্ত ঈর্ষাপ্রবণ

এই তো তোমার মোটামুটি সব সাজানো।
স্ত্রী-র শরীরে একটু-আধটু মেদ জমছে
বইয়ের তাকে বই,
ভালোভাবেই গোটা তিনেক পাশ দিয়েছে খোকন তোমার,
খুকির স্বামী খুকিকে নিয়ে ইউ কে,
শহরের ঠিক হৃদয়ে নয় পায়ের কাছে
চার কামরার বাড়ি তুলেছো ছিমছাম—
এই তো তোমার মোটামুটি সব সাজানো।

এমনিভাবে সমস্তটা অটুট রেখে থাকা যাবে তো ?
ভরভরন্ত মাংসে কোথাও
বিঁধে নেই তো একটা গোপন মাছের কাঁটা ?
ইঁটের ওপর ইঁট সাজিয়ে
তৈরি করা এতদিনের দুর্গ তোমার
এক রাত্রির বৃষ্টিতে কি ধুয়ে যাবে না ?
না না এসব ঈর্ষাপ্রবণ লোকের কথা—
এই তো তোমার মোটামুটি সব সাজানো।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত স্বপ্নচ্যুত

স্বপ্ন দেখতে ভালো লেগেছিল এক সময়।
স্বপ্ন
কৈশোরের যৌবনের পৃথিবীলোকের রজনীগন্ধার ঝাড়!
অথচ ছিন্ন স্বপ্ন বড়ো ভয়াবহ।
যেন নদীর জলে লাশ ভেসে যাচ্ছে স্রোতে,
যেন বা জ্যোৎস্নায় ফুলের বনে যেতে যেতে
পা'য়ের সামনে নিহত হরিণ।
যেন লাল-নীল-সবুজ ফুলের সজীবতার পাশাপাশি
বজ্রাহত
পত্রহীন দগ্ধ গাছ।
স্বপ্ন থেকে চ্যুত হ'লে
মানুষকে
বড়ো অসহায় মনে হয়।

চিত্ত ঘোষ : একটি শীতল সামুদ্রিক মাছ

ঘরের দেয়ালের ছায়া পেছনে পড়ে থাকল

বালুর ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে
বালুতে পা ডুবিয়ে মেয়েটি গাছের মতো
কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল।
তারপর ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের অদ্ভুত নীল অযুরন্ত
আকাঙ্ক্ষার ফেনার মধ্যে আছড়ে পড়ে
ভীষণ আবেগে আন্দোলিত মুহূর্তগুলিকে
শরীরের অভ্যন্তরে নিয়ে
পুরুষ ঢেউ এর সঙ্গে সঙ্গমের শিখরে উঠে
অতল অন্ধকারে নেমে
উলঙ্গ নীল মেয়েটি
উত্তাল তরঙ্গের পায়ের কাছে
একটা শীতল সামুদ্রিক মাছের মতো পড়ে থাকল।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় · প্রসঙ্গত

আলোটুকু মুছে গেছে, লুকিয়েছে হরিণের ছানা
সামনে ঝিল্, ভুধরাজ কাগজের প্লেনের মতন
ছেলেদের হাতে করে ওড়াউড়ি, প্লেন জলে পড়ে
ভুবরাজ পড়ে না, ওর ডানা আছে, প্রাণে আছে ফেনা।

বাংলো বাড়িটি ছিলো কেনা, দু'দিনের জন্যে, ভুবরাজ
সার্কাস দেখাতে আসে, ওড়ার নমুনা হয়ে আসে
শিশুদের সামনে, ঝিলে, ঝিলপারে, সন্ধ্যার আঁচলে
বাঁধা পড়তে, খুচরো পয়সার মতো, পাগলের কুড়োনো সম্পদ—
তার মতো, ভুধরাজ, সকালের গরুর পালানে
দুধের মতন ক্ষিপ্র, শিশুর তৃষ্ণার মতো এতো স্বাভাবিক।

বেথুয়াডহরি বাংলো জঙ্গলের মধ্যে মানুষের
নিঃশ্বাস ফেলার জন্য, মনে হয়, গঠিত হয়েছে।
অন্যান্য কাজেও লাগে, বিভাগীয়, সে-কাজে মানুষ
তৃপ্তি পায়, অর্থ পায়। কিন্তু পায় অর্থের অধিক
ভারসাম্য, যা খুবই জরুরী, মৃত্যু-পঙ্গুতার চেয়ে তার
দাম বেশি। সেই দাম প্রসঙ্গত হরিণেও জানে॥

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় : লোড-শেডিং

[তারাপদ রায় সমীপেষু]

হঠাৎ নিবে গেল আলোটুকু
পালালো প্রজাপতি বহুরূপী
একলা জামগাছ বেটে পরে
সামনে দাঁড়ালেন চুপিচুপি।

'কবিতা ভাবছিলে মনে মনে
চোখে কি ভাসছিল পরীটরি' ?
গোঁফের ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে
জানতে চাইলেন সরাসরি।
একটা চোখ যেন ধার দিও
যা দিয়ে, দাঁড়িয়েই দেখে নেবো
আলোর সুতোগুলো কত দূরে,
অন্য চোখ বুঁজে তুমি ভেবো।
হঠাৎ জ্বলে ওঠে আলোগুলো,
'চলি হে', বললেন জামতরু,
'মানায় গোধূলিতে খোকাপনা।

তখনই শুরু হোল গাছে গাছে
পাতা ও পাখিদের আলোচনা।

জনশিক্ষায় লোকসংগীত ও সাহিত্য

বৈদিক যুগেও বিদ্যার ক্ষেত্র গুটিকতক বিত্তশালীর ঘরে আবদ্ধ ছিল। এই সীমিত জনপদে সাধারণ মানুষের প্রবেশ অধিকার ছিল না বল্লেই চলে। কিন্তু মানুষের মন গতিশীল এবং গতিশীল মনই গণশিক্ষার পথ খুলে দিত। তাই গণশিক্ষার চলাফেরা ছিল সাধারণের ঘরে লোকসংগীত ও লোকসাহিত্যের আসরে।

আমরা লোকসংগীত ও সাহিত্য বলতে পাঁচালী, লোককথা, লোকগাথা, কথকতা, প্রবচন, হেঁয়ালী, ধাঁধাঁ ইত্যাদি বুঝি। কাগজ প্রচলনের অনেক আগে পণ্ডিতেরা তালপাতায় নানা উপদেশ লিখে রাখতো, যা পরে ব্রতকথায় ও জীর্ণ পুঁথিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু লোকসাহিত্য ধীরে মন্থর গতিতে সমাজদেহে সঞ্চারিত হতো। এর ঐতিহ্য যেমন প্রাচীন, ভাব-ঐশ্বর্যও তেমনি মাধুর্যময়। লোকসাহিত্যের অঙ্গাভরণ, ধাঁধাঁ ও ছিবুলা, যা আজও চলে, বৈদিক যুগেও চলতো।

মানুষের সুখদুঃখের দুই পারে চিরন্তন ফুলফোটা পাখীর গান, নদীর কলতান সব মিলিয়ে প্রকৃতির সাজানো অঙ্গনে মানুষ মেলে ধরেছে তার হৃদয়। লোক-লোকান্তরে সেই সুখ দুঃখের গান গেয়েছে মানুষ সুরে, তালে ও ছন্দে চিরকালের সেই সংস্কৃতির উপকূলেই সৃষ্টি হয়েছে লোকসংগীত। এখানে চোখ-ঝলসানো আলোর চমক নেই, আছে সন্ধ্যাদীপের স্নিগ্ধতা ও নরম মাটির মাধুর্য। সমাজে জনমন রয়েছে, জনমনে রয়েছে রস ও ভাব। এই রস ও ভাবেই মানবমনের মনিমঞ্জুষা ও মানবিক সত্তা। সবুজ বনানীর চেয়ে কচি। নরম মাটির জীর্ণ কুঠিরে এদের চলাফেরা। সারা বাংলাদেশের পথে ঘাটে, হাটে মঠে, সাধারণ মানুষের ঘরে ছড়িয়ে আছে কত লোককথা, লোকগাথা, হেঁয়ালী আর ছড়া। গায়কমন সমাজমনের নানা কথা খঞ্জনী বাজিয়ে গেয়ে চলে এ ঘর থেকে ও ঘরে। এ শিক্ষার পুঁথিগত

বিদ্যার অহমিকা নেই। এতে আছে স্বাভাবিক মনের সহজ অভিব্যক্তি, যা কানের ভিতর দিয়ে মরমে পরশ করে। সমাজ মনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে লোকসংগীত ও সাহিত্য থাকে নানা রসে, রঙ্গে। এর মধ্যে উৎসব আয়োজন, পূজা পার্ব্বণও বাদ যায় না। যেমন বাংলাদেশে নানা উৎসব পার্ব্বন, লোকে বলে বারমাসে তের পার্ব্বন। এই ব্রতে উৎসবের ছড়া লোক মুখে মুখেই শিখতো। গ্রাম গঞ্জের বাউলরা ভোরের আলোয় খঞ্জনী বাজিয়ে গানের ছড়া নিয়ে গেরস্থ বাড়ীর সদর দেউরিতে উপস্থিত হতো

জৈষ্ঠমাসে ষষ্ঠিপূজা করে সব নারী,
আষাঢ় মাসে রথযাত্রা লোক সারি সারি।
শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা মহারাজার বাড়ী,
ভাদ্রমাসে নন্দ উৎসব কানাই গড়াগড়ি।
আশ্বিনমাসে দুর্গোৎসব লোকে কাটে পাঠা,
কার্ত্তিক মাসে দীপান্বিতা ভাইয়ের কপালে ফোঁটা।
অগ্রহায়ণে নবান্ন রান্না নোড়ামুরি,
পোষমাসে পুষনা রাখালের হাতে নড়ি।
মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমী বালকের হাতে খড়ি,
ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রা লোকে গায় হোলি
চৈত্রমাসে চড়কপূজা সন্ন্যাসীর গলায় দড়ি,
বৈশাখমাসে ধর্মমাস বলো হরি হরি।"

কথায় কথায় মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষার আলো জনমানসে। এই ছড়া পাঁচালী ছন্দ চাতুর্য সুন্দর, যেন তুলির এক আচড়ে আঁকা ছবি। এবার দেখুন, বোষ্টমীদি গেরস্থ বাড়ীর সদর দরজায় হেঁয়ালীর ছড়া নিয়ে এসেছে। সবাই কান পেতে শুনলেন:

মহাপ্রভুর উৎসব আরম্ভ হইল,
ভক্তবৃন্দ পাতা বিছাইয়া ধরেধরে বসিল।
শাকশুক্তা দিল সাথে সাথে।
জাররায়ে না দিলে লাবরায়
ভক্তের হয় না সেবা।

সভাশুদ্ধ মুগ্ধ হলো,
গন্ধ মেথির বাসে।
তাহা শুনিয়া বুটের দালে মুচকি মুচকি হাসে
ঘৃতের সঙ্গে পাক করিলে,
বড়ই ভাল লাগে।
তাহা শুনিয়া অরহর ডাল কয়,
ওবে বুট বলছ ঝুট্।
আমাব গুণেব নাই সীমা।
পশ্চিম দেশে আছে আমার,
অপূর্ব মহিমা।'
তাহা শুনিয়া দধিমামা
খলখলাইয়া হাসে।
বিনি ভাগ্নে না থাকিলে,
তোমায় কেবা পুছে।

পণপ্রথা সমাজের বোগ। এই বোগ সমাজকে রুগ্ন কবে। সমাজের হাড্ মাসে ঘুণ ধরে। সমাজকে দুর্বল করে। পল্লীকবিব মন তাই পীড়িত। তবুও পণ ছাড়া বব আসে না :

রূপেব মযনা বে
তোরি কাবণে এত বাস্তা হাটলাম বে।
অল্প টাকাব কথা শুনি
না ছ্যাম্, না ছ্যাম্ করে।
বেশী টাকার কথা শুনি,
আগিয়া খবর করে।"
(আগিযা অর্থে আগ বাড়াইয়া)

সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনা ও সমাজেব নানা সমস্যার ছবি এঁকেছেন পল্লীকবি নানা রঙে, নানা ঢঙে, যা মুখে মুখে, কথায় কথায়, প্রকাশ হয়েছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। শিক্ষায় অমিয় আভা ছড়িয়ে পরে এ ঘব থেকে ও ঘরে— সাধারণ মানুষের অন্দর মহলে।

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল কাব্যে ব্রহ্মবিদ্যা-নিমগ্ন কণ্বমুনি স্বয়ং আশ্রম-বালিকা শকুন্তলাকে তার পতিগৃহে যাত্রার পূর্বলগ্নে যে উপদেশ শুনিয়েছিলেন, আমরা তা আধুনিকতার ছোঁয়ায় গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়েছি। সমাজতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ছবি রয়েছে এই অভিজ্ঞানশকুন্তল কাব্যে।

কবি কালিদাস বিশ্বসভায় ভাষার অলঙ্কারে যা কাব্যে প্রকাশ করেছেন, পল্লী-কবি তাই সহজিয়া ভাবে অঙ্কিত করেছেন। আদর্শ, নীতি, সংযম, শালীনতা, সমাজ সংসারের প্রাণবায়ু। পল্লীকবির ভাষায় খোমক, করতাল, মৃদঙ্গ সহযোগে পল্লীগীতি ভেসে আসে

ভাল কথা শুনি যদি মাগো
যাবো মাসে মাসে।
মন্দকথা শুনি যদি (মাগো)
না যাবো ছয় মাসে।
শ্বশুর ভাসুর থাকে যদি,
মাথায় কাপড় দিও।
দেওর ননদ থাকে যদি
খেলার সাথী করো।
আপন স্বামী ঘরে এলে (মাগো)
হেসে কথা কইও।

অপরূপ অভিব্যক্তি এই গানের ছন্দে। সহস্র বৎসর ধরে শত শত কণ্বমুনি এমনি করেই তাদের প্রাণপ্রিয় শকুন্তলাকে পতিগৃহে যাত্রার পূর্বলগ্নে উপদেশামৃত শুনিয়ে চলছে।

এবার গ্রাম বাংলার বসন্ত উৎসব। হোলির পালা গান চলছে এ পাড়া থেকে ও পাড়ায়। ফাল্গুনে লেগেছে হোলির আবির। কবির লড়াই বসেছে শ্রীরাধিকাকে নিয়ে। এক কবিয়াল অপর কবিয়ালের অবান্তর প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী নয়। কিন্তু প্রশ্নকর্তা বারবার উত্তরের জন্য দাবী তুলছে। এদিকে দোলের হোলিগান ভণ্ডুল হতে চলেছে। তখন তৃতীয় কবিয়াল বাধ্য হয়ে সভায় দাঁড়িয়ে কবিয়াল দু'জনের স্বভাব-দোষকে অপূর্ব ভাষায় প্রকাশ করেছেন :

একটা কুকুর কিনিলাম
তারে ছেলের মত পালন করিলাম।
তারে দধিদুগ্ধ ঘৃত মাখন সবই খাওয়াইলাম,
শালারে খাটে শোয়ালাম।
ওযে ছাইছাডা যে শোষ না
জাত যেমন তাব স্বভাব গেল না।

প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পে কুন্তল-চর্চ্চার অপরূপ ছবি ছড়িয়ে আছে। রমণীর কেশবাসেব পরিচর্যা আজও হয়, পুরাকালেও হতো। রমণীব রূপ সৌন্দর্য্য তার কেশবিন্যাসে। সেকালে রাজনন্দিনীদের কবরীবন্ধের পরিচর্যা হতো পরিচারিকার ধীর সঞ্চালিত সুনিপুণ করাঙ্গুলি দিয়ে। কবি কাব্য রচনা করতো, তুলির টানে শিল্পী ছবি আঁকতো রমণীর রূপলাবণ্যের "স্তবকিত মেঘভারের মত কববীবন্ধ কেশদামেব"।

পল্লীবাসী মহিলা নারীর রূপবর্ণনাও করেছেন :

"আগ দবশন চোপা,
পাছ দবশন খোপা।"

সমাজ সংসারের এক বিচিত্র আঙ্গিনায় এবার যাচ্ছি। রঙে, ঢঙে, ক্ষোভে দুঃখে হাসিকান্নায় সংসাব বৈচিত্র্যময় হব। এত বৈচিত্র্যের সমাবেশ যদি না থাকতো তবে সমাজ সংসার পান্‌সে লাগতো। এক গুনীজন আজ ইহলোকেব পবপারে চলে গেলেন। তাই সবাব মুখ মলিন, চোখের কোণে জল। এই বেদনার্ত মুহূর্তে এক পল্লীবাসীব মুখে ছোট্ট দু'টি কথা শুনি

গুণ থাকলে কাঁন্দে
চুল থাকলে বান্দে

প্রকৃতির বুকে নেমে এলো পোষ মাস। শীতেব কাঁপন লেগেছে তাই সবাব গাযে। রোদ তাই মিষ্টি লাগে শীতেব হিংসুটে দাপটে। ঘরসংসারের কাজ শেষ করে এ বাড়ীর গিন্নী ও বাড়ীর বড়বৌ, রোদের শেষ ভালবাসাটুকু নেবার জন্য উঠানে পা ছড়িয়ে বসেছে। কিন্তু পোষমাসের রোদ। বড় কৃপণ।

অতি চঞ্চল। তাই গরম আঁচল নিয়ে চটপট লুকিয়ে পড়তে চায়। তখন পল্লী-রমনীর মুখে শুনি :

পৌষমাস,
ফুস ফাঁস।

কথা ছোট কিন্তু অর্থ বড। বড়কে ছোটোর মধ্যে সাজিয়ে দাঁড করানোই আর্ট। আর্টের এই রমণীয় অভিব্যক্তিই রয়েছে লোকসংগীতের মর্মে।

মানব মনে রঙ বেরঙের মহল। বিচিত্র স্বাদ। ভিন্ন মহলের ভিন্ন রঙ। বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার ফসল কুড়িয়ে শিক্ষা লাভ করি। অভিজ্ঞতা বাড়ে। মনভূমি উর্ব্বরা হয়। জনশিক্ষাকে উৎসাহিত করে। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার মনভূমি বিস্তৃত হয়। উত্তরবঙ্গের, বিশেষত কোচবিহারের আঞ্চলিক ভাষায় এক রসিক ঠাকুরের ধাঁধা বেঁধেছেন

ক এ্যাকনা বুডি হাটত যায়,
গালেমুখে চড খায়।

অর্থ, মেটে হাড়ি

খ. এ্যাকনা বুডি হাটত যায়,
মানষি দেখলে ঝাঁপ দেয়।

অর্থ, শামুক

ধাঁধাও লোকশিক্ষার অঙ্গ। ভিন্ন স্বাদে, বিভিন্ন পরিবেশে শোলকও লোকশিক্ষার অঙ্গাভরণ। লোকশিক্ষার অঙ্গন তাই বিস্তীর্ণ। সংসারের নানাকথা নিয়ে আলোচনা বসেছে। যৌবন চিরদিনেই উপেক্ষা করে বার্দ্ধক্যকে। বাড়ীর বড বৌ তাই বুঝিয়ে দিচ্ছে তার মনের ঝাঁজ:

আম পাকলে হয় মিঠা,
মানুষ পাকলে হয় তিতা।

মানবমনের আর এক মহলে যাচ্চি। স্নেহের আবেশে মা তার মেয়েকে আদর করছেন। আদরের ঢঙ কি বিচিত্র আস্বাদের ? স্নেহপ্রবণতার কি সুশীতল ব্যজন!

খাওরে মাও খাও,
যতদিন না হৈচেন ছাওয়া পাওয়ার মাও।

ছাওয়া পাওয়া অর্থাৎ ছেলেমেয়ে সংসাবে এলে মেয়ে নানাভাবে কষ্ট পাবে। মা তার মেয়েকে তাই আদর করে খেতে দিচ্ছেন। ভাল ববে খেতে বলছেন।

এবাব যাচ্ছি, মনমন্দিবের আব এক কোঠায়। আকাশে সাত তারা। নীরব নিথর সবোবব। সন্ন্যাসী সটান শুযে আছে কদম গাছের গোড়ায়। ঠাকুরমা এসব লক্ষ ববে হেঁযালীর ছলে নাতি নাতনিদেব কাছে ধাঁধা বেধে অর্থ জানতে চায

সু-সজ্জা সাজিয়ে আছে
শোবাব লোক নাই।
সু-মবা মবে আছে,
কান্দার লোক নাই।
সু-ফুল ফুল ফুটে আছে
তোলার লোক নাই।"

নাতি নাতনিব চোখে মুখে ঘুমের জড়তা। ঠাকুবমা তাই গল্পেব পাট চুকিযে দিয়ে বলছেন, তোবা এবাব শুতে যা। কাল আবাব হবে।

পাদটীকা

এক অন্ধ ভিক্ষুক প্রতি সপ্তাহেই লেখকেব বাসায় এসে ছড়া গেয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ কবতো। লেখকের সহধর্ম্মিনী শ্রীউষাবাণী বক্সী মুখে মুখে সব ছড়া মুখস্থ কবে আমাকে লেখায় সাহায্য করেছে। অন্ধ ভিক্ষুকটি একসময পূর্ব্ববঙ্গে বাস কবতো। সংগৃহীত শ্লেকের মধ্যে কিছু রংপুব ও দিনাজপুবেব বিভিন্ন গ্রাম থেকে লেখকের সহধর্ম্মিনী সংগ্রহ করেছেন।

ছয় ঋতু। বাব মাস। সুতবাং বাংলা বৎসবেব প্রথম মাস বৈশাখ থেকে শুরু এবং চৈত্র মাসে শেষ। কিন্তু এই ছড়ায বাংলা বৎসবেব প্রথম মাস জ্যৈষ্ঠ। উৎসব ও পার্ব্বণ ভিত্তিক বৎসব গণনা জ্যৈষ্ঠ থেকে আবম্ভ বৈশাখে মাসে শেষ। আহ্নিক ও পঞ্জিকাব বৎসব যেমন পৃথক এও তেমনি।

শ্রীমান বনজিৎ বর্ম্মন রংপুব থেকে এবং কোচবিহাবেব আবুতারা গ্রাম থেকে শ্রীপ্রমথরঞ্জন সরকাব মহাশয় সংগ্রহে সাহায্য ববেছেন।

রবি বক্সী

ইউরোপীয় ব্যালে

ইতালীর শিল্পবিপ্লবের পরেই ব্যালের আবির্ভাব। মেডিসির সময়ে বিশিষ্ট অতিথিদের ধনীগৃহে বক্তৃতাদিসহ সান্ধ্যভোজের ব্যবস্থা ছিল। নৃত্যগীত, মূকাভিনয় ও কবিতা পরিবেশন ভোজসভার অবশ্যপালনীয় অঙ্গরূপে গণ্য হত। এগুলি কোনও না কোনও প্রকারে সম্পর্ক-যুক্ত ছিল, তবে ঘনসন্নিবদ্ধ ভাবে নয়, তবুও সব মিলিয়ে এগুলি ছিল একধরনের অভিনয়। তখনও অভিনয়ের জন্য বিশেষভাবে দৃশ্যসজ্জা প্রস্তুত করা হত, ভোজগৃহের মাঝখানে অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত্রিকোণাকৃতি। যেমন মিলানের রাজসভায় অভিনয়ের জন্য লিওনার্দো দা ভিঞ্চি অনেক মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনা করেছিলেন। অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট পোষাকও ছিল অত্যন্ত জমকালো ও ভারী। এই ধরণের অভিনয় অনুষ্ঠিত হতে হতেই ইতালির টরটোনার (Tortona) এক ভোজসভায় প্রথম ব্যালে প্রদর্শিত হয়। সেইসময় মিলানের ডিউক গ্যালিয়াজ্জো স্ফর্জা (Galeazzo Sforza) এবং তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী ইসাবেলার (Isabella of Aragon) সম্মানার্থে বার্গনজিও (Bergonzio di Botta) এক ভোজসভার আয়োজন করেন। ভোজের বিরতিতে 'দি স্টোরি অব্ জ্যাসন্' এবং 'দি গোল্ডেন্ ফ্লিস' এই দুটি ব্যালে নিয়মানুযায়ী অভিনীত হয়। এরপর ১৫৮১ সালে ১৫ই অক্টোবর ফ্রান্সের ক্যাথারিন (Catherine de Medici) এক বিবাহ উপলক্ষ্যে উপহার দিলেন 'ব্যালে কমিক দ্য লা রিন' (Ballet Comique de la reine)। সেই সময়ে রাজসভার অধিকাংশ লোকই অশ্লীল রসিকতা ও খেলাধূলায় সময় অতিবাহিত করত, যার মধ্যে তাঁর পুত্রও জড়িত ছিল। ফলতঃ ইতালি থেকে ফ্রান্সে হল ব্যালের অবির্ভাব। একজন ইতালিয় বাদক বলদাসারিনো (Baldassarino do Belgiojoso) এই ব্যালের রচয়িতা। তিনি ছিলেন সেই সময়ের একজন প্রখ্যাত যন্ত্রশিল্পী, ব্যালে সম্পর্কে তাঁর মত হল বহু মানুষের নৃত্য যা একক বা সমবেতভাবে সংগঠিত হবে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ জ্যামিতিক সূত্রে আবদ্ধ এবং সঙ্গে থাকবে বহু যন্ত্রসংগীতের সম্মিলিত একতান।

সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি ব্যালে নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়েছিল যার পাত্রপাত্রীরা হল কুয়াশা, বিদ্যুৎ, মেঘ, শিলাবৃষ্টি, ধূমকেতু ইত্যাদি। এইভাবে শুধু রাজসভার মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে ব্যালে নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়ে চলল। প্রথম এলিজাবেথের প্রিয় নৃত্যানুষ্ঠানও ছিল কিছু কিছু। সেগুলিও রাজসভায় পরিবেশিত হত এবং বিশিষ্ট অতিথিদেরই নিমন্ত্রণ থাকত শুধু তাতে।

এরপর ১৬৩২ সালে প্রথম ব্যালের অনুষ্ঠান হল সম্পূর্ণ সামাজিকভাবে, অর্থাৎ আপামর জনসাধারণের জন্য হল সেই অনুষ্ঠান। এরপর কিছু কিছু ব্যালের অনুষ্ঠান জনসাধারণের জন্যও পরিবেশিত হল। ১৬৫৩ সালে রাজা চতুর্দশ লুই একটি ব্যালে অনুষ্ঠানে সূর্যের প্রতীকরূপে নিজে অংশগ্রহণ করেন। ফলত ফ্রান্সের সভাক্ষেত্র সব শিল্পীর ও জনসাধারণের কৌতূহলের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সেই সময়। এই সময়ে লালি (Lully), মলিয়ের (Moliere) ইত্যাদি প্রত্যেকেই ব্যালে রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁদের একেকটি অনুষ্ঠান অনুপম সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক এবং নৃত্যের অন্তর্নিহিত যে ভাব সেটি দর্শকদের মধ্যে জ্ঞাপনের প্রচেষ্টাও ছিল তাঁদের নিখুঁত। ১৬৮১ সালেও লে ট্রায়ম্ফ্ দ্য ল্য'মুর (Le Triumpho de l'amour) গোষ্ঠী দ্বারা ব্যালেটি অনুষ্ঠিত হয়, তখনও কিন্তু তাতে নারীর ভূমিকা দিয়েছেন পুরুষেরা, যদিও দুই একজন অভিজাতবংশীয়া নারী এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে তা শুধু নেহাতই সভাসদদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে, তা না হলে বাইরের কোনও উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের অভিনয়ে নারীরা তখনও অংশ গ্রহণ করেন নি। সপ্তদশ শতাব্দী ধরেই ব্যালে প্রায় পুরুষদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নৃত্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই যেন ব্যালে নৃত্যে পুরুষেরা হয়ে গেলেন শুধু নারীর নৃত্যসহচর। লালিই সর্বপ্রথম ব্যালে নৃত্যে পেশাদার নর্তকীর প্রচলন করেন। লালির পুরো নাম জ্যাঁ ব্যাপটিষ্ট্ লালি (Jean Baptitse Lully) তিনি ছিলেন ফ্রান্সের রাজসভার অন্তর্ভুক্ত। ১৬৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন, মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে একজন বেহালা-বাদকরূপে চতুর্দশ লুইয়ের রাজসভায় যোগদান করেন। কিন্তু নিজ ক্ষমতা বা প্রতিভা বলে ফ্রান্সের শিল্পজগতে স্থান করে নেন। এমন কি ১৬৭৪ সালে অর্থাৎ তাঁর ৪২ বৎসর বয়সে ফ্রান্সের কোথাও কোনও অপেরা লালির অনুমতি ব্যতীত অভিনীত হতে পারত না।

কাজেই সংগীতের আলোচনায় যেটুকু পাওয়া যায় তাতে আমরা দেখি পাশ্চাত্যের সংগীতক্ষেত্রে লালির দান অবিস্মরণীয়। তবে তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু লালি যত প্রতিভাবানই হ'ন আর যাই করে থাকুন চতুর্দশ লুইয়ের অনুমতি ব্যতীত তিনি কিছুই করতে পারতেন না, কারণ শিল্পসৃষ্টিতেই শিল্পীর কাজ ত শেষ নয়। যথার্থ পরিবেশনই সংগীত শিল্পসৃষ্টির প্রাথমিক পদক্ষেপ। কাজেই চতুর্দশ লুইয়ের নাম এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে, আর ব্যালের ক্ষেত্রে চতুর্দশ লুইই প্রথম যিনি এর উন্নতিকল্পে সর্বাঙ্গীণ ক্ষমতা এবং ইচ্ছা প্রযোগ করেছিলেন। ফলে তাঁরই সম্মতিতে এবং লালির প্রচেষ্টায় ব্যালে নৃত্যে নারীর প্রবেশাধিকার ঘটেছে এবং ব্যালের ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ প্রথমেই দর্শকের দ্বারা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়। নারীর সৌন্দর্য স্বভাবতঃই নয়নমনোহর, বিশেষ করে নৃত্যের ক্ষেত্রে নারীর সৌন্দর্যের একটা স্বাভাবিক ভূমিকা আছে। কারণ নৃত্যশিল্পে সর্বদা শৈল্পিক আবেদনই বড় কথা নয়, দৈহিক আবেদনও তার সঙ্গে সমানভাবে কাজ করে এবং তা আবার নির্ভর করে মুখশ্রী এবং দৈহিক গঠনের উপর।

এ সম্পর্কে আর্নল্ড হ্যাসকেল (Arnold Haskell) একটি বড় সুন্দর কথা বলেছেন, 'নারীর মুখ ও শরীর হল তার যন্ত্র যার উপরই সে শিল্প রচনা করবে।' কোনও যন্ত্রশিল্পী যেমন ভাল বাজানো সত্ত্বেও কার্যকালে তাঁর যন্ত্রে যদি এতটুকুও গোলযোগ ধরা পড়ে তিনি নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করে থাকেন। এ ব্যাপারও অনেকটা তাইই। দর্শক চেয়েছিল একটু নতুন কিছু, একটু নমনীয় রমণীয় কিছু এ চাওয়া ত, তার ইচ্ছা-বহির্ভূত নয়। কাজেই নারীশিল্পীর অনুপ্রবেশ ব্যালের মত মহান শিল্পকে শ্রেষ্ঠতর করে তুলবার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাধা হয়ে উঠেছিল তাদের পোশাক। ব্যালের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য শিল্পীর পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে তা দেখে অনুভব করার উপায় ছিল না, মুখ ব্যতীত অন্যান্য সব স্থানই ছিল পোষাকের অন্তরালে। এ সমস্তই সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। কিন্তু সেই সময়েই পিয়ের বাশ্যাম্প (Pierre Beauchamp) ব্যালে নৃত্যে একটি বিশেষ ভঙ্গির সৃষ্টিকর্তা রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যা ব্যালের প্রথম এবং অবশ্য শিক্ষণীয় পদক্ষেপ এবং এটাই ব্যালের প্রথম স্বরলিপি বললে নিতান্ত ভুল বলা হবে না। বাশ্যাম্প ছিলেন প্যারিস অপেরার প্রথম কোরিওগ্রাফার

(choreographer)। কোরিওগ্রাফার কথাটি একটু বিশ্লেষণের দাবী রাখে। কোরিওগ্রাফি বলতে এককথায় বলতে হয় ডান্স নোটেশন্। একজন কোরিওগ্রাফার দেখেন কোন নৃত্যানুষ্ঠানে কতজন শিল্পীর প্রয়োজন, সৌষ্ঠবের গঠন কিরকম হবে, প্রতি নৃত্যশিল্পীর নৃত্য তাঁর বিশেষভাবে আয়ত্তে থাকবে। ব্যালে বা অপেরাটি যদি গল্প-নির্ভর হয় তবে তাঁকে নিশ্চয়ই দেখতে হবে যে গল্পটি যথোপযুক্ত অভিনয়ের দ্বারা ঠিকমত পরিবেশিত হল কি না। এক কথায় কোন ব্যালে বা কোন অপেরার জন্য একজন কোরিওগ্রাফারের সম্পূর্ণ দায়ী থাকবেন। তবে লেখক বা অঙ্কনশিল্পীর মত কোরিওগ্রাফারের দায়ীত্ব সীমাবদ্ধ নয়, বহু শিল্পীর সঙ্গে তাকে কাজ করতে হয়, কাজেই শুভাশুভ মিশ্রিত ফল তাঁকেই বহন করতে হয়, বহু শিল্পী সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় ব্যালে। কাজেই ব্যালের ক্ষেত্রে কোরিওগ্রাফারের অসামান্য ভূমিকা। বাশ্চাম্প যখন প্রাথমিক পাঁচটি পায়ের অবস্থান নির্ণয় করলেন তা প্রতিটি ব্যালে-শিল্পীদেরই অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু শিল্পী যেহেতু নারী তার পোষাক জমকালো এবং পোষাকের ভারও অবর্ণনীয়। ফলতঃ পদক্ষেপের কিছুই দেখা গেল না, এছাড়াও ছিল মুখোশের ব্যবহার যার দ্বারা শিল্পীর সমস্ত মুখ আবৃত থাকত, কাজেই কোনরকম বিশেষ মুখভাবও দর্শকদের দৃষ্টি গোচর হত না, এই যখন ব্যালের অবস্থা সেই সময় ১৭২১ সালে ব্যালের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হলেন মেরী ক্যামারগো (Marie Camargo), তিনি শুধুমাত্র পদক্ষেপগুলি দর্শনীয় করে তোলার জন্য স্কার্টের ঝুল কয়েক ইঞ্চি কমিয়ে দিলেন, কিন্তু এর জন্য তাকে অনেক কলঙ্ক ভোগ করতে হয়েছে। সেই সময় না তার অনেককাল পরেও এর ভাল ফল দেখা গেল না, স্কার্ট ছোট করার রীতি বেড়েই চলেছিল কিন্তু ব্যালের পরিবেশনের পর কোনোও নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের দেখা মিলল না, বরঞ্চ দর্শককে এক ধরণের কামাত উত্তেজনায় উত্তেজিত করে তুলল এই অনুষ্ঠান এবং একটি অলিখিত প্রতিযোগীতা চলল অলঙ্কৃত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে নৃত্যের ব্যাকরণের। এর কোনও সুসমঞ্জস সমাধান ঠিক সেই সময় পাওয়া যাচ্ছিল না। এর পর ব্যালে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল জে, জি নোভার (J G Noverre)। তার জন্ম হয়েছে ১৭২৭ সালে। তার বয়স যখন তেত্রিশ তখন তিনি ব্যালের শিক্ষকরূপে পরিচিত এবং সেই সময়েই প্রকাশিত

হল ব্যালে সম্পর্কে তার মতামত। ১৭৭৪ সাল অর্থাৎ পঞ্চদশ লুইয়ের মৃত্যুর আগে প্রধাণতঃ নোভারের জন্যই ব্যালের ক্ষেত্রে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিও ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। তিনিই প্রথম বললেন, ব্যালে হল একটি তাৎপর্যমণ্ডিত শিল্প যার মাধ্যমে নৃত্যের অন্তর্নিহিত ভাব ও শিল্পের আত্মা শিল্পীর চোখের মধ্যে দিয়েই প্রকাশময়, কাজেই মুখোশের কি প্রয়োজন? সেই মুহূর্তে আঙ্গিক কলাকৌশলই সব নয়, এমনকি গৌণও বলা যায়। নোভারের এই মতামত ব্যালের আকাশে ঝড় তুলল, তথাপি নৃত্যের সময়ই হাসিকান্না অভিব্যক্তির যে মূল্য দিলেন নোভার তার ফলে ধীরে ধীরে মুখোশের তিরোভাব আসন্ন হয়ে দেখা দিল। কারণ প্রকৃত ব্যালের রচয়িতা ও সমঝদার যাঁরা তাঁরা নোভারের মতকে সাদরে আহ্বান জানালেন। যাই হোক্, নারীর ভূমিকায় নারীর অভিনয়, পোষাকের অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য কমে যাওয়ায়, মুখোশের তিরোভাব আসন্ন হওয়ায় ব্যালে খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকল অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে।

অষ্টাদশ শতকের অবসানের পর পরই ব্যালে আরেকটি কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হল। শিল্পীরা পায়ের গোড়ালিতে বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্টের উপর ভর দিয়ে অথবা কোন একটি মাত্র নির্দিষ্ট বিন্দুতে নিজের শরীরের ভার রেখে নৃত্য অভ্যাস করতে লাগলেন। নৃত্যের এই কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে কৃতিত্ব লাভ করার দাবী করতে পারেন সিনোরিনা তাগলিওনি (Signorina Taglioni)। দৈহিক সৌন্দর্য, আত্মিক সৌন্দর্য ও আঙ্গিক কলাকৌশল এই ত্রিধারার মিশ্রণে নিখুঁত নৃত্য-প্রদর্শনের অধিকারী হলেন তাগলিওনি, ব্যালের ইতিহাসে এক নূতন যুগের অবতরণা করলেন তিনি, ১৮৩২ সালে তাঁর লা সিলফাইড (La Silphide) নামে ব্যালের প্রদর্শনীতে। এরপর তাগলিওনিরই একজন উপযুক্ত শিষ্যা, তাঁর নাম এমা লিভ্রি (Emma Livry), ব্যালেকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শোচনীয়ভাবে মাত্র ২১ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় ইওরোপের ব্যালের ইতিহাসের অগ্রগতির সূর্য কিছুটা অস্তমিত হল, তবে এর পরে ব্যালের ইতিহাসে ঝড়ঝঞ্ঝার আর বিশেষ অবকাশ ছিল না। ইতিমধ্যে নোভারের ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়েছেন অনেক জায়গায়, তাঁদের ইতিহাস ব্যালের ক্ষেত্রে কোনটি উজ্জ্বল সংযোজন, কোনটি প্রভাহীন জ্যোতিষ্ক।

এরপর রাশিয়ার ইতিহাসে ব্যালের বিচরণ শুরু হল। ফ্রান্সের অধিবাসী ম্যারিয়স পেতিপা (Marios Petipa) এলেন ১৮৪৭ সালে। ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সুপরিচিত নেত্রী। আশ্চর্যের বিষয়, রাশিয়ান ব্যালের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে ছিল তাঁর মৃত্যুকাল ১৯১০ সাল পর্যন্ত। বড় কম সময় নয়। এরপর রাশিয়ার পরবর্তী যে নৃত্যশিল্পীরা ব্যালের জগতে অবতীর্ণ হলেন তারা অধিকাংশই পেতিনার অবদান এবং ব্যালের জগতে রাশিয়ার প্রবল উন্নতি এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবে ফ্রান্স, রাশিয়া ত আছেই, এছাড়াও আমেরিকা, ডেনমার্ক, ইংল্যাণ্ড ব্যালের ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস রচনা করেছে। কিন্তু ইতালি থেকে রাশিয়ায় যে ব্যালের বিবর্তন তার সংক্ষিপ্ত মূল ইতিহাস হল এই।

পেতিনার অবদানের ফলে রাশিয়ার ব্যালে হল নিখুঁত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাঁকে এর জন্য সর্বাংশে অভিনন্দন জানানো যায়। শিল্পের অবদানের ক্ষেত্রে শিল্পীর জীবৎকালও কম উল্লেখ্য নয়, পেতিনা এই ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের দয়ার অধিকারী হয়েছিলেন। তরপর পেতিনা এবং তাঁর শিষ্যবর্গ-রচিত ব্যালেই নানা ভাষায় অনূদিত হল। তবে ১৯৪০ সালের পর পাশ্চাত্যের সব দেশেই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যালেরও উন্নতি শুরু হয়েছে। পৃথিবীর এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াতের পথ সুগম হয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরান, দক্ষিণ আমেরিকা, জাপান প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্যালে সম্প্রসারিত হয়েছে। কারণ ব্যালে-শিল্পীরা কেউ কেউ জীবিকার অন্বেষণ বা নিছক কৌতূহলে বা শুধুমাত্র নূতনত্বের নেশায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছেন, ফলে সেখানে ব্যালের ভিন্ন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

অষ্ট্রিয়া, জার্মানী এবং সুইডেনে ব্যালের প্রচলন আছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়ায় এই দেশগুলি সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে পারেনি, তার প্রধান কারণ জীবিকার অন্বেষণে পুনর্বাসনের প্রচেষ্টায় এই সব দেশের অধিবাসীরা নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।

ব্যালের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসই থেকে যাবে অসম্পূর্ণ যদি আনা পাভলোভার (Anna Pavlova) নাম এখানে অনুল্লেখিত থেকে যায়। আনা পাভলোভার জন্ম হয়েছে ১৮৮১ সালে, রাশিয়ায়। জন্মগতভাবে পাভলোভা

রাশিয়ার অধিবাসী। ব্যালের শিক্ষা ও প্রদর্শনীর শুরুও তাঁর সেখানেই। কিন্তু হৃদয়ঘটিত কারণে এবং আর্থিক আনুকূল্য লাভের আশায় দেশত্যাগ করেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল উদাহরণের যোগ্য। অতি সাধারণ ভাবে এবং অত্যন্ত সাধারণ ক্ষেত্রেও বলা যায় এমনকি, হাটে-মাঠে তিনি তাঁর নৃত্য প্রদর্শনী করাতে সক্ষম ছিলেন। ১৯০৯ সালে তিনি ডায়াগিলেভের (Diaghilev) দলে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আত্মসম্মান, আভিজাত্যবোধ এবং উচ্চাভিলাষ থাকায় দলত্যাগ করে' নিজে নতুন দল গঠন করেন। অথচ ডায়াগিলেভ্ ব্যালের ক্ষেত্রে কোনও গৌণ অস্তিত্ব নয়। তাঁর সংস্পর্শে যত কোরিওগ্রাফার এসেছে তিনি প্রত্যেককে শিক্ষিত করে তুলেছেন। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, নিতান্ত যান্ত্রিক নৃত্যপ্রদর্শনের হাত থেকে ব্যালেকে ডায়াগিলেভ মুক্ত করে ছিলেন। সাজসজ্জার দিকে ডায়াগিলেভের প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাঁর অন্য বৈশিষ্ট্য ছিল দলের প্রতি লোককে সঠিক পথনির্দেশ করতে সক্ষম হওয়া। মনে হয়, পাভলোভা স্বীয় বুদ্ধিমত্তার জোরে নিজের জন্মগত গুণের সঙ্গে ডায়াগিলেভের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির এক অপরূপ সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার ফলে তিনি হয়েছিলেন জগৎজোড়া খ্যাতির অধিকারী এবং তাঁর পূর্বে এই অতুলনীয় সম্মানের অধিকারী আর কেউ হয়েছিলেন বলে শোনা যায় নি।

আনা পাভলোভার নাম আর এক কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই নৃত্যপটিয়সী আমাদের দেশের এই সময়ের নতুন এক শিল্পীর সঠিক পথনির্দেশ করেছিলেন। সেই শিল্পী হলেন উদয়শংকর। ১৯২০ সালের ১৯শে আগষ্ট উদয়শংকর ভারতবর্ষ ত্যাগ করে' লণ্ডনের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। লণ্ডনে দুই বৎসর তিনি অংকন শিক্ষা করেন, এরপরই তাঁর পরিচয় হয় পাভলোভার সঙ্গে।

ব্যালে হল সংগীতজ্ঞ, চিত্রকর ও কোরিওগ্রাফারের সম্মিলিত রূপ। এঁরা প্রত্যেকেই পৃথক ব্যক্তি হন অধিকাংশ ব্যালের ক্ষেত্রে। কিন্তু পাভলোভা উদয়শংকরের মধ্যে এই তিনজনের সমাবেশ দেখেছিলেন, অথচ উদয়শংকর সেই সময়ে ব্যালের অ-আ-ক-খও জানতেন না, আর ব্যালে কেন, ভারতবর্ষের নৃত্যের বহুতর শাখার কোনটির সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল না। তথাপি পাভলোভা তাঁকে

টেনে আনলেন এক শিল্পেব ক্ষেত্র থেকে আর এক শিল্পেব জগতে, বললেন শিল্পীব পথ কোনও ধরা বাঁধা নিয়ম মেনে চলে না। ফলতঃ, তাঁবই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে চললেন সেদিনেব নগণ্য শিল্পী, অথচ তিনি আজ বিশ্বশিল্পেব ক্ষেত্রে একটি অতি পবিচিত নাম। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যুতে ভাবতবর্ষেব নৃত্যশিল্পেব একটি যুগ অবসিত হ'ল।

১৯৩১ সালে মাত্র ৫০ বৎসব বয়সে মৃত্যুববণ কবেন পাভলোভা। তাঁব মৃত্যুতে ব্যালের জগতেব এক বিস্ময়কর প্রতিভার অবসান ঘটে। এখন ব্যালে তার নিজের পথে এগিয়ে চলেছে। আমাদেব দেশেও তাব যাত্রা শুরু হয়েছে, তবে প্রচেষ্টা এবং তাব প্রদর্শন নিতান্তই শিশুসুলভ। কাজেই এর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা কবাব সময় এখনও আসে নি।

সুচেতা চৌধুবী

কবিতা কবিতা

[বাংলা দেশের একমাত্র কলকাতা শহরেই কাব্যচর্চা হয় না, গঞ্জে-গ্রামে, এমন কি যেখানে রেল যায় না বাসও ধুলো ওড়ায় না, সে সব দূর পাড়াগাঁয়েও বহু কবি নীরবে কাব্যচর্চা করে থাকেন। মফঃস্বল শহরে চটি চটি পত্রিকাগুলিতে তাঁদের কবি-প্রতিভা ও নিষ্ঠার আশ্চর্য স্বাক্ষর থাকে।

বৈশাখ-আষাঢ় '৮৪ থেকে প্রতি সংখ্যায় আমরা বাংলাদেশের অজস্র লিটল ম্যাগাজিন থেকে এমনি সঞ্চয়ন প্রকাশ করছি। তরুণতম কবিমহলে এই নতুন সংযোজন এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দলিল হয়েছে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে চিঠি আসছে। এই সব কবিতা তথাকথিত বড় বড় পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলির চেয়ে কাব্যের প্রসাদগুণে কোন অংশেই খাটো নয়। এবং, এই কবিরা শহুরে কবিদের সঙ্গে সমান আসন দাবী করেছেন সহজেই। অতি-পরিচিত কবিদের কবিতা প্রকাশিত হবে না। বাংলাদেশে উত্তরসূরি পত্রিকাই আবার কাব্য-আন্দোলনে নতুন করে পথ দেখালো। স: উত্তরসূরি]

অর্চনা দাস স্বপ্নে বিষন্নতা

তোর কাছে দাঁড়িয়েছি ছাখ সব নির্মোক ছেড়ে।
নীরব জ্যোৎস্নার ভেতরে আহত আকাঙ্ক্ষা
ছত্রাখান পড়ে আছে
আমার বুকের খাঁজে মুখ ডুবিয়ে অঘ্রাণের রোদে
আনত তোর ওই প্রশান্ত অহংকার
খণ্ড ছিন্ন টুকরো টুকরো হয়ে।

[সৈনিকের ডায়েরী মে-জুন ১৯৭৭]

প্রণব মুখোপাধ্যায় : এবার বৃষ্টি

এখনো তাহলে বসন্তের কোকিল ডাকে বাগানে, কবিতা লেখা হয় ?
জলজ কল্মীদামের বুক ছুঁয়ে ঝুঁকে পড়ে আকাশের নক্ষত্র
মাঝরাতে ? এখনো তাহলে
সুদৃশ্য অ্যালবামে কিশোরী গুছিয়ে রাখে স্মৃতি ?
সুটকেসের গুপ্ত খোপে নীল চিঠি ?
দৈনিকপত্রের খবর শম্পার বুকের ছেঁড়াপাতায়।
কোথায় দমকল ? দমকল ?
এবার বৃষ্টি নামুক। শিরায় শিরায় টাইফুন ঝড়। এখনো কবিতা
লেখা হয়। আমরা ভালবাসি।

[সীমন্তিক, হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি , ৯ম বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যা]

দীপক চক্রবর্তী : বাগানে

আমি এখন আর বাগানে যাই না।
চোখ বুঁজলেই দেখতে পাই সবুজ ঘাসের
উপর অবিরল কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল।
এখন আমি মোমবাতির খেলা দেখি।
গলে যাওয়া মোমগুলি টলমল করে, গা
বেয়ে নামতে নামতে, মাটিতে পড়ার আগেই
জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যায়।
আমি চোখ বুঁজলেই দেখতে পাই,
বিরাট কৃষ্ণচূড়ার গায়ে আমাদের
সুখ-দুঃখগুলি নামতে নামতেই
নামতে নামতেই

[নির্ণয়, নবপর্যায় ১ম সংখ্যা ১৩৮৪, কলকাতা ৫৪]

অলোকনাথ মুখোপাধ্যায় : দিনলিপি

একে একে ছেড়ে যেতে হবে সব কিছু
ছেড়ে যেতে হবে এই বিছানা বালিশ, কলকাতা।
এই তো এখানে আমি একা একা—বৃষ্টির ভেতরে ভিজে যায়
দোতলা বাড়ির শার্সি, কিশোরীর ফ্রক ও পাজামা—এ সবের
মধ্যে আছি, তবু একা, তবুও আলাদা
বারান্দায়, বাথরুমে, ঘরের জানালায় আছি, পথ ও পথিকের
মাঝখানে জেগে আমি
এই থাকা, মাখামাখি, একে ও অন্যকে জড়িয়ে বেঁচে থাকা—
তবু সব ছেড়ে যেতে হবে।

[কবি, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, হিন্দমোটর, হুগলী]

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক

[কবি যোগব্রত-স্মরণে]

বার্ষিক বিবরণী পড়া শেষ হয়ে গেলেও
আমরা বসেছিলাম কক্ষে, ভেবেছিলাম
আরও কিছু কাগজ বেরুবে তাঁর পকেট থেকে
এবং তিনি তা পড়বেন। নাটক জমল, যখন তিনি
আমাদের কিছু পড়তে ডাকলেন—
আমরা পড়লাম কবিতা নয়, অডিট-রিপোর্ট।
মৃত্যু এসে তখন মৃত্যুবার্ষিকীর কথা শোনাল,
দম্পতিরা শোনাল বিবাহবার্ষিকীর দিন
তাদের পিঠ ফিরিয়ে ঘুমনোর গল্প,
সম্পাদক বাড়ি ফিরে ঘুমোতে গেলেন তারপর—
বিছানায় তাঁর জন্যে রোজ অপেক্ষা করে থাকে একটা কুমীর।
অডিট-রিপোর্টের পাতা মুখে নিয়ে সে তার দিকে
ক্রমশঃই এগিয়ে আসতে থাকে।

[সংক্রান্তি, মেদিনীপুর, কবিপক্ষ, ১৩৮৪]

শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত : এবং নিরবধি

নিরন্তন অশ্বারোহী দবোজায় দেয় টান , শুনকান উঠোন পেরিয়ে৷

লালধুলো উড়ে আসে জানালাব গায়ে

হুঁশিয়াব শব্দ সংকটে ঘুবে পড়ে, শুদ্ধ যুবক

ডান হাতে তার অশ্বের নিখুঁত খুরেব দাগ—

নিরন্তব ধাবমান, ছুটে যায় বিদ্যুৎগতি

দরোজার পাল্লা দু'হাট, বিকেলের মন্ত্রেব সাথে

আমি জানি পথিবীব ঝুঁকে-পডা শোক

ঝরঝার বৃষ্টি নিযে আসে

বুকে দেয করতালি, লাগামেব তীক্ষ্ণ চাবুক

কেটে পড়ে যুবকেব গায—

মেহনত ব্যর্থ হয়ে যায

নিবন্তর অশ্বারোহী দরোজায দেয টান

শুন্‌কান উঠোন পেরিয়ে ভেসে আসে যুবকের গান ॥

[সময়ানুগ কলকাতা, এপ্রিল ৭৭]

পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী : আমন্ত্রণ

এখনো তোমরা কেন অকরুণ শুয়ে আছ অন্ধকাব ঘরে

দরজা খোল, দ্যাখো

সবুজ দাঁড়িযে আছে কপালে খযেব টিপ পবে

আঁচলে ঝর্নাব পাড,

সমস্ত শরীর জুড়ে কোমল পর্বত তার

সবুজে মাথানো।

সবুজ হৃদয়ে যজ্ঞ

হাজার সূর্যেব আলো শুযে নিযে

ফুটবে ডালিম ফুল

তোমাদের হৃদয়ের গোপন বাগানে।

[বনমহল, দমনপুর, জলপাইগুড়ি ১৩৮৪]

শুভাশিস মৈত্র : ব্যর্থতা

কথা দিয়েছিলাম
গোলাপের দেশে নিয়ে যাবো।
শেষবার দেখা ক'রে
বলেছিলাম
শেষ রাতে চৌকাঠে দাঁড়িও—
ফিরে আসবো বসন্তকে নিয়ে।
বসন্ত নয়
আমিই ফিরেছি একা।
এখনও শীত,
শীতের বরফে ছেয়ে যাচ্ছে শিশুদের মুখ ॥

[কবিকণ্ঠ, কলকাতা ৩২ , জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭]

সন্তোষকুমার মাজী : তাৎক্ষণিক

সে এইমাত্র
ছুটিয়ে দিল তার তড়িৎগতির অশ্ব
উড়িয়ে দিল প্রণয়পুটের ভোমরা
খুলে দিল লুপ্ত-স্মৃতির অর্গল
তোমরা হতবাক্ হোয়ো না
প্রজ্ঞার সমিধে এখানেই যজ্ঞ হবে
গড়ে উঠবে প্রাসাদ, যাত্রীনিবাস
তোমরা রেখে যাও তোমাদের তির্যক ছায়া
ভুজ কোটীর পরিমাপ, অয়নবৃত্তের ব্যাস
অবস্থানের মুহূর্ত
তোমরা হতবাক হোয়ো না
স্বতঃসিদ্ধ এখানেই গড়ে উঠবে প্রাসাদ, যাত্রীনিবাস।

[স্মৃতিসত্তা, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ , ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৮৪]

রাজেন উপাধ্যায় : কার্পেট পুড়ছে ধীরে ধীরে

স্বল্প বিরতির পর আবার নাটক জমেছে—
আশ্চর্য 'দৃশ্য' ভেবে সকলে
ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছে,
নাটমঞ্চে, দর্শকের ঠাসা গ্যালারিতে
অর্ধেকের বেশি মানুষ ঝুঁকে প'ড়েছে
সামনের দিকে,
একজন প্রৌঢ় ভি-আই-পি চেনের শক্ত বাঁধন হাতে লেপটে
টেনে ধ'রে আছেন নিজের উত্তেজিত
বিশাল কুকুরটিকে
ডানপাশে বেহুঁশ আঙুল ফস্কে
কখন সিগ্রেটের টুকরো নিচে প'ড়ে গেছে
যুবকের ভ্রূক্ষেপ নেই,
—কার্পেট পুড়ছে ধীরে ধীরে

[বিদিশা, মাঘ ১৩৮৩]

শিল্পী হরেকৃষ্ণ বাগ

জন্ম: ১৯৪০। শিক্ষা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং পরে শান্তিনিকেতন কলাভবন থেকে শিক্ষালাভ। বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কন বিভাগে অধ্যাপনায় নিযুক্ত। শ্রীবাগ একজন কৃতী ছাত্র এবং কৃতী শিল্পী হিসাবে পরিচিত। তিনি বিশেষ ভাব গ্রাফিক্ আর্টে তাঁর পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। বহুবার তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শিল্প-প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

বিভিন্ন প্রদর্শনীতে প্রায় সবরকম বিভাগে তার শিল্প পরিচয়ের স্বাক্ষর রয়েছে। যদিও গ্রাফিক শিল্পে তাঁর দক্ষতার পরিচয়ের কথা সকলেই জানেন, তথাপি কাঠ-খোদাইয়ের কাজ তিনি কত সুন্দরভাবে করতে পারেন, তার স্বাক্ষর এই চিত্রে পরিস্ফুট। কাঠ-খোদাই এর টেক্‌নিক কত সুন্দর ভাবে কাজে লাগাতে পারেন এই চিত্রটি তার স্বাক্ষর রেখেছে।

অসীম কুমার ঘোষ

অরুণ ভট্টাচার্য : ঋগ্বেদের সূক্ত

আমাদের হোক
দুগ্ধবতী ধেনু দ্রুতগতি অশ্ব
আমাদের গৃহ শোভাবর্দ্ধন করুক
সৌন্দর্যশালিনী নারী,
আমাদের সংসার হোক্
মধুময়
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তে
আমাদের প্রকৃতি হোক্
প্রাণোচ্ছলা।
আমরা স্নান করি সূর্যকণায়
অবগাহনে পরিশ্রুত হই।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত : মিরোশ্লাভ হোলুব

বলো তো
নেপোলিঅন কবে জন্মেছিলেন
শিক্ষক শুধান।

এক হাজার বছর আগে,
না, না একশ বছর আগে,
ছাত্রদের উত্তর।
কেউ সঠিক জানে না।

বলো তো
নেপোলিঅন কি কি করেছিলেন
শিক্ষক শুধান।

তিনি যুদ্ধে জিতেছিলেন,
না, না, তিনি যুদ্ধে হেরেছিলেন,
ছাত্রদের উত্তর।
কেউ সঠিক জানে না।
একজন বলল :
স্যর, আমাদের পাড়ার কসাইটির
একটা কুকুর ছিল, নাম নেপোলিঅন,
কসাইটি তাকে মারত,
মার-খাওয়া কুকুরটা না খেতে পেয়ে
বছরখানেক আগে
মারা গেছে।

কুকুরটার গল্প শু'নে ছেলেরা ভাবল
বেচারা নেপোলিঅন!

প্রদ্যুম্ন মিত্র : লরেন্স

চাঁদকে এনে দাও আমার পায়ের কাছে
রাখো আমার পা
ঈশ্বরের মত ওই শশি-কলায়।
ওকে ধুইয়ে দাও জ্যোৎস্নায়
এই আমার নোংরা গোড়ালি
যাতে নিশ্চিত চাঁদ-মাখানো
শীতল আর দীপ্তচরণ,
যেতে পারি আমার লক্ষ্যে
কারণ সূর্য এখন আরতি
তার মুখ লাল সিংহের মত।

কবিতার ভাবনা [৫]

অরুণ ভট্টাচার্য

যতদূর মনে পড়ে, প্রথম ইংরেজী কবিতা, যা আমাদের শৈশবে আকর্ষণ করতো, তা হচ্ছে :

Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are

—এই ছোট কবিতাটির প্রত্যেকটি শব্দ আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হত, এমনকি 'twinkle' শব্দটি যে দুবার ব্যবহৃত হয়েছে তা যেন শুধুমাত্র ছন্দের আকর্ষণ বা অনুপ্রাসের খাতিরে নয়, দুবার না বল'ল আকাশের নক্ষত্রগুলির মিটিমিটি চাওয়া যেন শেষ হ'ত না। আর সেই তারাটা ছোট, দূর থেকে দেখতে ছোট বলে নয়, মনে হ'ত সে তো ছোট হবেই—না হলে আমার মত ছোট ছেলের সঙ্গে তার সখ্যতা কেমন করে সম্ভব। বাংলা কবিতার মত ইংরেজী কবিতাতেও আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। তবে সে রূপকথার রহস্য নয়, প্রকৃতির রহস্য। আগেই বলেছি রূপকথা উপকথার দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ, সাহেবদের দেশের ডানাকাটা পরীরা যেন অন্য জাতের, তারা আমাদের মন ভোলাতে পারত না। কিন্তু 'little star'-এর রহস্যময়তা আজও ভুলতে পারিনে।

এই কবিতাটির পর পরই, আর একটু বড় হয়ে, যে কবিতাটি আমাদের মনোহরণ করতো তা' হচ্ছে ব্লেকের সেই বিখ্যাত রচনাটি **'The Tyger'**, **'Tyger! 'Tyger! burning bright**—(মনে পড়ছে বানান ছিল **tiger** শিশুরা যা বুঝবে)।

এটুকু মাত্র পড়তেই সমস্ত শরীরে শিহর জাগতো। কেন? সেই শিশুবয়সে উইলিয়াম ব্লেকের কবিতার অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা বোঝবার, অথবা তাঁর প্রতীকী জগৎ সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব ছিল না, ব্লেকের কবিতা শুধু যে **Song of experience** তাই নয় (এই কবিতাটি এই খণ্ডের অন্তর্গত, জিওফ্রে কীনস্

তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে কবিতাটির দুটি পাঠান্তর দিয়েছেন) Song of innocence ও বটে। অন্তত আমার কাছে তো তাই মনে হয় এখন পর্যন্ত। মূলত ব্লেক শৈশবকালেরই প্রতীক। নাহলে অমন Tyger এর যে গড়ন, যাকে কবি বলছেন, 'Fearful symmetry', তা নাকি পুরোপুরি ferocious নয়, অন্তত এক সমালোচক বলেছেন, তাঁর আঁকা ছবি দেখে, 'The tiger in Blake's illustrations of this poem is notoriously lacking in ferocity and critics have sometimes concluded that Blake was unable to seize the fire required to draw fearful tiger, ডেভিড এর্ডম্যান সাহেবের বক্তব্য বড় হয়ে পড়েছি, কিন্তু তিনি সত্যি কথাই বলেছেন, tyger যদি ব্লেক ভয়ংকরের প্রতীক পুরোপুরি না করতে পেরে থাকেন তবে এজন্যেই তা পারেন নি যে কবি নিজেই শিশুর জগতে বাস করেছেন, ভয়ের সঙ্গে রহস্যময়তা মিশিয়ে কারুণ্যের ছবি আঁকছেন তিনি, lamb হচ্ছে innocenceএর প্রতীক—সেই মেষশাবকের কথা ব্লেকের কবিতায় বারবার এসেছে, এমনকি এই কবিতাটিতেও তিনি শেষমেশ এসব পংক্তি না লিখে পারেন নি 'Did he who made the lamb make thee? অর্থাৎ স্রষ্টার কাছে tiger এবং lamb ভয়ার্ত বিভীষিকা এবং নিষ্পাপ সরলতা এমনতর বিপরীতধর্মী প্রতীক হলেও বস্তুত একই ধাতুতে গড়া।

শিশুমনকে এদুটি জিনিষই ভয়ানক টানে. ব্লেক শিশুর অন্দরমহলে সরাসরি পৌঁছে যান। আমিতো ব্লেকের প্রভাব সেই থেকে আজও কাটাতে পারি নি, এই বয়েসেও। আমার কবিতায় তাঁর কাব্যশৈলীর প্রভাব কতটা পড়েছে জানি না, হয়তো পড়েছে। কবি এবং গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত প্রায় সতেরো আঠারো বছর আগে আমার কাব্যগ্রন্থ 'মিলিত সংসার' এক একটি দীর্ঘ সমালোচনা করেছিলেন। তাতে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, আমার কবিতা পড়লে ব্লেকের সারল্যের কথা ওঁর মনে পড়ে। ঠিক এই ধরণেরই উক্তি করেছিলেন আমার আর এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু, প্রাবন্ধিক এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যবিভাগের প্রধান শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য। দেখা যাচ্ছে, আমার ভেতরে এমন কিছু হয়তো আছে যা আমার লেখাকে ব্লেকের কবিতার আভাষ ইংগিতের কাছাকাছি এনে দেয়। ব্লেকের কবিতার প্রতি আমার অসীম

দুর্বলতার অন্য কারণ, জীবনকে আমি সরলতায় রূপান্তরিত দেখতে পেলে খুশি হই। আমার কবিতাকে সেই ভাবেই সাজাবার চেষ্টা করি।

খুব সম্প্রতি অধ্যাপক অমলেন্দু বসুর একটি প্রবন্ধ পড়বার সুযোগ হলো। তাঁর লেখার আমি ভক্ত। প্রথমত, তিনি যা প্রকৃতই জানেন তাই তাঁর আলোচনার বিষয়, নিজের অভিজ্ঞতা বা অধীত বিদ্যার বাইরে গিয়ে 'চালাকি' করতে জানেন না, যেটা আজকের প্রায় যুগধর্মে পর্যবসিত হয়েছে। এর জন্য অবশ্য আমাদের দৈনিক সংবাদপত্রের অপরিসীম অবদান রয়েছে, খবরের কাগজ আমাদের শিখিয়েছে কত কম পড়ে কত বেশী পণ্ডিতী করা যায়, সে আরো শিখিয়েছে আমাদের 'চালাক' হতে, শব্দের চতুরালি অসংযত অশোভন ব্যবহার শেখাতে। বর্তমান সভ্যতায় সত্যি দৈনিক সংবাদপত্রের এই অবদান অদ্ভুত, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে তুলনারহিত। সংবাদপত্রের লোক হলে তাঁদের সবই জানতে হবে। পেলে'র বল পাশ দেবার কৌশল থেকে বায়োকেমিস্ট্রির আধুনিকতম গবেষণা তাঁদের নখদর্পণে। এমন সবজান্তা মানবগোষ্ঠী এই শতাব্দীর আগে আর জন্মায় নি পৃথিবীতে। সব দৈনিকপত্র বা সব সাংবাদিকই যে এ গুণে বিভূষিত তা বলি নে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। যাই হোক, অমলেন্দু বসু সেই স্বল্প লেখকদের অন্যতম যিনি লেখার আগে স্থির থাকেন তার 'লিমিটেশনস্' এর বিষয়ে। অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব বিষয়ে তিনি প্রকৃতই কিছু জানেন, যা আমাদের প্রেরণা জোগায়, কিছু বুঝতে জানতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, প্রাবন্ধিকের যা গুণ অবশ্যই বর্তমান থাকা আমি প্রয়োজন মনে করি তাঁর মধ্যে পুরোপরি তাই রয়েছে, অর্থাৎ বিষয়বস্তু এবং সমালোচকের বক্তব্যের মধ্যেকার বৈজ্ঞানিক কার্যকারণবাদের স্বাক্ষর। এখানে বৈজ্ঞানিক অর্থে আমি 'লজিক্যাল' মনে করছি। তৃতীয়ত, তাঁর ভাষা খুব সরলীকৃত নয়, কিন্তু সহজ, আবেদন,—বুদ্ধি এবং মননের কাছে। এ সমস্ত কারণে বর্তমান সময়ে আমি তাঁর সমালোচনাকে সবচেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে থাকি। তাঁর লেখাটির নাম 'কাব্যে সারল্য'। বন্ধুবর অমূল্য চক্রবর্তী-সম্পাদিত 'সংস্কৃতি পরিক্রমা' পত্রিকায় লেখাটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। অমলেন্দু বসুর প্রবন্ধে নিম্নলিখিত লিখিত প্রশ্নগুলি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন :

১. সারল্য (কি) হচ্ছে কাব্যের, এমনকি যাবতীয় শিল্পেরই মস্ত গুণ ?

২. সারল্যের লক্ষণ কি ?

৩. ভাবের মাধ্যমে সরল হয়েছে বলেই যে ভাবও সরল এমনটি নয়।

৪. রবীন্দ্রনাথ ও টেনিসনের কবিতা (উদ্ধৃত কবিতাবিষয়ে) একরূপে সরল অন্যরূপে গভীর।

৫. এই সারল্য পরিপূর্ণ জীবন-অভিজ্ঞতার শুদ্ধতম নির্যাস, একেই বলেছিলাম 'নিরাভরণ কাব্য।'

৬. সারল্য ও গভীরতার সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায় প্রায় যাবতীয় মহৎ শিল্পকর্মেই। সহাবস্থান কিন্তু সমধর্মিতা নয়।

এই প্রশ্নগুলি এবং বক্তব্যগুলি রাখবার পর তিনি রবীন্দ্রনাথ এবং টেনিসন ছাড়া আমার সমকালীন কয়েকজন কবিদের কবিতার পংক্তি তুলে বিষয়টি পরিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন। আমি তার থেকে বেছে বিশেষ করে তিন-জনের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করছি

ক. হলুদ পাতার গান, ঘরে ফেরা পাখী (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

খ লক্ষ্মীর পা উঠোন জুড়ে (চিত্ত ঘোষ)

গ যদি ম'রে যাই

ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই (অরুণকুমার সরকার)

[প্রসঙ্গত, আত্মতৃপ্তির জন্য পাঠকদের বলি, আমার ক'একটি পংক্তিও তিনি উদ্ধার করেছেন।]

প্রথম কবিতাটির চিত্র বড় সুন্দর অথচ সরল, দ্বিতীয় কবিতায় মিথ ট্রাডিসন ইত্যাদি মিলে একটি সুন্দর ব্যাঞ্জনা, অথচ এও সরল, তৃতীয় কবিতায় অপূর্ব সংগীত, লিবিসিজিমের চূড়ান্ত অথচ সরল প্রকাশ—অর্থাৎ প্রতিটি কবিতাতেই পাঠককে কবিরা বহুদূর নিয়ে যান, এক একভাবে এবং গভীরভাবে। সুতরাং অমলেন্দু বসুর তিন নম্বর বক্তব্যের সমর্থন মেলে। ভাবের মাধ্যমে সরল হয়েছে বলেই যে ভাবও সরল এমনটি নয়, ছ'নম্বর বক্তব্য সারল্য এবং গভীরতার সহাবস্থান, কিন্তু সহধর্মিতা নয়।

এত সব কথা বললাম এজন্যই ব্লেকের কবিতায় ফিরে আসব বলে' ৳ ওয়ার্ডস্‌ওয়র্থ এর প্রসঙ্গ অধ্যাপক বসু এনেছেন, আমিও আনতে যাচ্ছি

কেননা কাব্যে সারল্য, অনুভূতির সারল্য বিষয়ে আলোচনা কালে প্রথমেই আসে ওয়ার্ডস্ওয়র্থের নাম। ব্লেকের সারল্য অনুভূতির সারল্য, প্রকাশের সারল্য সব সময় নয়, অথচ ওয়ার্ডস্ওয়র্থের সারল্য অনুভূতির এবং প্রকাশের, এই উভয়বিধ। 'লুসি' বিষয়ক কবিতাবলী যা আমরা স্কুলজীবনেই কিছু কিছু পড়েছি, 'নীচ গ্যাদাবাবের' চিত্র বা 'উই আর সেভেন' জাতীয় কবিতার সরল স্নিগ্ধ অনুভূতি সহজ প্রকাশ মাধ্যমেও সহজ গভীরতায় আবিষ্ট। বস্তুত এর সঙ্গে ব্লেকের মিষ্টিক ভাবনা যুক্ত হলেই আমি সবচেয়ে আনন্দ পেতুম—যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' কবিতাটিতে ধরে রাখতে পেরেছেন। 'সোনার তরী' কবিতাটির সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব, দুরূহ ব্যাখ্যা সম্ভব, প্রতীকী ব্যাখ্যাও সম্ভব। যা পাঠকের ইচ্ছে। যেমন শ্রাবণের জলভরা আকাশে ঘুড়িকে যতদূর ছেড়ে দেওয়া যায়—ততদূর যায়। তেমনি ততদূর রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'কে কল্পনা করে নেওয়া যায়, অথবা তাঁর গীতাঞ্জলি-পর্যায়ের কবিতাগুলি। শেষ বয়সের লেখা 'রূপনারায়ণের কূলে' কবিতাটিতে অমলেন্দুবাবুর দৃষ্টি পড়েছে, খুবই স্বাভাবিকভাবে। এই কবিতাটি আমারও বিশেষ প্রিয়, অতি সহজে কবিতায় যে গভীরতা এবং একই সঙ্গে ব্যাঞ্জনা তা একমাত্র বড় কবির পক্ষেই সম্ভব। বহুদিন পূর্বে প্রকাশিত একটি আলোচনাসূত্রে আমি এই কবিতটি সম্বন্ধে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। অথবা 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতাটি সম্বন্ধে এই জাতীয় মন্তব্য অসমীচীন হবে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি প্রবন্ধে টেনিসনের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গ এনে বলেছিলেন এই সত্য উপলব্ধি এবং গভীরতার কথা, 'Out of the deep, my child, out of the deep'—এই কবিতার সঙ্গে 'প্রথম দিনের সূর্য' এবং 'দিবসের শেষ সূর্য' এই উভয় প্রশ্নের স্বাভাবিক মিল আছে। এই দুই কবিই জীবনের মহান জিজ্ঞাসায় আকুল হয়েছেন—উত্তর পান নি সম্ভবত। এই গভীরতা কি সরলতায় প্রত্যাশী?

ব্লেকের কবিতায় এই সরলতা আমাদের মুগ্ধ করেছে একদা, এখনো করে। করে তাঁর অপার বিস্ময়, অসীম বৈচিত্র্য। এই কবিতাটি সেই বয়েসে কী কী কারণে আমাদের মন হরণ করেছিল, আজ এই বয়েসে ভেবে দেখা যাক। একজন কবি 'টাইগার'কে সম্বোধন করে বলছেন, এই ব্যাপারটি একমাত্র শিশু জগতেই সম্ভব। আর কিভাবে সম্বোধন করেছেন—ইংরাজীতে যাযার ধ্বনি-সাযুজ্য দেখা

যাক্ ('i' এর পরিবর্তে 'y' ব্যবহারে উচ্চারণ প্রলম্বিত হয়েছে, 'ট', 'গ' ইত্যাদি অক্ষরের ধ্বনিতে একটা পৌরুষের চিহ্ন ফুটে উঠেছে—'burning bright'—বলাই বাহুল্য, আমাদের গভীর ভয়ংকর অন্ধকার জঙ্গলে মুহূর্তে নিয়ে যায় যেখানে বাঘের উজ্জ্বল চোখ দুটোই যেন সমস্ত অন্ধকারকে আলো করে' রেখেছে। পরের পংক্তিতে যে 'forests of the night রয়েছে তা আগেই কল্পনা করা যায় 'burning bright' এর অনুষংগে। আর তার গড়নকে সৃষ্টি করতে পারে কে? একমাত্র তিনি, যার immortal hand অথবা immortal eye রয়েছে। বাঘটির গড়নে 'symmetry', বলা যায়, সংগতি রয়েছে অথচ তা ভয়ানক,—ভয়ংকর তার রূপ সেই fearful symmetry'-র আংশিক কল্পনাও গভীর রাত্রে শিশুমনকে কোথায় টেনে নিয়ে যেত।

আমার তো এই বয়সেও মনে হয় কবিতাটি যদি এই চার পংক্তিতেই অর্ধসমাপ্ত থেকে যেতো (কোলরিজের অসমাপ্ত 'কুবলা খান' কবিতার মতো) আমার কাছে এর ভাব-অনুষংগ বিশেষ কিছু কমতো না। যে-পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রথম স্তবকেই, তা একমাত্র ব্লেকের মত মহান দু' চারজন কবির পক্ষেই সম্ভব। কবিতাটিতে আর কি কি শব্দ শিশু-চিত্তকে দোলা দিত বা গভীরে টানতো দেখা যেতে পারে

১. রাত্রির অরণ্যের কথা
২ মৃত্যুহীন দুটি হাত বা চোখ
৩. দূরের আকাশ বা গভীর সাগরদেশ
৪. চোখের জ্বলজ্বলে আগুন
৫. মৃত্যুর মত হিমশীতল ভয়াবহতা
৬. নিরীহ মেষশাবকের উল্লেখ
৭. এবং প্রথম স্তবকের শেষ দু পংক্তি

When the stars threw down their spears
And water'd heaven with their tears

অমলেন্দু বসু যে সারল্যের কথা বলেছেন, এখন দেখা যাক, ব্লেকের কবিতায় সেই জাতীয় সারল্য রয়েছে কিনা—এবং থাকলে তা একই সঙ্গে গভীর স্তরে আমাদের নিয়ে যায় কিনা। 'বাঘ' বিষয়টি তো সরল বিষয়—অর্থাৎ একটি প্রাণীকে নিয়ে কবিতা, তা সারল্যেরই প্রতীক। কিন্তু কোন্ রাস্তায় ব্লেক এই গভীরতায় পৌঁছেচেন। সেই বস্তুটি, মনে হয়, Vision, যে Vision মিষ্টিক

সাধকরা দেখে থাকেন, রবীন্দ্রনাথ 'জীবন দেবতার' কল্পনায় যাকে দেখেছেন ইয়েটস্ দেখতেন, আমারও দেখতে ইচ্ছে করে। কবি বা শিল্পী, ভাবুক বা রসিক তো এই vision নিয়েই বেঁচে থাকেন। অচিন্ত্যকুমার যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে 'কবি' বলেছেন, আমার তো মনে হয়েছে তিনি মা কালীমূর্তির এই একটি ভাবঘন Vision সর্বদাই প্রত্যক্ষ করতেন বলেই। ১৯৭০ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্লেক সম্পর্কে একটি সমালোচনার সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে যুগ্ম-সম্পাদক মশায়রা সেই বইয়ের নাম রেখেছিলেন Blake's Visionary Forms Dramatic, বইটির নাম 'Dramatic' না রাখলেও ক্ষতি ছিল না। বস্তুত তাঁর কাব্যে যা dramatic বলে সম্পাদকদের মনে হয়েছে তা তো ঘটনার নাটকীয়ত্ব নয়, ভাবের সঙ্গে দ্রষ্টার পরিণয়সূত্র। তা সংঘাত নয়, স্বপ্নের অনুস্মৃতি।

প্রায় উনিশ কুড়ি বছর পূর্বে লেখা আমার একটি কবিতা এপ্রসঙ্গে তুলে ধরি। যে-কবিতায় আমি সর্বপ্রথম, এবং আমার প্রায় অজান্তেই, এই ধরনের Vision এর একটি রূপ প্রত্যক্ষ করি। এই কবিতাটি থেকে, বলাই বাহুল্য, আমার বর্তমান কবিতার বাঁধুনি এবং রূপশৈলী (ব্লেকের কবিতার বাঁধুনি এবং রূপশৈলী বিষয়ে স্মরণীয় আলোচনা উৎসাহী পাঠক নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন, নর্থরপ ফ্রে-র অসাধারণ রচনা, Poetry and Design in William Blake যেখানে তিনি ব্লেকের কবিতাবলীকে 'mixed art' আখ্যা দিয়ে একটি নতুন দিগন্তরেখা এঁকেছেন) অনেকাংশেই পৃথক, কিন্তু ভাবের দিক থেকে যে-জগতে আমি এখনও অন্বেষণ করে ঘুরে মরি, দেখতে চাই সেই Vision এর আলোছায়া, (কখনো বা অপছায়া) তা এখানে রয়েছে

যেদিকে চাই দুচোখ ভরে আকাশ
আলপনায় গড়েছে মুখ নিজের,
মেঘের বুকে নদীর চালচিত্রে
ডানপিটে রোদ শিশির মেখে গায়
চতুর্দিকে সূর্য বুড়োতে পাগল।

ইতস্তত এমনি রাত্রিবেলা
তুমি যখন ঘুমের ঘোরে চাঁদের

বুড়িটাকে ডাকলে কাছে, আকাশ
নেমে আসলো রুপোর সিঁড়ি বেয়ে—
মুখে তোমার জয়ের স্মৃতিচিহ্ন।

আমি ভাবছি এ ছবি কার, মানুষ
কেমন করে গড়বে স্বর্গসিঁড়ি ?—
নিজেই যখন পাতাল থেকে ডাকছে
সুখের ঘর ভাঙ'ব ব'লে। সুখ
একলা তখন তোমার ঘরে বাদী।

[বন্ধুর জন্মদিনে • ব্লেকের ছবি, 'মিলিত সংসার' কাব্যগ্রন্থ থেকে]

যে সময় লিখেছিলাম, অস্পষ্ট মনে পড়ছে কোন বিশেষ ঘটনা-সংস্থান ছিল না, বা কাজ করে নি। ভাসা ভাসা অস্পষ্ট কিছু চিত্র, মাঝ-রাতে ঘুম ভাঙলে যেমন আধোজাগরণে আধো-তন্দ্রায় কেমন যেন স্বপ্নময় মনে হয় ঘরবাড়ি গাছপালা চারিদিকের দৃশ্যাবলী, এইরকম আর কী। এর মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্যতা অনেকাংশেই নেই, ব্যাখ্যা করা আজও আমার কাছে অসম্ভব, কিন্তু Vision-গুলি কি কি ?

১ আকাশ নিজেরই মুখ গড়ছে এবং তা আলপনা কেটে

২ মেঘের বুকে নদীর চালচিত্র (দেখা যাচ্ছে প্রায় সমস্ত ব্যাপারটাই অসংলগ্ন)

৩ ডানপিটে রোদ গায়ে শিশির মেখেছে

প্রথম স্তবকেই এমন তিনটি vision এর উল্লেখ আছে। এই কবি কি তখন, স্পষ্টত, ব্লেকের কাছে ঋণী ছিলেন। মনে হয় না। কিন্তু কোথাও যেন একটা সূত্র আছে। কবি হিসেবে আমার বা অন্যকেরই অনেকের কাছেই ঋণ থাকবার কথা। প্রথম জীবনে হাত মকস করবার জন্য তো নিছক অনুকরণ করেও কবিতা লেখা শিখতে হয় প্রায় সময়েই। কিন্তু লেখবার সময়ই কোন বিশেষ প্রভাব কাজ করছে বলে মনে হয় নি। অনেকটা যেন ঝোঁকের মাথায় একেবারে কবিতাটি লিখেছিলুম মনে পড়ে—প্রায় জ্বরের ঘোরে রোগী যেমন আবোলতাবোল কথা ব'লে যায়।

দ্বিতীয় স্তবকে একটি মাত্র Vision এর কথা আছে

১. রুপোর সিঁড়ি বেয়ে আকাশ পৃথিবীতে নেমে আসছে।

তৃতীয় স্তবকে কবিতাটিকে গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে—তাও Vision এর সাহায্যে

১ স্বর্গ সিঁড়ি গড়বার কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই 'পাতাল থেকে ডাকা'র বিষয়টি পাঠককে বিমূঢ় করবে, অন্তত যুক্তিগ্রাহ্যতার দিক থেকে।

২. ছোট্ট শিশুটির (বক্ষ) ঘরে সুখ বন্দী হয়ে আছে। ডানপিঠে রোদ সারা বিশ্বময় যে সুখ কুড়োবার জন্য পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—সেই সুখ তখন শিশুর একলা ঘরে—(তার নিজস্ব) বন্দী হয়ে আছে—সুখ যেন আর কোথাও ছুটে পালিয়ে যেতে পারবে না।

পরবর্তীকালে আমি ক্রমশ চেষ্টাকৃত কবিতা রচনার হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছি—বসে থেকেছি অনুরূপ vision এর অপেক্ষায়। ইংরেজী কবিতায় সর্বপ্রথম বোধহয় ক্যাডমন এই জাতীয় প্রেরণার দ্বারা কবিতা রচনায় হাত দেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিড্ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে ক্যাডমন সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তার কিছুটা এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যাক, যা ভাবী মজার

When he (Caedmon) fell asleep, there stood by him in a dream a man who saluted him and greeted him, calling on him by name, 'Caedmon, sing me something'. Then he answered and said, 'I cannot sing any thing as I know not how to sing'. Again he, who spoke to him, said 'Yet you could sing' Then said Caedmon, 'What shall I sing' He said, Sing to me the beginning of all things.'

এভাবে ক্যাডমন রচনা করেন তার hymn গুলি। জেনেসিস, এক্সোডাস ড্যানিয়েল [জেনেসিস্ দুটি ভাগে বিভক্ত, 'এ' এবং 'বি', গবেষকরা বলেছেন, কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ তাঁর প্রথম রচনায় পাওয়া যায়, এবং এই অংশগুলিকেই—ছয়শত পংক্তিরও কিছু বেশী হবে—জেনেসিস 'বি' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে], এ জাতীয় Vision এর কথা প্রাচীন বাঙালী কবিদের অনেকেই স্বীকার করেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু আমি যে Vision এর কথা ব্লেক প্রসঙ্গে

বলছি তা ঠিক আধিদৈবিক ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকৃতই তিনি দেখেছেন তা নয়, এ তাঁর মনোজগতের প্রত্যাহিক লীলা, শেলীর কবিতায় বা ইয়েটস্ এর প্রথম দিকের কবিতায় এজাতীয় ব্যাপার কিছু কিছু আছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি কবিদের ক্ষেত্রেই যে সীমাবদ্ধ তা নয়। আমার তো মনে হয়েছে আনন্দমঠের বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকার রূপ দেখতে পেয়েছিলেন—দৃশ্যতই—অবশ্য 'বন্দেমাতরম' গানটি রচনার সঙ্গে, গবেষকরা জানাচ্ছেন, 'আনন্দমঠ' রচনার সম্পর্ক নেই। গানটি নাকি আগেই লেখা হয়েছিল, পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। অবশ্য যখনই তিনি লিখে থাকুন, অমন একটি গান বা কবিতা যাই বলা যাক না কেন, Vision ছাড়া সম্ভব নয়। বঙ্কিম এখানে কবির ভূমিকা নিয়েছেন। বহু পরবর্তীকালে আমাদের সময়ে আমার অগ্রজ লেখক কমলদা, কমলকুমার মজুমদার, যে গ্রন্থটি লিখে বাঙালী পাঠককে চমকে দিয়েছিলেন তা সবটাই, আমার দৃঢ় ধারণা, Vision জাতীয় প্রেরণার তাগিদে। আমি 'অন্তর্জলি যাত্রা' বইটির কথা বলছি। এই বইয়ের ঘটনাবলী, চরিত্র, গঙ্গার ধারে বৃদ্ধের মৃতদেহ, খানিকটা শরীরের নিম্নাংশ জলের মধ্যে। যুবতী স্ত্রী, শ্মশানের নিকষ-কালো যুবক ডোম—সব কিছু মিলে বইটি পড়তে পড়তে আমি যেন পূর্বজন্মে ফিরে গিয়েছিলুম, কয়েকশত বৎসর আগে। আর এ বইয়ের ভাষা। এ নিয়ে কমলদাকে বহু গালাগালি সহ্য করতে হয়েছে—কেউ বলেছেন, এটা স্টাণ্ট, কারো মতে জোর করে ভাষা সৃষ্টি করা যায় না ইত্যাদি। আমার মনে হয়েছে, কমলদার কাছে পুরো ব্যাপারটাই, মায় ভাষা পর্যন্ত, একটি 'prolonged vision', না হলে এ জাতীয় বই রচনা করা সম্ভব হয় না। কমলদার লেখার খুব বেশী ভক্ত নেই, অন্তত আমার জানা। যেমন আমাদের কনফার্মড ব্যাচেলর ত্রিদিব ঘোষ, সুরসিক রাধাপ্রসাদ গুপ্ত বা বন্ধু-মহলের শাটুল বাবু, বন্ধু সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, কিছু তরুণ পাঠক—আরো কেউ কেউ হবেন—'এক্ষণ' বা 'সুবর্ণরেখা' গোষ্ঠীর নির্মাল্য বা ইন্দ্রবাবু আর এইসব বন্ধুরা, এরা সবাই কমলদার ভক্ত। আমিও। কমলদার ছবি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা, রাগসংগীত সম্বন্ধে উৎসাহ [সিগনেট প্রেসের সামনে দাঁড়িয়ে একদিন কমলদার সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা গল্প করেছিলুম ইমন আর ইমন-কল্যানের পার্থক্য নিয়ে—দেড় ঘণ্টার পরও কমলদা আমায় ছাড়ছিলেন না—

অমন উৎসাহ আমি অল্পই দেখেছি] প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য সম্বন্ধে অনুরাগ, সর্বোপরি যাঁর মাথা থেকে এই পোড়া বাংলাদেশে (যখন 'স্বাখ্ স্বাখ্' করে দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো সেক্স-যাত্রা-সিনেমা বা পেলে-কাহিনী পরিবেশন করছে, ছেলেপেলেদের মাথা চিবুচ্ছে বলা যায়।) 'অন্ধভাবনা'র মতো পত্রিকা বার করার পরিকল্পনা জাগে—তাকে শুধু প্রতিভাদীপ্ত বললে খাটো করা হয়। সব মিলিয়ে কমলদা নিজেই একটা ট্রাডিশন—যা অনুকরণ করতে গেলে বিপদে পড়তে হবে। শুধু আমার এটুকু মনে হয় কমলদার সারা জীবনটাই একটা vision-এর প্রতিরূপ। আর সেজন্য বোধ হয়, ব্যবহারিক জগতে কমলদার কিছু সুরাহা হল না, একটি স্কুলে ক্রাফ্‌টস্ শেখানো ছাড়া। কমলদা সম্বন্ধে আমি একটি সেমিনার বক্তৃতায় [রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার-এ, পরে বক্তৃতাটি ওঁদের বুলেটিন-এ প্রকাশিত হয়, আমার ইংরেজী গ্রন্থ Dimensions-এ অন্তর্ভুক্ত] যা বলেছিলুম তার বাংলা অনেকটা এরকম,—কমল মজুমদার একটিমাত্র উপন্যাসের জন্যই বাংলা সাহিত্যে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর 'অন্তর্জলি যাত্রা'-য় সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণের আভাষ মেলে। হঠাৎ তাঁর লেখা পড়লে মনে হবে 'crude' কিন্তু বস্তুত এই আবরণের পেছনে র'য়েছে 'vigour', শিল্পরীতিতে এই 'vigorous style' বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী সুলভ নয়, ইত্যাদি।

ব্লেক প্রসঙ্গে নিজের কথা এসে গেলো—এলো শৈশবের রোমন্থন, এলো আরো অনেক কবির কথা—এলেন অমলেন্দু বসু, এবং এলেন ঔপন্যাসিক গল্পকার কমল মজুমদার। ডি. কে.-র স্মরণসভায় কমলদাকে ক'দিন আগে দেখে মনে বড় দুঃখ পেলুম। হাঁপানিতে খুব কষ্ট পাচ্ছেন—কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল—হচ্ছিল আমাদেরও, তাঁকে দেখে। অমন একটি লোক—যিনি গল্প করতে ভালোবাসেন তাঁর কথা বলার কষ্ট দেখলে কষ্ট হয়। ঈশ্বর তাকে সুস্থ, কর্মক্ষম ও দীর্ঘজীবী রাখুন।

[ক্রমশ]

শ্যামলকান্তি দাশ : এখনো তুমি

এখনো চোখ চোখের মতো ফাঁকা
ভরে নি মুঠি মুঠির অধিকারে
বিকেলবেলা তুমিয়ো এসো প্রিয়
তোমাকে দেবো সহজ ফুলখানি

গানের মতো তোমার ছায়া পড়ে
ফুলের ফাঁকে ফুলের আড়াআড়ি
আমার কোনো গভীর কথা নেই
ছড়িয়ে দিয়ো জলের গড়িমসি

আমাকে নিশি ডেকেছে সাতবার
সে ডাকে কেন তুমিয়ো সাড়া দেবে
কুড়িয়ে নিয়ো গানের পাতাগুলি
এখনো তুমি দিব্য, ছায়াময়

জগৎ লাহা : আজ জ্যোৎস্নারাতে

বাঙলো-প্যাটার্নের পাল-তোলা বাড়ি
বাড়ির পাশে দীঘি
দীঘির ধারে কবেকার একসারি তালগাছ
আর কৃষ্ণচূড়া
কৃষ্ণচূড়ার ডালগুলি লাল লাল ফুলে ছৎলাপ
আর মসৃণ ছাদ
ছাদের আলসের সারা বিকেল অবিরাম মুখোমুখি
দুই যুবতী
আর কল্‌কল্ কথা
আর কিন্‌কি-দেওয়া হাসি

কৃষ্ণচূড়ার ফুলের ভেতব উড়ে এসে বসে ভিন্‌দেশি এক কাক :
ক্রমশঃ সন্ধ্যে হয়ে আসে।
পাশের বাড়িব জানলা খুলল : ঘরের ভেতব সবুজ আলো
আব কচিপাতা-রঙ শাড়ি পবে
জানলায় এসে দাঁড়ায একটি কিশোরী
যুবতী-দুজন এখনো জ্যোৎস্না ও হাওযায শরীর মিশিযে
স্বপ্নময কতো কথা বলে চলেছে
তালগাছের ছায়া আবো দীর্ঘতব নীল
কৃষ্ণচূড়াব ডালে জ্যোৎস্নাব খৈ ফুটছে
আর ডালেব ওপবে কাকটা নীরবভাবে হাঁ কবে তেমনি ঠায় বসে।
এবার সেই কিশোবী কুঁড়িব মতো ফুটে উঠে
জ্যোৎস্নার ধাবাপতনেব ভেতর আঁচল উড়িযে দিযে গেযে উঠল :
'আজ জ্যোৎস্নাবাতে সবাই গেছে বনে।'

মঞ্জুভাষ মিত্র : দ্বাদশ গোলাপ

একদিন এই সূর্য্যালোকিত দেশ ছেড়ে, ছবিব স্তূপ ছেড়ে, দ্বাদশটি বিভিন্ন বঙেব ফুল ছেড়ে চলে যেতে হবে ছায়াব ভিতব, দেখতে হবে ভয়ের মুখ সৌন্দর্য্যেব সংকীর্ণ মুখেব ভিতরে।

এক নীল ও সবুজ পোষাকপরা বাঁশীবাদকেব উদ্দেশ্যে এই গান। সাদা ও লাল রঙেব পোষাকপবা ভগিনীদ্বয়ের উদ্দেশ্যে এই গান।

একদিন এই সূর্য্যালোকিত দেশ ছেড়ে, ছবিব স্তূপ ছেড়ে, সঙ্গীতের মৃদু ও সকরুণ প্রবাহ ছেড়ে চলে যেতে হবে ছাযাব ভিতর, ভয়কে দেখতে হবে সৌন্দর্য্যেব স্বল্প-আয়তন মুখেব ভিতরে।

ঈশ্বর করুন দ্বাদশ গোলাপ গত গ্রীষ্মে যা আমার মন ভোলালো তারা প্রত্যেকে ভুবনমঙ্গল বিদ্যা ও আয়তনবতী ভগিনীদ্বযের হাতে ছ'টি ছ'টি কবে স্বতন্ত্রভাবে ষট্‌চক্রেব আকারে শোভা পাক। হৃদয়বাসী বনদেবতা এইবকম অভিপ্রায করেছেন। তাব বাঁশীতে মৃত্যু ও ভয এই দু'বকম সুর বাজে।

স্বপন সেনগুপ্ত : কর্ণ

আমি নই স্বেচ্ছাঅন্ধ পতিপ্রাণা গান্ধারী-তনয় দুর্যোধন
অমি নই পার্শ্বচব লীলাকুশল পামব কৃষ্ণের।
আমি একা, মাতৃত্যাজ্য, ভ্রষ্টভাগ্য রাধেয়কুমার কর্ণ—
আমাকে ভুলছে সব নীতিমুগ্ধ অভিভাবকেরা।

চারদিকে উল্কার মতো লকলকে ক্ষত, আদিম মাটির শরীর—
রিরংসা অজ্ঞাত নয়, হাতে বন্দী মহুয়ার মাটির পাতিল।
আমি যে দেখেছি সবই—যুদ্ধের হুঙ্কার আর
ভোটের শ্লোগানে মত্ত অক্ষৌহিণী সেনা। আমারও
রথেব চাকা ডুবে গেছে নরম কাদায়, কৃত্রিম
ফাল্গুন আসে, মধ্যবিত্ত মুখ জ্বলে অপুষ্টি, ক্ষুধায়।
আমি যে পারি নে বলতে : আমি চোখ মেললুম
আকাশে, জ্বলে উঠলো আলো—পূরবে, পশ্চিমে।

চাবদিকেই প্রস্তুতির গন্ধ টেব পাচ্ছি, বেজে উঠছে
হাড়েব লাঙ্গল। হাতে হাত গায়ে গা লাগিয়ে
ওবা আসছে। জানি আমি এ বড়ো সুখের সময়
নয়, কঙ্কালের যুদ্ধ হবে শুরু।

শংকর দে : একটি ছোট কবিতা

পুতুলের মতো আমি তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ভালোবাসি।
কাঁটা-ফুল, গাছে মবা পাতা
কবিতার মতো আমি তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফিরে আসি।
চোখে-চোবা ঘুম নেই, ঘুম
মাতালের মতো আমি তাকে ছড়িয়ে কেঁদেছি উপহাসি?

সুকুমাররঞ্জন ঘোষ : সব শেকড়ই

বরং ঘনিষ্ঠ মহিমা ভালো,
সময়মতো পাতা ঝরিয়ে নতুন, আবার—
ফুল-ফলের মরশুমেও।

বীজ থেকেই ফুটেছে শেকড়
এবং কাণ্ড-শাখা ছড়িয়ে
ঘনিষ্ঠ মহিমার উদ্ভিদ্।
গোপন থাকে না কেউ
ভেতরমুখো সব শেকড়ই স্পর্শ করে
শান্ত শীতল গভীর।

মুরারিশংকর ভট্টাচার্য : যখন বাইরে যাব

যখন বাইরে যাব
তখন আমার সাত মহলায়
ঝাড়-লণ্ঠনগুলি
দুলিয়ে দিয়ে যাব।

যখন বাইরে যাব
তখন আমার সবুজ-সবুজ পথে
শিউলিগুলি থাকবে পড়ে
বরফ-কুঁচির মত।

যখন বাইরে যাব
তখন নির্জন সব গীর্জাতেই
বাজবে ঘণ্টাধ্বনি
জল-তরঙ্গের মত।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় : যুদ্ধ

যুদ্ধ এসে নিয়ে যায় রাজ্যখণ্ড রেখে যায় গভীর আঁধার
জ্বলে অহর্নিশ চিতা পড়ে থাকে রক্তমাখা ক্ষমাহীন স্মৃতি
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে বদলে যায় যথারীতি নিজস্ব জীবন
মানুষের আচরণে শব্দমালা, চিত্রকল্প ভিন্ন হয়ে যায় ,
কেউ নতজানু হয় কেউ কেউ তুলে ধরে উদ্ধত কৃপাণ
উদাসীন হাসি ছুঁড়ে অনেকেই অগোচর আঁধারে লুকায়
মনগড়া শূন্যশোকে হেসে ওঠে রক্তবীজ বিজয়ী শিরোপা।

অমল ভৌমিক : বিশ্বাসের উপকূলে

বিশ্বাসের উপকূলে
যে জাহাজ নোঙর ফেলেছে
তার অপর নাম ভালোবাসা।

ভুবন ভরেছে আলোয়
চারিদিক দুলে উঠেছে, এই গ্রহ এই সৌরজীবন
দিগন্তের এই তৃণভূমি, অনন্ত মমতার মতো

তৃষিত রজনী

নির্ভরতাই ভালোবাসার একমাত্র সোপান জেনে গেছি ,
অতএব এসো আমরা উপকূলে পৌঁছোই।

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় : তোমার চোখের ঋতু

তোমার চোখের ঋতু কেটে গেলে ফের তুমি এস
নিঃশব্দ তোমাকে আমি এঁকে যাব সারারাত
তুলিতে ধূসর রঙ, যদি আলো নিভে যায়
অজস্র শৈবালদাম ঘিরে থাক শান্ত কুহেলিকা
ঋতুহীন প্রাণ দেখ ছেয়ে আছে প্রত্যেক গলিতে
তৃতীয়া রাত্রিতে কোনো রমণীর মত
রাঙানো আঁচল দিয়ে ব্যভিচার ঢেকে রাখা সমীচিন নয়।
চলো যাই তোমারই গভীর ঋতু ছায়াচ্ছন্ন পল্লবের
প্রচ্ছন্ন নিবাসে।

অমিতাভ দাস : তুমি আমার মুক্তিমোহভঙ্গ প্রভাতী গান

গ্রহণযোগ্য তুমি আমার সঙ্গী হলে চলতে পারি
তুমি আমার সফরসূচী-তৃষ্ণাপূরণ-যাত্রীমুখর বিমানঘাঁটি
ঘাটশীলা নয় দীঘাও নয়, নয় ইলোরা
সত্যি কথা বলতে শেখাও মাথা তোলার মন্ত্র
সাপের ঝাঁপি বইবো কেন ? খেলবো কেন কানামাছি ?
নিজের সংগে প্রবঞ্চনা। পাহাড় হতে শেখাও তুমি
বৃক্ষ হতে শেখাও
আয়নাতে মুখ অকর্মণ্য সাজিয়ে নিযে
অন্যহাতের বন্দী পুতুল সাজাতে আমার ভীষণ যে ভয়
অন্ধকারের নিষিদ্ধদ্বার ঝড় লেগে সব হাট হয়ে যায়
যাকে সবাই ঝড় ভেবেছে আমি তাকে দুঃসময়ের গুপ্তঘাতক
ভাবতে থাকি

এমনতরো নদীর মতোন পায়ের ঘুঙুর
বাজিয়ে চলার তৃষ্ণা দেখাও
তুমি আমার সঙ্গী বাউল, ভ্রমনের রাস্তা দেখি
চাইবাসা নয় চিল্কাও নয়, নয় কোনারক
আগুন হতে শেখাও তুমি আকাশ হতে
তুমি আমার মুক্তি-মোহভঙ্গ তুমি মন্ত্র আমার
তুমি আমার এ হতাবাতে চারণ কবির প্রভাতীগান

অজিত বাইরী : চোখ

আমার এ-দুটো চোখকে অবিশ্বাস কোরো না,
অবিশ্বাস করো না, কতটা কাঙাল হতে পারে।
শুধু চেয়ে থাকে, চেয়ে থাকার আকুল পিপাসায়।
বিশাল সমুদ্র এক রয়েছে গোপন
রৌদ্র-জ্বলা গহন দুপুর এ-চোখের কোনে,
আমার এ-দুটো চোখকে অবিশ্বাস ক'রো না।
আঁধার রাত্রির ওপারে অগণন নক্ষত্রের আকাশ
পাতার আড়ালে কৃষ্ণচূড়ার জ্বলন্ত আগুন,
তুমি কি এ-দুটো চোখকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করো?
ভাবো, ভ্রূপল্লব আর কালো ভ্রমর-মণি
চর্ম মাংস শিরা-উপশিরায় শুধুই দু'টি অক্ষিগোলক?
ঘৃণায়, প্রেমে তুমি কি জানো না
এ দু'টো চোখই ঘটাতে পারে অলৌকিক বিপ্লব!

জয়ন্ত সান্যাল : সেই পাখি

সেই চেনা নদী, পরিচিত বিকেল, মাঠ পেরুলে দীঘি, ওপারে সেই পাখি, একাকী গান গায়। আমি পাখিকে দেখি নি কোনোদিন, দেখেছি ধু ধু ইষ্টিশন, সবুজ নিশান উড়িয়ে রেলগাড়ী থামে না, মনে আছে হাতছানি দিয়ে সে কাছে ডেকেছিল একদিন, রেলগাড়ী একদিনই থেমেছে। বুকে হাত রেখে গ্রহান্তরে পৌঁছে যাওয়া সেই প্রথম, আমি রাজা, সম্পূর্ণ রাজত্ব আমার।
সব মনে থাকে। শুধু নিজের ভেতব পথ হারায় রূপালী শব্দেরা, বেলাশেষে টুপ্‌টাপ্‌ ডুবে যায় প্রতিশ্রুতি, অকস্মাৎ সেই পাখি ডেকে ওঠে

মধুমাধবী ভট্টাচার্য : হৃদয়

১. অদ্ভুত একটা পাগল অমলেশ
ছুটে আসে কিছু বিস্ময়
দৃষ্টিতে কোন প্রত্যাশা খুঁজে নিতে হয়

ভালোবেসে সকাল আসে নি তোমার ঘরে
বেদনায় সন্ধ্যার'ভা তোমার মুখ
কাল মোহিনী ডেকেছিল।

অমলেশ, ফিরে এসো রাজার পোষাকে।

ফিরেছিলে অমলেশ
কেননা তোমার মত আরও কিছু অমলেশ
দেখেছিল,
দেখেছিল রাজারা বড গরীব বড পাগল ভালোবাসে।

২. আমি আজও এখানে
কথাবা শেষ হয়ে গেছে কয়েক বছর।
কখন, কবে বলেছিলে 'আসব'
সে শোনা হয়ে গেছে বহুকাল।
কবমচা বনে পাশাপাশি পা বেখে
ধুলো উড়োনো শেষবাব।
কখন পাখি ডেকেছিল, ঘবে ফিরবে
বনের ছায়া দিয়ে
ফেরা হয় নি, কথা ছিল
পাখী ডাকলে
করমচা বনে পা দোলাব একবাব।

সুরজিৎ ঘোষ : মুখ

মাটি আব জলের থেকে আমি একটাই মুখ গড়তে চেয়েছিলাম
সেটা জ্ববেব তাপে গলবে না নতুন ক'বে ভিজবে না বৃষ্টিতে,
তাব চোখেব পাড একটুখানি বুঁজে থাকবে একটু থাকবে খুলে
কিন্তু তাতে ভয় কিংবা রাগের কোন কাঁপন থাকবে না।
সে মুখটা আমি বাববাব তৈবী কবি মোমেব মত সাদা
আসলে পোডামাটিব শক্ত বাঁধুনিতে
আধবোঁজা তার চোখে বসাই লম্বা ঘন পাতা
তবু সেটা কখনো ঠিক নিখুঁত হয় না
আমি হঠাৎ হঠাৎ চমকে দেখি শীত করছে তার
নয়তো বিশ্রী জ্বলে যাছে, কালি পড়ছে রান্না ঘরে ঝোলানো হ্যাবিকেনে
অথবা সেই চোখে নতুন ধানের মতো ভালোবাসা
এ মুখ আমায় বড্ড পোড়ায় একে আমি গড়তে চাই না।

সুময় জোয়ারদার : অপৃথা

এখন আব আমাব কবার মতো কিছুই নেই
যেমন বৃষ্টি হ'লে সবাই বর্ষাতির কবলে আত্মস্থ হয়
যেমন তুমি ছেড়ে গেলে পার্থিব সব কিছু
জড়িয়ে দিলে মর্মহীন চিন্তায়

জানালায মুখ ঘসে আমি সব বুঝতে পারি
যে আশায় তুমি সব ছাড়লে
নতুন দিনের প্রাচুর্যে নিজেকে নিলে ছাড়িয়ে
নগ্ন আলোয় কি দেখেছিলে জানি না
আমার ভালোবাসা উচ্চারণে ছাড়িযে নিতে
পাবি নি যে জানতাম তুমি অন্য কিনারে নোঙর ফেলেছো

তারপব অনেক দিন সবে গেছে
সরে গেছে মোহিনী আড়াল
আমি জানতাম আবার আসবে সীমানার কাছে
যেদিন ভয়ার্ত পাখীব মতো ছুটে গেলে জ্যোৎস্নার ভিতবে
মাথার ভিতরে গোপন ব্যস্তত য তুমি ফিরে এলে
অনেক সংযমেব পাহাড ডিঙ্গিয়ে আমার রক্তেব ভিতরে ॥

রবীন বাগচী : দুটি ছড়া

হিং টিং চট্
ইয়েস' অব নট্
এই নিয়ে যত গোল
দুনিয়াটা হট্।

২. লাল আলো ট্রাফিকটা জ্যাম্
এগোয় সাধ্য কার
বোকার মত ঠায় দাঁড়িয়ে
সবাই খাচ্ছে মার
দরাদরি, ধরাধরি
একটু শিথিল কড়াকড়ি
এই ফাঁকে যে যাচ্ছে গলে
ছুটছে গাড়ী তার।

অশোক কুমার মহান্তি : কবিতাগুচ্ছ

প্রকৃতি

তোর অঙ্গ ঘিরে মাতাল হাওয়ার নাচ দেখেছি
শ্যামবরণী, তোর নগ্ন দেহে তপ্তবালুর আঁচ পেয়েছি
তাই তো এখন ছাড়ছি না এই ক্ষেত ও খামার
মিথ্যা মায়ায় বলছি এসব 'আমার আমার'
তুই নাচ থামালেই যাবো চলে নিজের ঘরে
শ্বেতহংসীর পাখায় চড়ে ঠিক দুপুরে।

কাছে ডাকতে :

তোকে কাছে ডাকতে সাহস পাই না
বুকের রক্তে এখনো কামনার লাল শিখা
দপ্ দপ্ ক'রে সারাদিন জ্বলতে থাকে
আমি অনুভব করতে পারি তার কল্লোল
আর অনুভব করতে পারি বলেই
তোকে কাছে ডাকতে সাহস পাই না।

চন্দ্রোদয়

কি ভাবছিস্ এখন ?
অমন ডাগর দুটো চোখ মেলে
আকাশে অমন করে কাকে খুঁজছিস্ ?
এই। এই। শোন্
চোখ তোল্
দেখ্ আমি, এই সন্ধ্যা, আমি এসেছি রে।

হিমাংশুশেখর বাগচী : মা-কে

এখন আমার ছোলবেলার
সুখস্মৃতি মনে পড়ে
ভেসে ওঠে একটি মুখ
একটি নারী বুকের মাঝে
ডাক দিয়ে পাই
হাত বাড়াই
অসীম আকাশ,
মা-কে

সব হারিয়ে
এখন আমার দুপুরবেলা
যাই ছুটে ওই তেপান্তরে
তীরগুলো সব যায় ছুটে
আকাশ জুড়ে জমতে থাকে
শুধুই স্মৃতি
অনায়াসে ফের খুঁজে পাই
মা-কে।

ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য : আর যার দুঃখগুলি

ভোরের শেষ রঙটুকু আঁকতে পারো ?
ভালোবাসার গন্ধটুকু নিতে পারো ?
জীবনের শেষ আলোটুকু জ্বালাতে পারো ?

অথচ তুমি শূন্যতাকে ছুঁয়ে
থরে থরে দুঃখগুলি সাজাতে পারো অনায়াসেই।

রবি ভট্টাচার্য : অর্বাচীন দুঃখী হিংস্র নাচে

উজ্জ্বল ছড়ানো পঙ্‌ক্তি
একান্ত পরস্মৈপদী মুখস্ত উদ্ধৃতি
ব্যবহারে এখন জটিল

কবে যেন ডেকেছিল শবরী বেদেনী
কাছে
'এখানে মহড়া দেবে এসো'
হাতে সাপুড়ের বাঁশি।

অর্বাচীন দুখী হিংস্র নাচে।

পূর্ণচন্দ্র মুনিযান, পৃথিবীর আদিপুরুষের মত

বুকের ভেতর সাদা পায়রাটি লুকিয়ে রেখে তুমি কপট করে
জানতে চাইলে
আমি মিত্রতা চাই কিনা, গাঢ় সখ্যতার সন্ধি
হাত নেড়ে কিছু বলবার আগেই একটা সুতোকাটা ঘুড়ি
মাথা দোলাতে দোলাতে মুচড়ে পড়লো পথে
প্রিয় সাম্রাজ্যের জন্য একটা শিশু চিৎকার করে বাদাড় কাঁপালো

তোমার বুকের ভেতরে একটা সাদা পায়রা, ঠোঁটের উপরে তিল ফুল
হাত নাড়তে গিয়ে হাঁটু ভেঙে ছুটে চললাম অরণ্যের দিকে

পাকা ও পল্লবের আড়পিঠে কতগুলো চিত্রিত পাখির ডানা
উষ্ণ বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখলো প্রিয় শাবকের মুখ
চঞ্চুর ঠোকর ছড়াতে লাগলো ক্ষীণ বাতাসের কলস্বর
আমি কি চাই? অশ্রু না অনুতাপ?
পৃথিবীর আদিপুরুষের মতো আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম পাথরের নীচে

বুকের ভেতর ম্লান হাসিটি লুকিয়ে রেখে কপট করে জানতে চাইলে তুমি
আমি সবুজ বাংলার তৃণভোজী গো-পালক কিনা।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী : শিল্পী

অন্যেরা কিভাবে জানবে? সেই মানুষ নিজেই জানে না
সকলের সঙ্গে ঘোরে খায়-দায় হাসি ঠাট্টা করে
বাজারদরের জন্য দুশ্চিন্তাও ফুটে ওঠে ভুরু ও কপালে
একেবারে পাঁচপাঁচিক সাদা-সাপ্টা আটপৌরে জীবন এভাবে।

চলতে ফিরতে হঠাৎ কখন
কাছিমের মত তার হাত-পা গুটিয়ে আসে
চোখ যেন চোখ নয় কিছুই দেখে না
কান যেন কান নয় কিছুই শোনে না।
তড়িঘড়ি ঘরে ফেরে, ধ্যান দ্রুত জমে যায়—
অদ্ভুত প্রজ্ঞার আলো চোখে মুখে খেলে
স্রষ্টার শারীর গন্ধে ভরে ওঠে মহাকাশ নিখিল ভুবন।

সন্দীপ মুখোপাধ্যায় : কন্যা

চুপ ক'রে থাকি, জানালা পেরিয়ে দৃষ্টি
বৃষ্টি দেখে না, বালিকা, যে শুধু একলা
এসে ফিরে গেল সাদা শিউলির রক্তে
সাজি মুছে নিয়ে, তাকেই স্থির নিবদ্ধ
দু-চোখ দিয়েছি নৈসর্গিক ইচ্ছায়।

পুরাণ পড়েছে ছলনার গূঢ় অর্থে
নিভৃত আষাঢ় অলসতা হানে, শুক্ল
পক্ষের মৃদু কুয়াশা ও ভাল কন্যা
তার চোখে ঘোর বাগান মেলেছে শান্তি।
ঘর থেকে দেখি : করপদ্মের দ'হে
শিউলি জ্বলেছে, সাজি ভরা শ্যামরক্ত।

প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় : ঘোরান সিঁড়ি

মাঝে মাঝে জানালা, দরজা, চৌকাঠ, রেলিং,
ঝুলে থাকে শাড়ীর আঁচল, জামার হাতা,
কার্ণিশে শিশু বট, ঘোমটা ও কাঁথা,
কয়েকটা অচেনা মুখ, অনেকের কথা,
কেউ সোজা চলে আসে,
কেউ থাকে পর্দার ওপারে।
তবে আর কিছু নয়, শুধুই ঘোরান সিঁড়ি
একেবেঁকে উঠে গেছে ওপরের দিকে।

দিবাকর ভট্টাচার্য : সৃষ্টি

তাবৎ ক্লেশেব পরে, মানুষেবা দাঁড়িয়ে দেখে নগবপ্রতিমা
যা এতোকাল ধবে' ধীবে ধীরে গড়ে উঠেছিলো।
যেন শূন্য। বায়ুব ভেতব ফুৎকাবে ছড়িয়ে দিলো
তাব সুখ, অ ত্মতৃপ্তি। যেন তাব ঠোঁটে অমৃত গড়ে ওঠে।
সমস্ত কিছু দূবে বেখে, ছুড়ে ফেলে ছুটে যায
প্রতিমাব কাছে। একান্ত চক্ষু দিয়ে দেখে বাখে প্রতিমাব মুখ
সাবিবদ্ধ ঠোঁটে বলে ওঠে, এই প্রতিমাই দিতে পাবে আমাদেব সুখ।
নগবতোবণেব কাছে ছুটে গিয়ে দুই ছত্র কথামালা
দিয়ে লিখে বাখে, দেখে যাও আমাদেব নিজস্ব প্রতিমা।
যা এতোকাল ধবে' ধীবে ধীবে গড়ে উঠেছিলো।
যেন সোল্লাসে, গড়ে উঠলো ভেঙ্গে-পড়া এ চদিনেব নৈতিক বাড়ি ॥

সমর রায়চৌধুরী : ভাগ্য

রাস্তায় পড়ে থাকে কতোকিছু
ব্যস্ত জুতোর মুখে গড়িয়ে যায় লাইটাব
রূপার ভ্রমর, কলম চিরুণী ও কাপলিঙ্ক্
অসংখ্য মানুষ কুড়িয়ে পেযেছে খুচরো পয়সা কতদিন
আবো অজস্র মানুষ কুড়িয়ে পেয়েছে ছোটো ছোটো চাঁদ
জীব নব মানে, তাৎপর্য বিস্ময়গুলি
নাঙ্গা ফকিরেব মতো আমি ঘুবে বেড়িযেছি পথে
টেলিস্কোপ নিযে বসে থেকেছি বাবান্দায
দিনেব পব দিনেব পর দিন কিছুই দেখি নি অনুভূতিগ্রাহ্য
ববং দেশবাসী কুড়িয়ে নেয় যতোসব দুর্লভ সুলভগুলি
প্রত্যহ পথে ও বিপথে
তাব সব কিছুতেই লেগে রযেছে আমার
পুবোনো হাতেব ছাপ

দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় : বন্যাতে

যদি বলো ভুল—ভুল
যদি বলো কায়দা—কায়দা
পাথনায় সৌখীন কিছু নেই
কথাগুলো হাত- ফবৎ হ'তে-হ'তে
চকচকে গতব খোলে, কাছাকাছি ঘোরে
ভবিষ্যৎ ভুলে যায় পুরুষ নারীর ভেঙে পড়ে সাধ।

প্রভাত মিশ্র : রুক্ষ

ভোর হ'লো না তবু দুয়ার ভাঙলো কেন এই ঝড়ে, রুক্ষ—
তোমার হিংসা তবে ফলবতী জননী হ'লো না, এলো না আর
মানুষের কাছে, বিদ্রুপের কাছে, সন্দেহের কাছে, যেন আমার একার
শুয়ে থাকা দেখে ফেললো তপস্বী বিড়াল, আমি কী এবার শুরু
করবো জমি খুঁড়ে বাহিরে আনবো সভ্যতার গ্লানি,
অচিকিৎস্য সন্ধিৎসায় গুরু গুরু মেঘ ডাকে, এক বিন্দুও নেই জল
পথের দু'পাশে, তবু চোখ উঁচিয়ে আছে সারি সারি হিমরক্তফল।
সুন্দরের ভুঁড়ি ফাটিয়ে বেরিয়ে আসছে শূয়োরসন্তান, এরকম রূপ
করছে আমাদের নির্দেশনা, যেন বোকা শকুন আমরা, ভাগাড়ে
গিয়েও খুঁজি হাড়ের চিরুণী, দুল, অঙ্গুরীয়, দেখি মরা গরু নাড়ে
লেজ,—প্রাণ আছে প্রাণ আছে, তবু জল চাই না শ্রাবণে।
কে এমন দূরে নিল তোমার প্রেমের কাছ থেকে, এই কুঞ্জবনে
আনন্দের সাথে তাই রুটি-ভাগাভাগি—যা উচ্ছিষ্ট পরিত্যক্ত কণা।
আমাকে একলা ফেলে, বনের গভীরে, রুক্ষ, একলা যেও না—
অনেক শোনার আছে, অনেক শেখার আছে তোমার চক্ষুর
কাছে আরো,
জ্বালালে আমায় যদি, খেতে দাও কংক্রিটের গুঁড়ো, এইদিকে ফেরো।

আব্দুর রফিক : স্ত্রী-হারা কবিকে

আমি দুএকদিন কারণে বা অকারণে
কোন কোন নিষিদ্ধ নগরীতে ঢুকে পড়ি
দু-একটা লাল লাল চোখের প্রলুব্ধ ভাষার সাথে
আকাশের জ্যোৎস্নার রঙ মিলিয়ে নিই
এবং জাফরানী রঙের ঠোঁট থেকে খসে পড়া
কিছু কিছু অশ্লীল শব্দের গভীরে ডুবে গিয়ে
দু একটা যন্ত্রণাকাতর মুখের ছবি তুলে আনি।
তারপর কোন এক অর্ধনগ্ন নারীর কাছে এগিয়ে গিয়ে
তার দেহ এবং মনের চঞ্চলতা থেকে উঠে-আসা
কিছু ক্লেদাক্ত হাসি অঞ্জলি পেতে ধরে নিই
কোন স্ত্রী-হারা রাত-জাগা কবিকে দান করব বলে।

মিহিরবিকাশ চক্রবর্তী : বনের সীমানা পেরিয়ে

আমি আছি তাই
লোকালয় পরদা
পুলিশ মাষ্টারমশাই

চাও তো সীমানা পেরিয়ে
বনে যাও

আমি বনের সীমানা
বনে নেই

বনে কিছু নেই কেউ নেই
লোকালয় পরদা

পুলিশ মাষ্টারমশাই
এবং খুন ও খুনী তাই

বিষ্ণু সামন্ত : পাগল

তাকে দেখে কেউই হাসে না, তার হাসিকে সবাই ভয় পায়
ধমকে উঠতে পারে না সে, তর্কের কাছে যায় না
করে না সে শবানুগমন, সব কিছুতেই
কিরকম হাসি পায়, ভয়ংকর হাসি আর থামতে চায় না
আর যাবা বাত্রিকে খুরো ক'বে
ঝনঝনাৎ দিনের প্লাটফর্মে ছুঁড়ে দেয়
বেচারিরা কাজকর্ম করে কিনা, ঘুমের ব্যাঘাত হতে থাকে।
বর্শার ফলার মতো মাঝরাতে ঝলসে ওঠে হাসি
নিদ্রাজড়িত চোখে অভিশাপ দেয় তারা পাগল। পাগল।

একদিন ওকে ঠিক অনস্তব কেঁদে উঠতে হবে।
একদিন গাছের ডালে বসে সেই জীবন পাগল
কাটে সেই ডালটির মূল, কেউ বললে : আহা
লোকটাকে আয়না দেখাও তাড়াতাড়ি।
'আমিই তোদের আয়না তোরা দেখ' বলতে বলতে
পড়ে গেল নিচে, চোখে তার জল, মুখে সেই হাসি।

মিলিন্দ চক্রবর্তী : বিধ্বংসী

পথে দেখি, অশোকগাছের ফাগরাঙানো সারি
টকটকে লাল আবীরে মাখানো
অনহ্যাংটো ছেলের মুখ। কোথাও বা
ক্ষুধার্ত, ক্রন্দনরত ভিখারী।
দেখছি ফসল কাটছে চাষী।
চাষীর গরুজোড়া বোধহয়
গোয়ালঘরে বসে ধানের কুঁড়ো খাচ্ছে।

দেখতে পেলাম,
মাঠের ওপারে, নারকেলের সারের পেছনে,
সোনালী ধানের শীষগুলি আকুলি-বিকুলি করছে,
নিজেদের ভাবে।

আবার কোনোদিন যদি এপথ দিয়ে আসি,
সেদিন হয়তো দেখব মাঠটাতে উঠেছে এক
গগনচুম্বী অট্টালিকা।
সামনে তৈরী এক সুইমিং পুল,
বাড়ীর গ্যারেজে তিনটে গাড়ী।
আর সামনের বনে ফুটে রয়েছে
নানা বাহারের শৌখিন, মরসুমী ফুল।

সুকুমার পৈড়া : একদল উট চলে

একদল উট চলে বুকের ভেতরে
একদল উট যেন ক্ষুধার্ত মিছিল
জল নেই
জল নেই
আর্তনাদ ওঠে
তবু ত্যাখো
একঝাঁক রাজহংস ডুব দেয়
ভর্তি সরোবরে।

দিলীপকুমার সাহা : যার জন্য তার জন্য

তুমি তো বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে মহারাণীর মতো
ঈশ্বরের কাছে চলে গেলে
এখন পূজার ঘণ্টা বাজিয়ে
তোমার ঐশ্বর্য্য অহংকার কে দেখবে
দামামা বাজিয়ে যে শিশু চতুর্দিকে দৃষ্টি ফেরাবে
কোথা থেকে এনে দেবো
এমন প্রসন্ন উদ্ভিদ
শূন্য উঠোন জুড়ে বিষাদের হাত পড়ে থাকে সারাদিন
দু'একটা শালিক কিছু খুঁটে খায়
উন্মাদ রৌদ্রে দগ্ধ হয় বৃক্ষ
বৃক্ষের হৃদয়
এখন অশৌচ কাটিয়ে তুমি অনন্তকাল কোথায় পালাবে

সমাজ বসু : বৃত্ত

প্রতিটি প্রিয় বন্ধু কি ভাবে যে যার হারিয়ে যায় একদিন
কেউ থাকে না
যে থাকে সে থাকে
সবুজ মেরুণ সময় জুড়ে অন্তরঙ্গ সংলাপ ভালোবাসা
কিছুই থাকে না—
তারপর ঢেউ আসে। ঢেউ যায়।
ঝিনুকের ভিতর রোদ বৃষ্টি
কত ফুল একা। একা।
তবু
কোনদিন না কোনদিন দেখা হয়ে যায়।

বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : হে আমাব ঈশ্বর

আসলে ছোট ছোট দুঃখগুলোই থেকে যায়
বড বড দুঃখদের স্বাভাবিক মনে হয় কখনও কখনও
বন্ধু, মনে আছে, অনেকদিন অনেক অঙ্গীকারে
জীবনের পাত্র পূর্ণ করে দিয়েছিলে তুমি নানান্ উৎসবে

তবু সম্রাট হতে আমি চাই নি কখনও
সাদামাটা কিছু আকাঙ্ক্ষাগুলোকে
আমি সযত্নে ঝোলায় পুরেছি
ঈশ্বব, নিতান্ত সাধারণ আমি
কি প্রার্থনা জানাব তোমাকে ?
তোমার নামের মন্ত্রে অবিশ্বাসী হতে আমি চাই নি কখনও
নিজেকেই আমার ঈশ্বর করে' গড়ে তুলেছি

অজয়কুমার চক্রবর্তী : সূর্য ঢেকে রাখে

কখনো কি যেন সুখ সূর্য ঢেকে রাখে
নরম জ্যোৎস্নার মতো প্রেম-ভালোবাসা
সত্তায বিভূতি মাখে শ্মশান-শিযরে।
ঘোড়া ছোটে, রক্তের গভীর
ক্ষুর চিহ্নে রক্তহ্রদ, গন্ধে গন্ধে
হয়ে উঠছি
সরীসৃপ।

[অমিয় চক্রবর্তীর কয়েকটি চিঠি]

32 Riverside Apts
New paltz, N. Y 12561
March 1, 1976

অরুণ ভট্টাচার্যকে লিখিত

১।

প্রিয়বরেষু

হঠাৎ একটানা আপনার রবীন্দ্রগান[১] সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি পড়ে ফেললাম—তাঁর একটি রচনা অতি সূক্ষ্ম গভীর অনুশীলন। আপনি সঙ্গীতজ্ঞ, তাই তাঁর রাগ 'দেশ', তাল 'আড়াঠেকা'র তত্ত্ব আপনার সুজ্ঞাত, আপনি অন্য একটি পুরোনো বাংলা গানের কোন সুর-শ্রুতির সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছেন, ধাপে ধাপে স্বরগ্রাম, স্বরলিপি, কথার ওঠানামা আপনার ক্ষুদ্র রত্নসম্ভব রচনায় পরিকীর্তিত। সেখানেই যদি থামতেন তাহলেও প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট থেকে যেত, কিন্তু আপনি স্পর্শ করেছেন সেই "অকথিত বাণী অগীত গান" এর পরম অবস্থিতিকে যা গানে নির্ণীত হয় না, অথচ যার উপলব্ধির পথ চেতনায় দেখা দেয়। এরকম রচনা সার্থক, কেননা এতে আপনার সহজ বিনয়ের সঙ্গে নিবিড় প্রত্যয়ের যোগ ঘটেছে।

কবিতা হিসাবে গানটি চমকপ্রদ নয়—কারো কারো চোখ জগৎ সংসার ও নীহারিকার দিকে সর্বদাই চেয়ে আছে (অনেকটা যেন অসহায়, অক্রিয় অথচ ব্যাকুল) এই উপমিত ধারণা আমাদের কাছে খুব গ্রহণীয় মনে না হতে পারে। কিন্তু সুরের তন্ময়তায় আরো একটি জ্যোতির্ময় অনন্ত প্রেমদৃষ্টির পরিচয় প্রাণে এসে পৌঁছোয়। হয়তো এই দৃষ্টি মায়ের চোখে দেখি যখন তিনি শিশুর মুখে অনিমেষ চেয়ে থাকেন। কিন্তু সব ছাড়িয়ে দেখা দেয় ধ্বনি, ধৃতি, আনন্দ, কারুণ্যের একটি সংযুক্ত রূপশ্রী—সেইটিকে আপনি তুলে ধরেছেন। আমিও ঐ গানে সেই অবাঙমানসরূপকে পূর্বে একবার স্পর্শ করেছি, রচনাটির সাম্য রূপ আবার আমার প্রাণে প্রতিভাত হল আপনার প্রবন্ধটি প'ড়ে।

মনে পড়ে ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার বোন অমলাকে গান শেখাতে আসতেন, পুরীর সমুদ্রতীরে আমাদের বাড়িতে। 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী' সুন্দর গান কিন্তু অপারবিশিষ্ট নয়। কিন্তু সামনে অসীম সমুদ্র, অনন্ত আলোর আকাশ সেই সুর বর্ণনায় মিলেমিশে জ্যোতির্ময় সৃষ্টিকে আমাদের ক্ষুদ্র কক্ষে পবিব্যাপ্ত করে দিযেছিল। ঐ গানে যে আকুল ব্যাকুল প্রসাদ অনুভব করতাম ব্যক্তিগত সৃষ্টি শক্তির অভাবকে তা ডুবিযে দিত। গানটির বিস্তার নিবিড় সুন্দব। বিস্তাবের দিক থেকে মনে জাগছে আমার একান্ত চিন্ময়-প্রিয় সেই ধ্রুপদটি-যা রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বহুবার শুনেছি, "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু", এটি অবশ্য রবীন্দ্রনাথেব পূর্ণ প্রতিভা সমাশ্রিত একটি শ্রেষ্ঠ গান। ঐ ধ্রুপদটিতে বিশ্ববৈচিত্র্য, জীবন-মৃত্যু পারঙ্গম একটি ধ্যানশক্তি স্যন্দমান হযেছে। বলে শেষ করা যায় না কতখানি বলা হযেছে, কী দান দেয়া হযেছে ঐ গানের বিরহদাহের অঙ্গুলিতে। প্রেমাভিষিক্ত সর্বাশ্রয়ী একটি ধ্যানসঙ্গমে। প্রলয়ের তটে ঢেউ ভাঙছে, আবাব উঠছে, পুষ্পযাত্রাব বিরাম নেই, পবম শোকের মুহূর্তেও এই বার্তাটি কবি দিতে ভোলেন নি যে 'বসন্ত নিকুঞ্জ আসে বিচিত্র রাগে'। রমেশবাবু এই গানটি অপূর্ব গাইতেন, জানি না তার কোনো রেকর্ড আছে কিনা।

শেষ করি আরেকটি গানের উল্লেখ ক'রে যা আমার সমস্ত জীবনেব পরম বিস্ময, অন্তরতম ধন। হিন্দি গান ভাঙা সুর কিন্তু একান্তই রাবীন্দ্রিক। "তুমি যেয়ো না এখনি,"[২] কথায় কিছুই বলতে পারব না, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি সন্ধ্যায় এই গানটি আমাকে শুনিযেছিলেন শান্তিনিকেতনেব আদি সৌধগৃহের দ্বিতলে বারান্দায। আমার আশ্রমে আসার পর দিনে। কোনো উপলক্ষ্য ছিল না। তাঁব চোখে অশ্রু ছিল, সামনে শালবীথির ছায়া, এবং তার বহু ঊর্ধ্বে অথচ একই চেতনার সহযোগী একটি ধ্রুব নক্ষত্র। এই গানটিতে একটি আপাত বিসঙ্গতি আছে যার ভিতর দিয়ে সমস্তের সন্ধান পাওযা যায়। যাকে বিদায় দিচ্ছেন তার প্রতি অপার প্রেমের করুণা এবং তার একাকী গহনযাত্রা নিযে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ভৈরবীতে ব্যক্ত হল, সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত হল সেই চিরদিনেব বধূর অভিন্ন রূপ এবং তাকে জীবনের মাল্যদান। অথচ এটাও বলা হল যে বধূর বিদায় মুহূর্তে তিনিও প্রেমপারাবারে তরী ভাসালেন—আসলে কোনো বিচ্ছেদই বিচ্ছেদ নয়,

প্রেমে আমরা জীবনমৃত্যুজয়ী সান্নিধ্যের সহযোগী। জানি না আপনি কোথাও এই মহনীয় গান এই অবিস্মরণীয় কবিতাটিতে কথা ও সুর নিয়ে লিখেছেন কিনা। যদি না লিখে থাকেন তাহলে ভবিষ্যতে আপনার প্রসাদিত অনুশীলনের অপেক্ষা করব।

আমার চোখের দৃষ্টি নিয়ে কষ্ট পাচ্ছি অথচ এখনো cataract এর operation করবার সময় হয় নি। তবুও যেমন করে পারি এই লিখে দিলাম, আশা করি পড়তে পারবেন।

আমার প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন।

আপনাদের
অমিয় চক্রবর্তী

২

শান্তিনিকেতন
১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

প্রিয়বরেষু

আপনার বইগুলি ধীরে ধীরে পড়ছি,— কত যে আনন্দ পাচ্ছি বলতে পারি না। সঙ্গীতের উপর আপনার রচনা নিখুঁত, সূক্ষ্মস্পর্শী এবং মহান্ দৃষ্টিময়। কবিতার বিষয়ে আপনাব প্রবন্ধে যদিচ আমার কথা আছে তবু তার উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখতে চাই। এরকম আলোচনা আপনি আরো করুন— হাল্কা অথচ গভীরভাবে লেখা, যেন অনেকটা ডায়েরির ভাব, কিন্তু এর প্রসার-এ গভীরতা পাঠ করে' নূতনতর উৎকর্ষের সন্ধান দিয়ে যাচ্ছে।

আপনার বন্ধু আমাকে আরো দুই কপি—'উত্তরস্মৃরি' দিয়ে গেলেন। অন্যদের পাঠাতে পারব। আরেকটু ঠাণ্ডা পড়লে কলকাতায় ভ্রমণ সুবিধাজনক হবে—এবারে জানিয়ে যাব, মধ্যরাত্রিতে দরজায় উপস্থিত হব না।

আমার প্রীতি জানাই।

আপনাদের
অমিয় চক্রবর্তী

৩.

রতনপল্লী, বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন
২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠিখানি গভীর হৃদয়ে গ্রহণ করেছি। অনেকদিনের অন্তরঙ্গ পরিচয় আমাদের মনে হয় দীর্ঘ বৎসরে তা ঘনীভূত হয়েছে।

আপনার পাঠানো লেখাগুলির জন্যে অপেক্ষা করব এবং পরে আবার লিখব। নিশ্চয়ই কলকাতার দু'একটি শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে শহরে যাবো—সেইরকম উপলক্ষ্যের প্রত্যাশায় আছি।[১] তখন আপনার সঙ্গে কথাবার্তার যথার্থ অবসর পাবো।

আমার নতুন "কবিতা সংগ্রহ" যদি না পেয়ে থাকেন, অনুগ্রহ ক'রে 'দে কোম্পানী'র (বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট) কাছ থেকে আমার তরফে এক কপি নেবার ব্যবস্থা করবেন—আমার এই প্রীতির দান শীঘ্রই আপনার হাতে পৌছবে আশা করছি।

আপনার গান শোনার জন্যে একান্ত উৎসুক রইলাম। এখানে একদিন বেড়িয়ে যাবেন।

প্রীতি গ্রহণ করুন।

আপনাদের
অমিয় চক্রবর্তী

আমার শুধু একান্ত অনুরোধ, কবিতার ছাপায় যেন একাধিক ভুল না থাকে—পারেন তো প্রুফ আপনি নিজে দেখে দেবেন। তাহলে নিশ্চিন্ত হই।

অ চ.

---

১ অরুণ ভট্টাচার্য-কৃত 'অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে' গানটির বিস্তৃত আলোচনা উত্তরসূরি ২২ বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। কবি অমিয় চক্রবর্তী এখানে তাই উল্লেখ করেছেন।

২. 'তুমি যেও না এখনি' গানটির রচনা ১৩০২ বঙ্গাব্দ, ২৪ শে কার্তিক, জোড়াসাঁকো। গানটিতে ভৈরবীর সুর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। স্বরবিতান দশম খণ্ডে প্রাশিত ২০ সংখ্যক গান, ত্রিতালে বাঁধা, 'স্বরলিপি-গীতমালা'য় উল্লিখিত তাল কাওয়ালি, অবশ্য কাওয়ালি ও ত্রিতালে মাত্রার পার্থক্য নেই। পার্থক্য লয় এবং তবলার বোল-এ। এ গানটি কবিগুরুর বড় প্রিয় ছিল, যেজন্য তিনি নিজেই এর ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন, 'Do not leave me and go'.

৩. ইতিমধ্যেই কবি অমিয় চক্রবর্তী সাহিত্য একাদমী দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কলকাতায়। দুএকটি সভায় কবিতা বিষয়েও আলোচনা করেছেন। বলাই বাহুল্য, বহু বৎসর পর কবিকে পেয়ে বাংলাদেশের তরুণ কবিরা দূরের আপন মানুষকে কাছে পেয়েছেন। সম্পাদক : উত্তরসূরি

Editor · Arun Bhattacharya, Editorial Office : 9B 8, Kalicharan Ghose Road, Calcutta-700 050 Printed by Ramendra Ch Roy, Printsmith 116, Vivekananda Road, Calcutta 700 006.